পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ

মির্চা এলিয়াদ

লা নুই বেঙগলী

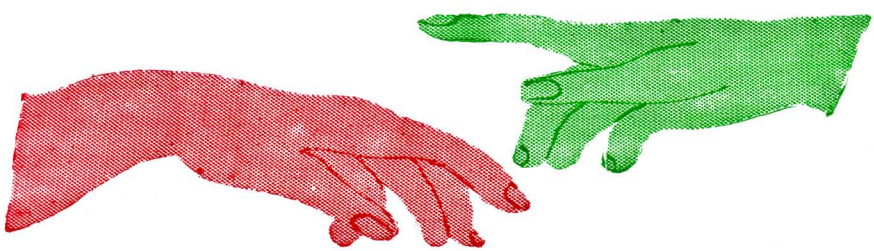

লা নুই বেঙ্গলী

La Nuit Bengali

First Published in Rumanian
in 1933
Appeared in French
in 1950
Published in Bengali
in 1988

অনুবাদকবৃন্দ :

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশ
শ্রীমলয় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায়

লা নুই বেঙ্গলী

(বাংলার রাত)

মির্চা এলিয়াদ

সম্পাদনা

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী

১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তক মেলা ১৯৮৭-৮৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ১লা এপ্রিল ১৯৮৮
তৃতীয় সংস্করণ ১লা জুলাই, ১৯৯৩
চতুর্থ সংস্করণ ২০০৮
পঞ্চম সংস্করণ ২০১১

প্রকাশিকা:
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

© শশধর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

Printed by :
New Adyasakti Printers
1/1, Muraripukur Lane,
Kolkata-700 067

বিনিময় : ষাট টাকা

La Nuit Bengali
by Mircea Eliade
Edited by Jagannath Chattopadhyay
Published by Sasadhar Prakashani
10/2B, Ramanath Majumder Street
Kolkata 700 009

Price : Pupees Sixty Only

ভূমিকা

লা নুই বেঙ্গলীর নায়ক অ্যালেন এক ইওরোপীয়ান যুবক। এক শিল্পসংস্থায় ড্রাফট্‌স্‌ম্যানের কাজ নিয়ে সে ভারতবর্ষে এল। কর্মক্ষেত্রে সরাসরিভাবে সে দায়বদ্ধ ছিল বাঙালী নরেন্দ্র সেনের কাছে। অর্থাৎ সে ছিল নরেন্দ্র সেনের অধস্তন কর্মচারী। ক্রমশঃ নরেন্দ্র সেন আকৃষ্ট হলেন যুবক অ্যালেনের উদ্যমী, পরিশ্রমী চরিত্রের প্রতি। অ্যালেনকে দত্তক পুত্র হিসেবে সারা জীবন নিজের কাছে রেখে দেওয়ার ইচ্ছেও তাঁর মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করলো। তিনি অ্যালেনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে রাখলেন। সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ক্রমশঃ পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যেও অ্যালেনের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মৈত্রেয়ী নরেন্দ্র সেনের মেয়ে। তার তখন বছর ষোল বয়স। অ্যালেন-মৈত্রেয়ীর পরিচয়ের প্রথম পর্বে অ্যালেন তার প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি। সময় থেমে রইল না। অ্যালেন যত এদেশের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকল, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হোল তত সে অনুভব করতে, শ্রদ্ধা করতে শুরু করলো ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সেবাপরায়ণতার গভীরতাকে এবং সে পাশাপাশি কলকাতার তদানীন্তন ইওরোপীয়ান এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রুচি এবং জীবনযাত্রার অন্তঃসারশূন্যতার প্রকৃত চেহারা সম্পর্কে অবহিত হোল। সে লক্ষ্য করতে শুরু করলো, মৈত্রেয়ীর দেহসৌন্দর্যের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা এবং কবিমনের আশ্চর্য মিশ্রণ। নরেন্দ্র সেন এবং তাঁর স্ত্রীর তার প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব, সহানুভূতি দেখে অ্যালেনের মনে হোল যে তাঁরা অ্যালেনের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর বিবাহের কথা ভাবছেন। তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় সংস্কার, ঐতিহ্য যে তার আশ্রয়দাতাদের সংস্কারের থেকে অনেক দূরে এবং তা যে তাদের বৈবাহিক মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করলেও করতে পারে এ ভাবনা তখনকার মতো অ্যালেনের মন থেকে তিরোহিত হোল। সে ঝুঁকে পড়লো মৈত্রেয়ীর দিকে। মৈত্রেয়ীরও বোধ হয় অ্যালেনের প্রতি আকর্ষণ কম ছিল না। সুতরাং অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দিল প্রেম। এক বাঁধভাঙা, দুর্বার প্রেম। অ্যালেন কিন্তু এই যুবতী মেয়েটির মনের সম্পূর্ণ অধিকার পেল না। মেয়েটির রহস্যজনক মনের কাছে অ্যালেন বার বার বাধা পেতে থাকলো। মৈত্রেয়ীর মনকে তার মনে হোল এদেশের জঙ্গলের মতোই জটিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং গভীর। তার মনের গভীরতার তল পেল না অ্যালেন। কখনো কখনো, অ্যালেনের অপরিণত মনে এই প্রচণ্ড প্রেমের

প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিল অযৌক্তিক ঈর্ষা, ঘৃণা, সন্দেহ, বিতৃষ্ণা। সে সব-কিছু বুঝতে পারলেও যুক্তির পূর্বনির্ধারিত পথে এগুলো ঘটছিল না। অ্যালেন বুঝতে পারছিল না মৈত্রেয়ী এর আগে কাউকে মন সমর্পণ করেছে কি না। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই তার কামনা-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। সে ধর্মান্তরিত হবার চিন্তাও করতে শুরু করেছে। মৈত্রেয়ী হয়ে দাঁড়াল তার একমাত্র কামনার ধন, ক্লান্তির আশ্রয়।

তাদের এই ঘনিষ্ঠতার কথা কিন্তু গোপন রইল না। নরেন্দ্র সেন অ্যালেনকে বিতাড়িত করলেন এবং এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে দুজনের মধ্যে কোনো যোগাযোগ রাখা সম্ভব না হয়।

কিন্তু এভাবে সব কিছু শেষ করে দেওয়া সম্ভব হলো না। অ্যালেনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মৈত্রেয়ী এক বিপজ্জনক পথে পা বাড়াল। এদিকে অ্যালেনের মন তখন দুভাগে বিভক্ত। একদিকে তার মৈত্রেয়ীর কষ্টের জন্য নিজেকে দায়ী করার চিন্তায় প্রচণ্ড অনুশোচনা, অসহায়তা ; অপর দিকে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ক্রোধ। সে আপাত শান্তি খোঁজার জন্য আগের ক্ষণিকের সঙ্গিনীদের কাছে অত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, এর ফলে তার হারানো ভালোবাসার প্রতি মমতা, আনুগত্য বিস্ময়করভাবে প্রখরই হয়ে উঠল এবং সে তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়লো।

অ্যালেন তার প্রখর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা দিয়ে সুচারুভাবে জাগিয়ে তুলেছিল মৈত্রেয়ীর মনোজগৎ। সে জগৎ ছিল একাধারে অনুভূতির, কাব্যময়তার, যুক্তি-বিজ্ঞানের, দর্শনের, ধর্মের, এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল মানসিক এবং শারীরিক প্রেম—চরম এবং দুর্বার। মৈত্রেয়ী এমনই একটা নারীচরিত্র যাকে ভুলে যাওয়া সহজ নয়। তার সঙ্গে অ্যালেনের মিলন-সংঘাত, দুটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অনুভব-যুক্তির সংঘাত এবং মিলনও বটে। তাই আত্মজীবনীমূলক প্রেমের উপন্যাস হলেও এর বিশিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপট (সহিংস স্বদেশী আন্দোলন—বিনয়-বাদল-দীনেশের অভিযান, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, অ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু, হেরাবাঈ টাটার নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলন, ১৯২৬ সালে All India Women's Conference ইত্যাদি), তদানীন্তন ইওরোপীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের সংস্কৃতি এবং জীবন, তাদের এদেশের লোকেদের প্রতি ধারণা ও এদেশী উচ্চবিত্তসমাজের তাদের প্রতি ধারণার একটা সমান্তরাল চেহারার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি একটা অজানা সৌন্দর্য এবং শক্তিতে পাঠক-মনকে নাড়া দেয়।

মুখ্য দুটি চরিত্রের সত্য সম্বন্ধে ধারণারও সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি নিজের কাছে সৎ থাকবে। না থাকলেই আত্মবিরোধ দেখা দেবে আর সেই অবস্থায় তার মুক্তি সম্ভব হয় না। হিন্দুর কাছে এইটাই প্রধান কথা। সত্য এক ব্যক্তিকে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ করে। সত্য সামাজিক সংহতির ভিত্তি—এই গুণগুলো ও তার ব্যাখ্যাকে বাইবেলে বড় করে দেখানো হয়েছে। হিন্দুর কাছে এটা অপেক্ষাকৃত সামান্য মনে হয়। অহিংসা, সংযম প্রভৃতি গুণের ব্যাখ্যার গুরুত্ব সত্যের অপর গুণটাকে উল্লেখ্য বোধ করেনি। মূলত জিতেন্দ্রিয় হওয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে মোক্ষলাভের উপায়।

ভগবানের দশটি প্রধান আজ্ঞার ভেতর অন্যতম প্রধান হলো প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে না। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বাইবেলের কথার সঙ্গে তুলনীয় বাক্য মহাভারতে পাওয়া গেলেও এগুলো আমাদের ঐতিহ্যে তেমন মুখ্য স্থান লাভ করেনি, যেমন করেছে স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ। তার কারণ আমাদের মূল সুরটা অন্তর্মুখী। হিন্দুরা মনে মনে নিঃসঙ্গ।

এই বৈরাগ্যের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়ে আছে বসুধাকে কুটুম্ব হিসাবে চিন্তা। এটা আত্মীয়তাবোধের বিস্তৃতি হিসেবে শ্রদ্ধেয় কিন্তু কর্তব্যবোধের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কুটুম্ব-চিন্তায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের প্রশ্নটা নগণ্য হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক স্নেহ-ভালোবাসাকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজই চলে না, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। নাগরিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বহু মানুষের সঙ্গে সংযুক্তি যাদের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন নেই এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনশীলতা। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে অনাত্মীয় ও ভিন্ন রুচির সঙ্গে ব্যবহারে যে নীতিবোধ প্রয়োজন, প্রাচীন নীতিবোধের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে।

আত্মীয় শব্দেরও স্তরভেদ আছে। অনাত্মীয়ের অধিকারকে স্বীকৃতিই উচ্চতর স্তরে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তাই অ্যালেনের চেতনায় এবং তার সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশে প্রেম আর যুক্তির একটা দ্বান্দ্বিক বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রেমের দৃষ্টিতে সাধারণ 'বিশেষ' হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই আমরা নিজের নিজের কাছে 'বিশেষ' ; প্রেম অপরকে নিজের অংশ করে তাকে বৈশিষ্ট্য দান করে। আর যুক্তির স্বভাব হলো 'বিশেষ'কে একটা সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। যাকে আমরা অক্লেশে আত্মীয় বলে চিনি, তার প্রতি সদ্ভাবের জন্য যুক্তি প্রয়োজন হয় না। অন্য রকমটাই কঠিন।

* * * *

মির্চা এলিয়াদের জন্ম ১৯০৭ সালে রুমানিয়ার বুকারেস্ত শহরে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে বসবাস করেন। 'যোগ' সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বুকারেস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি প্রথমে রোম তারপর লিসবনে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি প্যারিসের 'লেকল দ্যোৎ এত্যুদ'এ (School for Higher Studies) আমন্ত্রিত অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তিনি সরাসরি ফরাসী ভাষায় লিখতে শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৭ সাল থেকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় ইতিহাসের অধ্যাপকের আসনে স্থায়ীভাবে মনোনীত হন।

তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি রোমান্টিক উপন্যাস—লা নুই বেঙ্গলী (Night in Bengal), ফোরে এ্যাঁতারদি (Prohibited Forest), ল্য ভোইলোম্ এলোফিসিয়ে (The Oldman and the Officer) ইত্যাদি। ধর্ম-সাহিত্যে প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হোল ল' সাক্রে এ ল' প্রফান (The sacret and the Profane), লা নস্তালজি দে জোরিজিন (Nostalgia of Origin) ইত্যাদি।

অনবধানবশত মুদ্রণ এবং অন্যান্য প্রমাদ যা যা রয়ে গেল তার জন্য দায় সম্পাদকেরই, অন্য কারো নয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সম্পাদক

প্রকাশকের কথা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম' ('ধর্ম')।

জীবন এবং সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হোল প্রেম। প্রেম আছে, থাকবে। তার রূপ, ভঙ্গী পাল্টায় সময়ের অগ্রসরতায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তবু প্রেম পুরনো হয় না, এর তীব্র আবেগ নিষ্প্রভ হয় না। প্রেমের প্রতি আমাদের আগ্রহ কমে না। বিশেষ করে সেই প্রেম যদি এক বিদেশী যুবকের সঙ্গে বাঙালী মেয়ের সেই তিরিশের দশকের হয় ; যখন আমাদের দেশ পরাধীন, সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াও বেশ মজবুত। সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত দার্শনিক-পণ্ডিত মির্চা এলিয়াদের দু-একটি রোমান্টিক উপন্যাসের মধ্যে এইটির পটভূমি কলকাতা। বিষয়বস্তুর এই অভিনবত্বই আমাদের ১৯৩৩ সালে রুমানিয়ান ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৯৫০ সালে ফরাসী ভাষায় অনূদিত এই বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশে আগ্রহী করে তোলে। এর জন্য মূল রুমানিয়ান ভাষায় প্রকাশিত এবং ফরাসী ভাষায় অনূদিত দুটি বই-ই আমাদের পাঠ এবং তুলনা করতে হয়েছে।

কলকাতার Alliance Francaise-এর ডাইরেক্টর Monsieur Michel Carriere-এর সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হোত কি না সন্দেহ আছে। উনি শুধু বইটি দিয়েই সাহায্য করেননি, উনি দিল্লীর Ambassade de France En Inde-এর Publications Adviser Mr. Rajesh Sharma'র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। Mr. Rajesh Sharma ফ্রান্স থেকে বইটি বাংলায় প্রকাশের অনুমতি সংগ্রহে এবং অন্যান্য ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ কলকাতার Alliance Francaise-এর Smt. Ranu Purakaistha'র আগাগোড়া আন্তরিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। বইটি প্রকাশে উনি বিভিন্ন প্রকারে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমাদের অন্যতম অনুদেক শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশের মূল্যবান পরামর্শ এবং শ্রম অবশ্য স্বীকার্য।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমে বইটির প্রচ্ছদ, পরিমার্জনা, পুনর্লিখন এবং সম্পাদনা করেছেন শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ 'চলচ্চিত্রে অভিনয়' যে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত তা প্রকাশের গৌরব আমাদের সংস্থারই।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটির অসম্ভব জনপ্রিয়তাহেতু অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হলো।

বর্তমান সংস্করণে মূল পাঠক্রমের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধনের প্রচেষ্টা ছাড়া উল্লেখযোগ্য হলো, ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পেয়েছি। বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত ছাড়া একটা সাধারণ অভিযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বাংলায় অনূদিত এই উপন্যাসে কয়েকটি প্রধান চরিত্রের নাম মূল গ্রন্থানুযায়ী রাখা হলো।

এপ্রিল ১৯৮৮ সম্পাদক

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

'লা নুই বেঙ্গলী'র পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এ সংস্করণের মুদ্রণ পারিপাট্য পাঠক সাধারনের দৃষ্টি এড়াবে না। পূর্ববর্তী দুটি সংস্করণের দ্রুত নিঃশেষ এবং পাঠক সমাজে এ গ্রন্থের সমাদর আমাদের অভিভূত করেছে। পরিমার্জনার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাবন্ধিক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বইটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে সাহায্য পেয়েছি আমার ভ্রাতা শ্রী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এ বিশ্বাস আছে এ-সংস্করণটিও পাঠকদের খুশি করবে।

—প্রকাশিকা

.... Tomar Ki mané acché ?...
Yadi thaké, tahalé Ki
Kshama Karté Paro ?...

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সঠিক তারিখটা মনে না থাকায়, কাহিনীটা কোথা থেকে শুরু করবো ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যি বলতে কি সে বছরে আমার ডায়েরিতে এ বিষয়ে কিছুই লেখা নেই। অনেক পরে স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পাবার পর তার নাম ডায়েরিতে পেলাম। আমি তখন থাকতাম ভবানীপুরে, নরেন্দ্র সেনের বাড়ি। সেটা ১৯২৯ সাল। সে বাড়িতে মৈত্রেয়ীকে আমি দেখেছি অন্তত দশমাস আগে। কাহিনী শুরু করবার সময় আমার অস্বস্তি একটাই। আমি মৈত্রেয়ীর সে সময়কার মুখ, কেন জানি না, ঠিক মনে করতে পারছি না। তাছাড়া আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সেই বিস্ময়, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর উদ্বেলতার কথা আমি কী করে ভাষায় প্রকাশ করবো তাও বুঝতে পারছি না।

মনের মধ্যে শুধু তার একটা অস্পষ্ট স্মৃতিই এতকাল ধরে রেখেছিলাম, অক্সফোর্ড বুক অ্যাণ্ড স্টেশনারি স্টোর্সের সামনে, মোটরে অপেক্ষমাণ মৈত্রেয়ীর সেই চেহারা। তার বাবা আর আমি 'বড়দিন' উপলক্ষে কিছু বই পছন্দ করতে সেখানে ঢুকে ছিলাম। মনে আছে সেদিন তাকে প্রথম দেখে এক অস্বস্তিকর শিহরণ হয়েছিল আমার শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিতৃষ্ণার ভাবও এসেছিল। কৌতূহলও যে হয়নি এমন নয়। আমার কৌতূহলী চোখ দেখেছিল তার কালো রঙের খুব বড় বড় চোখ আর পুরু ঠোঁট। আর দেখলো উন্নত বুক যা বাঙালী কুমারী মেয়েদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খুব দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যায় ....মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। আমাকে নমস্কার করার সময় সে যখন কপালে হাত ঠেকালো, আমি দেখলাম তার দুটি নরম বাহু। তার গায়ের রঙ অনুজ্জ্বল, বাদামী, মাটি আর মোমের যেন সংমিশ্রণ।

সে সময়ে আমি থাকতাম ওয়েলেসলী স্ট্রীটের 'রিপন ম্যানসনে'। আমার পাশের ঘরে থাকতো 'হ্যারল্ড কার'। হ্যারল্ড ছিল 'আর্মী-নেভী' স্টোর্সের কর্মচারী আমরা দুজনে ছিলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার সঙ্গে কলকাতার অনেক পরিবারের পরিচয় ছিল। তার সঙ্গে আমি অনেক সন্ধ্যা এইসব পরিবারদের বাড়িতে কাটিয়েছি সপ্তাহে একদিন যুবতী মেয়েদের আমরা আমাদের নাচের আসরে আনতাম।

মৈত্রেয়ীর নরম বাহু আর তার অদ্ভুত কালচে বাদামী গায়ের রঙের কথা আমি হ্যারল্ডকে জানাবো ভাবছিলাম। হাত দুটো আমার কাছে সত্যিই পুরুষালি লেগেছিল এবং সেজন্য অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। আসলে এ বিষয়ে আমার

যা মনে হয়েছিল, তা আমি ওর কাছে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলাম।

দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। হ্যারল্ড তখন দাড়ি কামাচ্ছিল। ওর পা দুটো তখন একটা ছোট টেবিলের ওপর তোলা। সামনে ছোট আয়না, চায়ের কাপ আর হাল্‌কা বেগুনি রঙের নাইট গাউন, যাতে জুতোর কালির দাগ। মনে আছে এ জন্য ও ওর চাকরকে মেরে রক্ত বার করে দিয়েছিল, অথচ সে বেচারীর কোনো দোষ ছিল না, একদিন রাত্রিবেলা Y.M.C.A.-তে নাচের পর মত্ত অবস্থায় সে নিজেই নাইট-গাউনটা নোংরা করে দিয়েছিল। যাই হোক, আমি দেখছিলাম, তার অগোছালো বিছানার ওপর কয়েকটা খুচরো পয়সা পড়ে আছে। আর আমি তখন কাগজ পাকিয়ে সরু করে পাইপের মুখ পরিষ্কার করার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম।

আমার কথা শুনে সে বললে, না রে অ্যালেন, একটা বাঙালী মেয়েকে তোর ভালো লাগবে কি করে? ওদের দেখলে গা ঘিনঘিন করে, ওদের সঙ্গও বিরক্তিকর। আমি তো এখানে জন্মেছি। আমি ঐসব মেয়েদের তোর চাইতে অনেক ভালোভাবে জানি। বিশ্বাস কর, ওরা এতো নোংরা, যে ওদের সম্বন্ধে আর কিছু ভাবা যায় না, আর প্রেম? সে তো একেবারেই চলে না। আর তাছাড়া ওই মেয়েটা তোকে কোনোদিন ও পাত্তা দেবে ভেবেছিস্!

আসলে হ্যারল্ডই ওই ভুল করেছিল। আমি ভালোভাবে এক বাঙালী তরুণীর বর্ণনা করেছি, তাই শুনেই সে ধরে নিয়েছিল যে, আমি তাকে ভালোবাসতে চাইছি। হ্যারল্ড, সব অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতই নির্বোধ আর গোঁড়া। কিন্তু বাঙালী মেয়েদের নিয়ে ওর রূঢ়, নির্বোধ সমালোচনা আমার মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। বসে থাকতে থাকতেই আমার অস্পষ্ট ধারণা হলো যে মৈত্রেয়ীর স্মৃতি ইতিমধ্যেই ক্ষণিকের জন্য হলেও আমার বাসনা-কামনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এই আবিষ্কার আমায় একাধারে খুশি করলো আবার বিচলিতও করলো। যন্ত্রচালিতের মত পাইপ পরিষ্কার করতে করতে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম।

এইসব কথা আমার ডায়েরিতে আমি কিন্তু কিছুই লিখে রাখিনি। না লিখলেও সেইসব মুহূর্তগুলো আবার আমার স্মৃতিতে ফিরে এসেছিল। বিশেষ করে সেই দিনটির কথা, যে দিন রাত্রে আমি জুঁই ফুলের মালা উপহার পেয়েছিলাম মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে।

তখন আমি ভারতে সবেমাত্র আমার চাকরি-জীবন শুরু করেছি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়েই এসেছি এদেশে। রোটারী ক্লাবের মেম্বার আমি, সে

গর্বও ছিল, আর ছিল আমার জাতীয়তাবোধ, পাশ্চাত্যে আমার জন্মের অহংকার ইত্যাদি। আমার সে সময়ে পাঠ্য ছিল পদার্থবিদ্যা, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞানের বই। এ সব পড়তাম অথচ ছেলেবেলায় কল্পনা করতাম মিশনারী হবো আমি। আরও একটা অভ্যাস ছিল আমার। যত্নের সঙ্গে লিখতাম আমার প্রিয় ডায়েরি।

এদেশে আমি এসেছিলাম Noel & Noel কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে। এখানে টেক্‌নিক্যাল ড্রাফট্‌সম্যান হিসাবে বদ্বীপে খাল খননের কাজে যোগ দিয়েছিলাম। এখানেই পরিচয় হলো এডিনবার্গের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এবং কলকাতার অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি, মৈত্রেয়ীর বাবা নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে। আমার জীবনের পরিবর্তনের সূত্রপাত ঠিক সেখান থেকেই। আমার আয় হয়তো তুলনায় অল্প ছিল, কিন্তু আমার কাজে আমি আনন্দ পেতাম। ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিসের মধ্যে ছোট্ট উনুনে রান্না করা, অসংখ্য কাগজে সই করা অথবা তার মর্মোদ্ধার করা, গ্রীষ্মের প্রতি সন্ধ্যায় স্নায়বিক অবসাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাতাল হওয়ার একঘেয়ে রুটিন-জীবন। দুতিন সপ্তাহ অন্তরই বাইরের কাজে যেতে হতো। আর যখন যেতাম, তখন মুক্তি পেতাম ঐ একঘেয়েমি থেকে। তমলুকের নির্মাণকার্যের প্রাথমিক দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত ছিল। প্রতিবারই অফিস থেকে কর্মক্ষেত্রে এসে যখন দেখতাম বাঁধগুলো আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, তখন আমার মন আনন্দে ভরে উঠতো।

সে সময়টা সত্যিই সুখের সময় ছিল। ভোরবেলা হাওড়া-মাদ্রাজ এক্সপ্রেস ধরে প্রাতরাশের আগেই কাজের জায়গায় পৌঁছে যেতাম। স্টেশনটা ছিল যেন [illegible] বন্ধুর মতো। তাছাড়া ভারতে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ যথেষ্টই [illegible] মেরুণ রঙের হেলমেটটা প্রায় চোখের ওপর নামিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে গটগট্‌ করে হেঁটে যেতাম, বগলে গোটা পাঁচেক ইলাস্ট্রেটেড ম্যাগাজিন, হাতে দুপ্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট আর পেছনে [illegible] চাকর। তমলুকে থাকাকালীন আমি বড্ড বেশি সিগারেট কিনতাম এমনকি প্ল্যাটফর্মের সিগারেট স্টলগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় তখনই মনে হতো সিগারেট বোধ হয় যথেষ্ট কেনা হয়নি। একদিনের বিশ্রী [illegible] ভুলবো না। সিগারেটের অভাবে মজুরদের কাছ থেকে খৈনী নিয়ে [illegible] করতে গিয়ে আমার সারা অঙ্গে সে কী কাঁপুনি। আমি কখনই [illegible] সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করতাম না। মোট কথা, আমার সহযাত্রী

বলতে যারা ছিল, তারা অক্সফোর্ডের মাঝারি ধরনের ছাত্র, অথচ এখানকার 'বড় সাহেব', যাদের পকেটে সর্বদাই থাকতো ডিটেকটিভ উপন্যাস, আর নয়তো এমন সব ভারতীয় বড়লোক, যারা টাকার জোরে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণে অভ্যস্ত হলেও তখনও ঠিকমতো কোট পরতে আর দাঁত মাজতে শেখেনি। তার থেকে আপন মনে জানালার বাইরে তাকিয়ে বাংলার সমতল ভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করা ছিল অনেক আনন্দের।

একমাত্র সাদা চামড়ার মানুষ বলেই আমার কর্মস্থলের ওপর ছিল আমার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। কয়েকজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অবশ্য ছিল, যারা ব্রীজের কাজই মূলত দেখা শোনা করতো, কিন্তু তারা কখনই আমার সমমর্যাদা পেত না। তারা ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতো এবং ওখানকার রীতি অনুযায়ী খাকী রঙের ছোট হাফ প্যান্ট আর বড় বড় পকেটওয়লা খাকী রঙের হাফসার্ট পরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে মজুরদের গালিগালাজ করতো। অপর পক্ষে আমার হিন্দী উচ্চারণ ছিল খুবই খারাপ আর ভাষাটাও হতো বেশ অশুদ্ধ। কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না। শ্রমিকদের ওপর আমার প্রভাব ছিল অন্য কারণে। কারণটা হলো আমি বিদেশী। সুতরাং আমার বক্তব্য অভ্রান্ত এবং শ্রেষ্ঠ, এটাই ছিল অবধারিত। সারাদিন ওদের সঙ্গে বক্‌বক্‌ করে, সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরে লেখালেখির কাজ সেরে শেষে পাইপটা ধরিয়ে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করা, এটাই ছিল আমার প্রাত্যহিক কর্ম। সমুদ্রের ধারে তালগাছের সারি আর উগ্র গন্ধযুক্ত ঝোপঝাড়ওয়ালা এই সমতল জায়গাটায় সাপের উপদ্রব যথেষ্ট থাকলেও আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। হট্টগোল কোলাহল থেকে দূরে নির্জন, নিস্তব্ধ এই জায়গাটা আমার মনে এনে দিতো এক অসীম প্রশান্তি। নীল আকাশের নিচে এই সবুজ পরিত্যক্ত সমতলভূমি যেন ভ্রমণকারীদের জন্যে বিষণ্ণ প্রতীক্ষায় থাকতো। তখনকার দিনগুলো ছিল যেন অবকাশযাপনের সময়ের মতো আনন্দমুখর। প্রচুর উৎসাহ। আমার ওপর কর্তৃত্ব করার কেউ ছিল না। ডাইনে বাঁয়ে হুকুম চালাতাম। শুধু অভাব ছিল একজন বুদ্ধিমান সঙ্গীর। তেমন সঙ্গী যদি কেউ তখন থাকতো তাহলে হয়ত তাকে আমি অনেক বিস্ময়কর কিছু শোনাতে পারতাম।

ঘটনাচক্রে একদিন লুসিয়্যাঁ মেজ-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আমি রোদে পুড়ে ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে প্ল্যাটফর্মের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছি, আমার চাকর গেছে ট্যাক্সি ডাকতে, আর এদিকে তখন সবে বম্বে এক্সপ্রেস এসে পৌঁছেছে। তার ফলে হাওড়া স্টেশনে প্রচণ্ড ভীড়। এর মধ্যে দেখা

লুসিয়্যাঁর সঙ্গে।

লুসিয়্যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ বছর দুয়েক আগে এডেন বন্দরে। জাহাজ কয়েক ঘণ্টার জন্য থেমে ছিল। আমি যাবো ভারতবর্ষের পথে আর লুসিয়্যাঁ মিশরে যাবার জন্য একটা ইটালিয়ান জাহাজের অপেক্ষায়। যদিও সে ছিল একটু বেশি মাত্রায় দাম্ভিক তবু তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রতিভাবান এই সাংবাদিককে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। জাহাজে বসেই সে তখন একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখছিল, দেশের মূল্যতালিকা আর সেই বন্দরের মূল্যতালিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে। লুসিয়্যাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা ছিল অসাধারণ। একঘণ্টা মাত্র একটা মোটরে ঘুরে, যে-কোনও একটা শহর সম্পর্কে সে নিখুঁত বিবরণ লিখতে পারতো। যে সময়ে তার সঙ্গে আমার আলাপ, তখন তার একাধিকবার ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, জাপান ঘোরা হয়ে গেছে। যারা মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা করতো তাদের সঙ্গে সে ছিল একমত। তবে সেটা মহাত্মাজী যা করেছিলেন তার জন্য নয়, উনি যা করতে পারতেন অথচ করেননি, সেই ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিল তীক্ষ্ণ যুক্তিভিত্তিক।

আমাকে হঠাৎ দেখে কিছুমাত্র অবাক না হয়ে লুসিয়্যাঁ ফরাসী ভাষায় চিৎকার করে উঠলো, হ্যালো অ্যালেন! সেই ভারতেই রয়ে গেছিস? শোন, লোকটাকে বলে দে তো, আমার ইংরেজী না বোঝার সুযোগ নিয়ে আমাকে কোনো হোটেলে না তুলে দেয়। সোজা Y.M.C.A.-তেই যেন নিয়ে যায়। ভারতের পটভূমিতে একটা বই লিখছি। বইটা সাকসেসফুল হবেই। উত্তেজিত উপন্যাসে রাজনীতির মশলা মেশানো। শোনাবো তোকে।

আধুনিক ভারতের ওপর লুসিয়্যাঁর একটা বই লেখার ইচ্ছে অনেক দিনের। এর জন্য কয়েক মাস ধরে সে বিভিন্ন লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। অঞ্চলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছে, অনেক ছবিও তুলেছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা Y.M.C.A. হোটেলে গিয়ে তার অ্যালবাম গুলো দেখলাম এবং বুঝলাম একমাত্র ভারতীয় নারীদের ব্যাপারটাই তাকে কিছুটা অসুবিধায় ফেলেছে এ ব্যাপারে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। পর্দার অন্তরালে যাদের জীবন-যাত্রা চলেছে তাদের সম্পর্কে লুসিয়্যাঁর ধারণা ছিল স্বাভাবিকভাবেই খুব অস্পষ্ট। তাদের নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে তার কিছুই জানার আগ্রহ ছিল না। বিশেষতঃ সে খুবই কৌতূহলী ছিল বাল্যবিবাহ সম্পর্কে অনেক বার সে আমাকে প্রশ্ন করেছে যে, এদেশে আট বছরের মেয়েদেরও বিয়ে দেওয়া হয় কিনা। অস্বীকার করতে পারিনি, কারণ এ ঘটনার

উল্লেখ আমি এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বইতে পড়েওছি, যিনি এখানে প্রায় তিরিশ বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটের মত দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন।

এসব ব্যাপার আলোচনা করতে করতে ঘেরা বারান্দার লাউঞ্জে একটা সুন্দর সন্ধ্যা কেটেছিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ কোনো ধারণা বা জ্ঞান আমি দিতে পারলাম না। আমি নিজেও এদেশের নারীদের চিনতাম না। কদাচিৎ তাদের সিনেমা হলে অথবা সভা-সমিতিতে দেখেছি। ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি মাথায় এলো, যদি নরেন্দ্র সেনকে অনুরোধ করি আমার বন্ধুকে চায়ের নিমন্ত্রণ করতে, তাহলে হয়ত লুসিয়্যাঁ তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেও পেতে পারে। আর সেই সুবাদে আমিও মৈত্রেয়ীকে হয়ত কাছ থেকে দেখার একটা সুযোগ পেতে পারি। সেই অক্সফোর্ডের দোকানের সামনে প্রথম দেখা হয়েছিল, তার পরে তাকে আর আমি দেখিনি। মিঃ সেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল আন্তরিকতার, যদিও তা সীমাবদ্ধ ছিল অফিসের কাজকর্ম এবং গাড়িতে একসঙ্গে যাতায়াতের সময় কথাবার্তার মধ্যে। অবশ্য এর মধ্যে দুবার তিনি আমায় তাঁর বাড়িতে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু তখন আমার অবসর সময়ের পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যার আকর্ষণ কাটিয়ে ওঁর বাড়ি যেতে পারিনি।

আমি মিঃ সেনকে জানালাম, লুসিয়্যাঁ ভারতের ওপর একটা বই লিখছে যেটা প্যারিস থেকে প্রকাশিত হবে এবং এব্যাপারেই সে ওঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চায়। মিঃ সেন সানন্দে রাজী হলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন। আনন্দের সঙ্গে লুসিয়্যাঁকে খবরটা জানালাম। লুসিয়্যাঁ কোনো দিনই কোনো সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ের বাড়িতে ঢোকেনি, তাই সে নিজে মনে মনে তৈরি হতে লাগালো একটা নিখুঁত বিবরণ নেওয়ার জন্য। লুসিয়্যাঁ আমায় প্রশ্ন করলো—মিঃ সেনেরা কী জাত?

—ব্রাহ্মণ, তবে যতটা সম্ভব কম গোঁড়া। রোটারি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য, ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্য, চমৎকার টেনিস প্লেয়ার এবং নিজের গাড়ি অধিকাংশ সময় নিজেই চালিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ হলেও মাছ মাংস খান ; বাড়িতে অতিথি এলে, এমন কি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলেও স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। আমি নিশ্চিত, মিঃ সেনকে তোর ভালো লাগবেই।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে ভবানীপুরে তাঁর বাড়ি আমি অফিসের প্রজেক্ট-প্ল্যান নিতে যাওয়ার সময় গাড়ি থেকে দেখলেও, বাড়ির ভেতরে যে জিনিস-পত্র আমি দেখলাম তা আমাকে লুসিয়্যাঁর চেয়ে কম

বিস্মিত করেনি। দরজায় স্বচ্ছ পর্দা, নরম কার্পেটে ঢাকা মেঝে ; কাশ্মিরী উলের কাপড় দিয়ে ঢাকা সোফা। সোফার পাশে ছোট ছোট এক পায়াওয়ালা টেবিল। টেবিলে চায়ের কাপ আর এক ধরনের খাবার রাখা, যাকে ঠিক 'কেক' না বলে 'পিঠে' বলা ভালো, ভারতীয়রা তাই বলে থাকে বটে। মিঃ সেন নিজেই ওগুলো পছন্দ করেছেন যাতে তাঁর অতিথিকে তিনি স্থানীয় খাদ্য সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল করতে পারেন।

আমি অবাক হয়ে ঘরটা দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র ইওরোপ থেকে ভারতের মাটিতে পা দিলাম। দুটো বছর এদেশে কাটালেও আমার কখনও ইচ্ছা হয়নি একটা বাঙালী পরিবারের অন্দর মহলের জীবনটা জানতে, এমন কি আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা না হোক, তাদের শিল্পকর্মগুলো সম্পর্কেও বুঝতে বা তাদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে। এ যাবৎ ঔপনিবেশিক প্রভুর জীবনই যাপন করেছি অফিসে বা কোম্পানির কর্মক্ষেত্রে। কাজ নিয়ে ব্যস্ততা, অবসরে বই পড়া অথবা সেই সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে সময় কাটানো, যা আমার নিজের দেশেও এমন কিছু দুর্লভ বস্তু ছিল না। সে দিন বিকেলেই আমার মনে এই সব প্রশ্ন ভীড় করে এলো। লুসিয়্যাঁ অত্যন্ত উৎসাহভরে কোনো কোনো ব্যাপারে আমার মতামত চেয়ে নিজের অনুভূতি আর পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি যাচাই করতে দেখছিল। মিঃ সেনের কথাবার্তা সে ঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা তা-ও যাচাই করছিল। আমি ক্রমশ চিন্তার ভীড়ে ডুবে যাচ্ছিলাম। সে সময়ের ডায়েরিতেও কিছু লিখিনি, তাই আজ বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারছি না, সেদিন গোধূলিলগ্নে মৈত্রেয়ী আমার মনে কি ধরনের ছাপ ফেলেছিল। আজ ভাবতে খুবই অবাক লাগে, সে দিন সেই সব মানুষদের সম্পর্কে এতটুকু ধারণা করতে আমি কী করে সক্ষম হইনি যারা কিছুকাল পরেই আমার জীবনধারা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেবে।

কিনে চা-রঙের স্বচ্ছ শাড়ি, রূপোলী জরির কাজ করা চটি, গায়ে চেরী-লাল রঙের শালে তাকে খুবই সুন্দরী মনে হচ্ছিল। তার কুঞ্চিত কালো কেশরাশি, গভীর কালো চোখ, আরক্তিম অধর, যৌবন-উদ্বেলিত শরীর দেখে মনে হচ্ছিল, তা যেন বাস্তব হয়েও পুরোপুরি বাস্তব নয়! অদম্য কৌতূহলী চোখ মেলে তাকে আমি দেখছিলাম। রেশমের মত লঘু তার অঙ্গ সঞ্চালন, লজ্জাভীত, ভয়মিশ্রিত মৃদু হাসি, নতুন নতুন সুরধ্বনিতে বেজে ওঠা কণ্ঠস্বর সব কিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছিল এই মহান সৃষ্টির মধ্যে কতই না রহস্য লুকিয়ে আছে! মৈত্রেয়ীর ইংরেজী ছিল বিশুদ্ধ, কিন্তু স্কুল-ঘেঁষা। কিন্তু

যতবারই সে মুখ খুলছিল, আমি আর লুসিয়্যাঁ তার দিকে না তাকিয়ে পারছিলাম না।

চায়ের স্বাদ ছিল আশাতীতভাবে উপাদেয়। প্রত্যেকটা খাবার চেখে দেখে লুসিয়্যাঁ সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে জ্ঞাতব্য তথ্য টুকে নিচ্ছিল। প্রশ্ন করছিল ভাঙা ইংরেজীতে। মিঃ সেন অবশ্য বলছিলেন যে তিনি ফরাসী বোঝেন, তাঁকে দুবার প্যারিসে কনফারেন্সে যোগদান করতে হয়েছে এবং তাঁর লাইব্রেরিতে কিছু ফরাসী উপন্যাসও আছে। লুসিয়্যাঁ তাঁকে অত্যন্ত চল্‌তি ফরাসীতেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেছিল। আর মিঃ সেন তার উত্তরে মৃদু হেসে 'তা বটে, তা বটে' গোছের উত্তর দিচ্ছিলেন আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন পরম পরিতৃপ্তির দৃষ্টিতে।

লুসিয়্যাঁ, হঠাৎ মৈত্রেয়ীর পোশাক আর অলঙ্কার কাছ থেকে দেখতে চেয়ে বসলো। মিঃ সেন সানন্দে রাজী হলেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী ভয় পেয়ে জানালার দিকে সরে গেল। ভয়ে তার ঠোঁটটা তখন কাঁপছিল। লুসিয়্যাঁ ওর কাছে গিয়ে অলঙ্কারগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করে গভীর বিস্ময় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রশ্ন করে চলেছিল আর উত্তরগুলো টুকে নিচ্ছিল। মৈত্রেয়ীর পা থেকে মাথা অবধি কাঁপছিল আর সে কোন্ দিকে যে তখন দৃষ্টি রাখবে তা বুঝতে পারছিল না। এক সময় তার চোখ আমার চোখের ওপর পড়লো। তার চোখে চোখ রেখে আমি মৃদু হেসে ইঙ্গিতে তাকে আশ্বস্ত করলাম। সে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এবং ক্রমশ শান্ত হয়ে এলো। মনে হলো যেন সে খুঁজে পেয়েছে তার নির্ভরতার বন্দর। কতক্ষণ যে সে তাকিয়ে ছিল তা বলতে পারবো না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, এ যাবৎ বিনিময় করা দৃষ্টির সঙ্গে সে-দৃষ্টির কোনো মিল ছিল না। লুসিয়্যাঁর দেখা শেষ হলো। মৈত্রেয়ী তার জায়গায় ফিরে গেল, কিন্তু পরস্পরের দিকে তাকানো আমার সেই মুহূর্ত হয়ে রইলো অতি গোপন আর উষ্ণ এক অভিজ্ঞতা।

মৈত্রেয়ীর থেকে দৃষ্টি এড়াতে আমি তার বাবার দিকে মনোযোগ দিলাম। কিন্তু তাঁকে কেমন যেন নিষ্প্রভ আর ভাবলেশহীন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কাছ থেকে তাঁকে আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। প্রকাণ্ড একটা মুখে বড় বড় দুটো কুৎকুতে চোখ, কালো মাথাটা যেন একটা হাঁড়ির মতো। নিচু কপাল, কালো কয়লার মত কোঁকড়ানো চুল, ঝোলা কাঁধ, বেঢপ ভুঁড়িওয়ালা পেট, বেঁটে পা, এই সব দেখে আমার একটা কোলা ব্যাঙের কথা মনে পড়লো। এই মানুষটার ভেতরেও যে স্নেহ, সহানুভূতির প্রাচুর্য আছে, তা

বোঝাই দুষ্কর ছিল। তবুও মানুষটাকে আমার সম্মোহক, বুদ্ধিমান, দক্ষকর্মী, খোসমেজাজী, শান্ত আর সৎ মনে হলো।

এরকম সময় তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো। কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হোল মিসেস সেন যেন এক অকারণ ভয়ের ভাব নিয়ে এলেন। তাঁর পরনে ছিল নীল রঙের শাড়ি আর গায়ে ছিল সোনালী কাজ করা নীল শাল। তাঁর পায়ে কোনো জুতো ছিল না। পায়ের পাতা আর আঙুল ছিল আলতা-রঞ্জিত। তিনি ইংরেজী প্রায় জানতেন না বললেই হয়, আর বোধ হয় সেজন্যই কথার বদলে মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলেন। সেদিন বোধ হয় তিনি খুব পান খেয়ে ছিলেন, তাই তাঁর ঠোঁট ছিল রক্তিম। তাঁকে এত কম বয়সী, লজ্জাশীলা আর সজীব লাগছিল যে তাঁকে অনায়াসে মৈত্রেয়ীর মা না বলে বড় বোন হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যেতো। তাঁর মেজো মেয়ে ছবু সেই সময়ে ঘরে এলো। তার বয়স আন্দাজ দশ-এগার হবে। চুল ছোট করে ছাঁটা, ইওরোপীয়ান পোশাক পরা। কিন্তু পায়ে কোনো জুতো ছিল না।

তার নগ্ন পা, বাহু, সুন্দর কালচে মুখ, আমাদের দেশের বোহেমিয়ান মেয়েদের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল।

এরমধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেল। তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। ঘরের মধ্যে তিনটি মহিলা প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে, সবার মুখেই বাইরের লোকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য এক ভয়ার্তভাব, আর মিঃ সেন তাদের স্বাভাবিক হতে আর কথা বলাবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। মিসেস সেন চা পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎই মত পাল্টে তিনি বড় মেয়েকে বললেন আমাদের চা দিতে। জানি না কার দোষে ঘটল অঘটন। হঠাৎ চায়ের পট উল্টে গিয়ে পড়লো লুসিয়্যাঁর প্যান্টের ওপর। গরম চায়ে ভিজে গেল তার প্যান্ট। তাকে সাহায্যের জন্য সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিঃ সেন তাঁর শান্ত ভাব হারিয়ে চিৎকার করে বাংলায় সবাইকে প্রচণ্ড বকাবকি করতে শুরু করলেন। লুসিয়্যাঁ ফরাসীতে কিছুই হয়নি বলে সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কে তার ভাষা বুঝছে বা কথা শুনছে। মিঃ সেন ভাঙা ফরাসীতে লুসিয়্যাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাকে অন্য জায়গায় বসতে অনুরোধ করলেন। সোফার রেশমের ঢাকাটা বদলাবার জন্য মেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিঃ সেন ক্রমাগত তাদের বকেই যেতে লাগলেন। এদিকে আমার আর লুসিয়্যাঁর অবস্থা হলো শোচনীয়। সে মুহূর্তে আমাদের

যে কী করণীয়, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। যদিও ফেরবার পথে লুসিয়্যাঁ ঘটনাটা নিয়ে দারুণ হাসাহাসি করছিল, কিন্তু ঘটনাটা ঘটবার সময় তার মুখ যা হয়েছিল তা দেখবার মতো। সে সময়ে একমাত্র মিসেস সেনকেই দেখেছিলাম অচঞ্চল।

কথাবার্তা আর বেশিক্ষণ জমেনি। মিঃ সেন লুসিয়্যাঁকে তাঁর কাকার কথা বললেন। তাঁর কাকা ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত। সরকারি স্বীকৃতিও তাঁর ছিল। কাকার সংগ্রহের বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি দেখালেন। আমরা ওঁদের পারিবারিক ছবির অ্যালবাম দেখলাম। পরে ওঁর সংগ্রহের প্রাচীন কিছু শিল্পনিদর্শনও উনি দেখালেন।

জানালার বাইরে বাড়ির উঠোনটা দেখা যাচ্ছিল। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ছোট ছোট পাতাবাহারি গাছ, লতানে গাছের ফুল। আরেক দিকে একটা তাল গাছ মাথা তুলে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল। হাওয়ায় তার পাতা কাঁপছিল। এতদিন কলকাতায় আছি, কিন্তু এই নিস্তব্ধ অন্দর মহলের অভ্যন্তরে কোথা দিয়ে যেন এক আনন্দস্রোত বয়ে যাচ্ছিল তা আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে আসছি, এমন সময়ে হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেঙে ভেসে এলো এক সম্মিলিত হাসির রোল। মহিলা-শিশু কণ্ঠের সেই হাসির আওয়াজ সরাসরি আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। শিহরণ এলো শরীরে, মনে। ফিরে তাকাতেই আমার চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রায় বিবস্ত্র মৈত্রেয়ী উপুড় হয়ে পড়েছে উঠোনের সিঁড়ির ধাপে। চুলগুলো মুখের ওপর, হাত দুটো বুকের কাছে। হাসির দমকে তার শরীর কাঁপছে। হাসতে হাসতে সে গোড়ালির এক এক ঝটকায় পায়ের চটি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল সামনের দেওয়ালের দিকে। তাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার যেন আশ মিটছিল না। মনে হচ্ছিল সেই কয়েক মিনিট সময় অনন্তে পর্যবসিত হোক। তার হাসি, শৃঙ্খলমুক্ত দেহের বন্য আগুন, এসব দেখা উচিত ছিল কিনা আমি জানি না, তবে সে-জায়গা ছেড়ে নড়বার শক্তিও যেন আমার ছিল না।

অনেক ঘর পার হয়ে সদর দরজা অবধি আসার পরও উদ্দাম হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

২.

তখন আমি তমলুকে বাঁধ-নির্মাণ ক্ষেত্রে তাঁবুতে থাকতাম।

দিন দুয়েক আগে জরিপের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। ফলত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহলে যা হয়, সারা রাত ধরে হৈ হল্লা চলেছে। নাচ, গান, তার সঙ্গে অফুরন্ত মদ। মেয়েরাও ছিল। রাতের শেষে অন্ধকার থাকতে থাকতেই লেকে বেড়াতে যাওয়া। গত মার্চ মাসের ঘটনাটা মনে পড়লো। এডি হিগারিং-এর সঙ্গে আমার তর্ক বেধেছিল। তর্ক থেকে তা ঘুষোঘুষি অবধি গড়িয়েছিল। নরিনের সঙ্গে প্রেমপর্বও সে সময়কারই ঘটনা। উঠতি যৌবনের প্রেমের উচ্ছ্বাস যে রকম হয় আর কী! যখন ইচ্ছে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া, এ অবধিই।

নদীর ধারে, এক হাতে পাইপ, অপর হাতে ছড়ি নিয়ে ধীর পায়ে বেড়াচ্ছিলাম। সূর্য তখনও আকাশে আগুন ছড়ায়নি। বাতাসে ধুনো আর দারচিনির মিষ্টি গন্ধ; বড় বড় কাঠগোলাপ গাছের তলায় পাখিদের কিচির-মিচির। বিস্তীর্ণ তটভূমিতে কেউ কোথাও নেই। আমি একা। এই একাকীত্বই কি শাশ্বত! একাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে চিন্তা কিন্তু আমার মনে বিষাদ এনে দেয়নি। সেই সমতলভূমিরই মতো আমার মন ছিল শান্ত, তৃপ্ত। সে সময় আমায় কেউ যদি বলতো যে আমার আয়ু আর মাত্র এক ঘণ্টা, তবু আমি তখনই ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তাম মাথার তলায় হাত দুটো রেখে। মাথার ওপরে অনন্ত আকাশের নীল-সমুদ্রের দিকে অপলকে চেয়ে থাকতাম। উপভোগ করতাম প্রত্যেকটা মুহূর্ত।

জানিনা কোন্ বোধ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন সব কিছুই করতে পারি। আমি সর্বশক্তিমান, অথচ আমি সব কামনা থেকেই বিযুক্ত একটা অস্তিত্ব। সেই বিস্ময়কর জগতে আমার একাকীত্বের তীব্রতা আমাকে একেবারে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল। ভাবছিলাম হ্যারল্ড, নরিন, এই সব মানুষের কথা। কী করে এরা আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো! এদের মতো গতানুগতিক আর প্রাণহীন জীবন তো আমার নয়!

একদিকে একাকীত্ব, অন্যদিকে শান্তির তৃষ্ণা—এই নিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে এলাম। ভাবতে ভালো লাগছিল যে আরও এক সপ্তাহ এই তাঁবুতেই থাকতে পারব; ইলেক্ট্রিক বাল্ব্ দেখতে হবে না, পত্রপত্রিকার খবর আমার শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে এসে হাজির হবে না। এমন সময়, আমার বেয়ারা এসে দিল তার হাতে কলকাতা থেকে আসা একটা টেলিগ্রাম। অফিসের

কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু নির্দেশ আন্দাজ করেই ওটা সঙ্গে সঙ্গে খোলার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিছুক্ষণ বাদে অবসর পেয়ে যখন ওটা খুললাম এবং পড়লাম, তখন কিছুক্ষণের জন্যে আমার মাথা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। নরেন্দ্র সেন টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র আমায় কলকাতা ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন।

বাধ্য হয়ে সেই দিনই বিকেলের গাড়িতে রওনা হতে হলো। জানালা দিয়ে সরে যেতে লাগল দৃশ্যাবলী—আমার প্রিয় দৃশ্যাবলী—কুয়াশাচ্ছন্ন সমতল-ভূমিতে তখন পড়েছে শ্রেণীবদ্ধ তালগাছের নিভৃত স্বল্প ছায়া। মন ভারী হয়ে উঠছিল। সকালের কথা মনে পড়ছিল বার-বার। এই প্রকৃতি, যে আমাকে আজই সাদর উষ্ণ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল উদ্দেশ্যহীনভাবে তার গহীন নির্জনতায় ঘুরে বেড়াতে! ভীষণ ইচ্ছে করছিল আবার ফিরে যাই কেরোসিনের আলোয় আলোকিত আমার সেই তাঁবুতে। আরো ইচ্ছে করছিল কান পেতে লক্ষ লক্ষ ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে।

দেখা হওয়ার পর মিঃ সেন বললেন—অ্যালেন, তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে। লামডিং—সদিয়ায় রেল লাইন বসানোর কাজ চলছে। পাহাড়ী জমি; কালভার্ট তৈরি, সঠিক বেনডিং, এসব ব্যাপার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন দক্ষ লোকের প্রয়োজন। আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে আমি কাউন্সিলের কাছে তোমার নাম সুপারিশ করেছিলাম এবং সুখবর হচ্ছে এই যে, তা গৃহীত হয়েছে। তোমার এখন কাজ হচ্ছে, পরবর্তী লোককে তোমার কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দেওয়া। তোমার জিনিস-পত্র গোছগাছ করার জন্য তুমি হাতে মাত্র তিন দিন সময় পাচ্ছ।

মিঃ সেনের মুখ স্নেহে উজ্জ্বল। কিন্তু আমি মহা অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম, যে কোম্পানির কাজে আমাকে যেতে হচ্ছিল তারা ছিল স্বরাজ্য পার্টির সমর্থক। তারা চেয়েছিল, কোনো ভারতীয়ই ওই পদের দায়িত্বে থাকুক। শ্বেতকায় হিসেবে আমায় সমর্থন করায় মিঃ সেনকে নাকি কাউন্সিলে জোর লড়াই-এর মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

আমার নতুন পদটা ছিল আমার আগের পদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মাইনেও ছিল অনেক বেশি। ২৫০ টাকার বদলে এখন আমার মাইনে হল ৪০০ টাকা, যা Noel & Noel কোম্পানির একজন প্রতিনিধির মাইনের চেয়েও বেশি। যদিও আমায় কাজ করতে হবে আসামের অস্বাস্থ্যকর অনুন্নত এলাকায় তবু আমার প্রকৃতি-প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো। ভারতে

এসেছিলাম যে-প্রকৃতির টানে তা বোধ হয় পূর্ণ হতে চলেছে, এই ভেবে আমি মিঃ সেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। মিঃ সেন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—অ্যালেন, আমি ও আমার স্ত্রী, আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসি। তোমার কথা নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। তুমি বাংলা জানলে দারুণ ভাল হতো।

সে সময় তাঁর এই অযাচিত স্নেহপ্রীতির বিষয়ে খুব একটা ভেবে দেখিনি। তবে নিজের কাছে একটা প্রশ্ন ছিলই, মিঃ সেন তাঁর অসংখ্য পরিচিত ভারতীয়দের ছেড়ে আমার প্রতি এতটা পক্ষপাতিত্ব কেন করছেন? মনে মনে একটা উত্তরও খাড়া করে নিয়েছিলাম যে, হয়ত আমার গঠনমূলক মেজাজ, কর্মশক্তি, উদ্যম এবং সর্বোপরি একজন বিদেশী হিসাবে ভারতবর্ষের উন্নতিতে আমার শ্রম এবং সময় নিয়োগের ব্যাপারগুলোই ওঁকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

যাইহোক, যথাসময়ে হ্যারল্ড খবরটা পেলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি উপলক্ষে চায়না টাউনে একটা পার্টির দাবি জানালো। স্বাভাবিকভাবেই কিছু অ্যাংলো যুবতীকেও দলে নিতে হলো। দুটো গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হৈচৈ আর হাসি-ঠাট্টা করতে করতে তরুণদের দল সশব্দে নিজেদের অস্তিত্ব খুব বেশি করে জানান দিতে দিতে ক্রমশ পার্ক স্ট্রিট থেকে চৌরঙ্গী রোডে এসে পড়ল। চৌরঙ্গী রোডে এসেই গাড়ি দুটো দৌড়-প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। অবশ্য দোষ আমাদেরই। উভয় গাড়ির যাত্রীরাই নিজেদের ড্রাইভারদের উত্তেজিত করছিল। আমি যে গাড়িতে ছিলাম তার ড্রাইভার আবার ফরাসী ভাষা জানে। যুদ্ধের সময় সে কিছু দিন ফ্রান্সে ছিল। আমার কোলের ওপর বসে ছিল গারতি। গাড়ির উন্মত্ত গতিতে ভয় পেয়ে গারতি আমায় জড়িয়ে ধরে বার বার বলছিল যে পড়ে যাবে, পড়ে যাবো। আমি পড়ে যাবো। তোমার কিছু যায় আসে না আমি পড়ে গেলে?

ধর্মতলার মোড়ে এসে আমাদের গাড়ি থামতে বাধ্য হলো কারণ একটি ট্রাম তখন রাস্তা জুড়ে চলেছে। অপর গাড়িটা ট্রামটার আগেই বেরিয়ে গেছে। আর ঠিক সেই সময়েই অঘটনটি ঘটলো। মিঃ সেনের গাড়ি একেবারে আমাদের পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। নরেন্দ্র সেন, তাঁর স্ত্রী এবং মৈত্রেয়ী সেই গাড়িতে। [illegible] ভয়, লজ্জা আর অস্বস্তিতে আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। [illegible] কোনো রকমে তাঁকে নমস্কার জানালাম। মিঃ সেন প্রত্যুত্তরে একটু

ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে মৃদু হাসলেন। মিসেস সেন যদিও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে তখন আতঙ্ক আর বিস্ময় যথেষ্ট প্রতীয়মান ছিল। একমাত্র মৈত্রেয়ীই মাথায় হাত ঠেকিয়ে আমায় নমস্কার জানালো। মনে হলো ও বেশ উপভোগ করছে ব্যাপারটা, আমার চার পাশের সঙ্গী সাথী আর কোলের ওপর বসা মেয়েটিকে দেখে। ওকে ভারতীয় কায়দায় প্রত্যাভিবাদন জানাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু আমার হাস্যকর অবস্থার কথা বিবেচনা করে বিরত হলাম। যতক্ষণ না আমাদের গাড়ি পুনরায় যাত্রা শুরু করলো, ততক্ষণ যে আমার কি অস্বস্তিতে কাটলো কি বলবো! ঘাড় উঁচু করে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মৈত্রেয়ীর হালকা চা-পাতা-রঙের শাল বাতাসে উড়ছে।

একজন 'কালা আদমী'কে আমি শ্রদ্ধা জানালাম দেখে আমার ওপর অন্যদের টিটকিরির বন্যা বয়ে গেল। একটা দুষ্টুমির খোঁচা মেরে গারতি বললো, কাল থেকে হয়তো দেখবো অ্যালেন ভোর বেলা উঠে গঙ্গা-স্নান করছে। হ্যারল্ড জানতে চাইলো কি করে আমি একটা 'নিগার'-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলছি!

কিন্তু আমাদের ড্রাইভারটা গোড়া থেকে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল! এই ঘটনায় তার প্রচণ্ড আনন্দ হয়েছিল। হোটেলের সামনে যখন তার ভাড়া মেটাচ্ছিলাম, সে ফরাসীতে আমায় বললো, ভীষণ ভালো লাগলো সাহেব। বাঙালী মেয়েটা আপনারই হবে। বহুৎ আচ্ছা।

পরদিন সকালে নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমায় খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কাল সঙ্গে কারা ছিল?

—আমার কয়েকজন বন্ধু স্যার!

—আর সুন্দরী মহিলাটি? তুমি কি ওকে ভালবাসো?

—মিঃ সেন, ওই মেয়েরা ভালবাসার পক্ষে খুব সস্তা। আমার চাকরি হওয়ার উপলক্ষে আমি বন্ধুদের একটা পার্টি দেবো বলেছিলাম। আমরা অনেকজন ছিলাম, তিনটে গাড়ি-ভাড়া করতে অনেক খরচা বেড়ে যেত, তাই দুটো গাড়িতেই আমরা ঠাসাঠাসি করে...। স্যার, কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে...বা...।

কথাবার্তায় আমার অতিরিক্ত সাবধানতা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন—অ্যালেন, তোমার সামনে কিন্তু অন্য রাস্তা খোলা আছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মেসে থাকার ফলে তোমার রুচি এবং কৌলীন্য দুই-ই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই জীবন খুব মর্যাদার নয়। আর একটা কথা, এই ভাবে, এদের সঙ্গে জীবন কাটালে তুমি কিন্তু কোনো দিনই ভারতকে

ভালবাসতে পারবে না।

আমার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন-পদ্ধতি সম্পর্কে মিঃ সেনের আগ্রহ দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। তিনি যে এসব নিয়েও ভাবেন তা আমি কখনও ভাবিনি। এ যাবৎ তিনি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছেন, তা, আমি এখানকার খাদ্যে অভ্যস্ত হতে পারছি কি না, ভালো চাকর পেয়েছি কি না, এখানকার এত গরম বা শব্দে আমার কষ্ট হচ্ছে কি না, অথবা আমি টেনিস কেমন খেলতে পারি, ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

যাইহোক, আবার কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো। এক গাদা কাগজ-পত্রে সই করা বাকী ছিল। যাবার আগে মিঃ সেন আমাকে রোটারী ক্লাবে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি নানা অজুহাতে নিমন্ত্রণ এড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি কোনো কথা শুনলেন না। নির্ধারিত দিনে, ক্লাবের একটা বিশেষ ঘরে আরও কিছু গণ্যমান্য বক্তির উপস্থিতিতে মিঃ সেন আমার পরিচয় দিতে গিয়ে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, তাতে আমার যথেষ্ট আনন্দ আর গর্ব হচ্ছিল।

সেই রাত্রেই আমি শিলং যাত্রা করলাম। স্টেশনে একমাত্র হ্যারল্ডই এসেছিল আমাকে বিদায় জানাতে। সে আমাকে শেষ বারের মত সাপ, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখের হাত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের মতামত পুনরাবৃত্তি করল, 'জল খাবি না, শুধু সোডা দিয়ে ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কি খাবি।' হ্যারল্ড শুভযাত্রা কামনা করলো। আমি কলকাতা ছেড়ে চললাম।

৩.

আজ আমি অনেকক্ষণ ধরে ডায়েরির পাতা ওল্টালাম। আমার আসামে থাকার দিনগুলোয় যা লিখেছিলাম আবার পড়লাম। দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলোকে পরম্পরা অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়ে পরবর্তীকালে আমার পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এটা জরুরী ছিল।

কাজে যোগ দিয়েছিলাম অত্যন্ত উৎসাহ আর কৌতূহলী মন নিয়ে। আমি ছিলাম বাস্তবিকই বোধহয় প্রথম পথপ্রদর্শক। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রেলপথ-নির্মাণের কাজ, আমার মনে হচ্ছিল, ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা বই লেখার চেয়ে অনেক জরুরী আর প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটাও ঠিক, ওই অতি প্রাচীন, প্রায় সভ্যতার প্রথম যুগের অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের আধুনিক যন্ত্রপাতির সংঘাত-মিলনের ঘটনা যে-কোনো ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু হতে পারতো অনায়াসে। আমার কাজের মধ্যে দিয়ে আমি যে ভারতবর্ষকে চিনছিলাম, তার সঙ্গে তখনও অবধি আমার পড়া ভারতবর্ষের ওপর লেখা উপন্যাস বা খবরের কাগজের রিপোর্টের কোনো মিল ছিল না। বিষাক্ত গাছপালা, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, মাথার যন্ত্রণার উদ্রেককারী তাপপ্রবাহ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আমি বাস করতাম যে আদিবাসীদের সঙ্গে, তারা অনায়াসেই নৃতত্ত্ববিদ্‌দের আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু হতে পারতো। ঐ ফার্ন লতাগুল্ম-আচ্ছন্ন জায়গায় যারা থাকতো তারা ছিল একাধারে সরল এবং নিষ্ঠুর। চেষ্টা করতে কসুর করিনি ওদের মধ্যে সভ্যতার প্রাণ সঞ্চার করতে।

ওদের নীতিবোধ, শিল্পবোধ বোঝার চেষ্টা করলাম। সংগ্রহ করতে শুরু করলাম ওদের লোকগাথা, বংশ-পরিচয়ের ইতিহাস। ছবিও তুললাম অসংখ্য। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, যতই আমি ওই প্রায়-অসভ্য মানুষদের ভেতরে প্রবেশ করছিলাম ততই আমার মর্যাদাবোধ, অহঙ্কার প্রখর হচ্ছিল। এতদিন এগুলো কোথায় ছিল? এমনকি আমার মনে এরকম কিছু থাকতে পারে বলেও আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু ওই জঙ্গলে সত্যি সত্যিই আমি ছিলাম সৎ আর আমার রিপু দমন করার ব্যাপারে অনেক বেশি সক্ষম।

কিন্তু বৃষ্টি! রাতের পর রাত অনিদ্রার শিকার হয়ে আমি শুনতাম ছাদের ওপর বৃষ্টির অবিরাম ছন্দ। অবিস্মরণীয় সেই শব্দ। মুষলধারে সেই বৃষ্টি দিনের পর দিন চলতো। ছেদ পড়তো হয়ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। কিন্তু তখনও একটা কুয়াশার মতো পরিবেশে ঝিরঝির করে তার রেশ চলতো। সেই সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণাগুলো ছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা কন্‌কনে, তার মধ্য দিয়ে যখন

আমি হেঁটে যেতাম, অদ্ভুত এক তীব্র বুনো সুবাস মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে দিতো।

বিকেলে হয় আমার বাংলোর বারান্দায় পায়চারি করতাম, নয়তো নিরালা, নির্জন শোবার ঘরে বসে স্যাঁতসেঁতে তামাক পাইপে পুরে ধূমপানের চেষ্টা করতাম।

মাঝে মাঝে এই জীবন অসহ্য মনে হতো। এক তীব্র অস্থিরতা শরীর মন জুড়ে বিদ্রোহ জানাতো। ছট্‌ফট্ করতাম, ঘুঁষি পাকিয়ে বারান্দার থামে আঘাত করতাম। চিৎকার করে উঠতাম; বৃষ্টির মধ্যেই নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়তাম কোনো এক অজানা দেশের সন্ধানে, যেখানে আকাশ অনন্তকাল ধরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করে না, বা ভিজে স্যাঁতসেঁতে উঁচু ঘাসের জঙ্গল নেই। ভীষণ মনে পড়তো তমলুকের কথা। সেই সমতল ভূমি, লবণাক্ত বাতাসের ঝাপটা, মরুভূমির মতো শুষ্ক বাতাস। এখানকার পরিবেশ, জঞ্জাল, পচা গন্ধ আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল।

বাংলোয় আমি ছাড়া আর থাকতো আমার তিনজন চাকর আর বাংলোর মালিক। কদাচিৎ কোনো বিদেশী আসতো; পাটচাষের পর্যবেক্ষক, মহকুমার কোনো ইংরেজ সরকারী কর্মচারী অথবা চীনযাত্রী কোনো চা-ব্যবসায়ী। সে-সময় আমরা এক সঙ্গে বসে হুইস্কি খেতাম। অন্যান্য দিন কাজ থেকে ফিরে এসে স্নানের পর আমি একাই মদ্যপান করতাম। মদ খেতে খেতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছতাম যখন নিজের অস্তিত্বের কোনো অনুভূতি আর আমার থাকতো না। তখন আমার গায়ে আঁচড় কাটলেও আমি কোনো কষ্ট অনুভব করতাম না। শ্বাস-প্রশ্বাসে একটা জ্বালা অনুভব করতাম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে যেত। আমার ইচ্ছাশক্তি লুপ্ত হতো। শূন্যে যে কতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতাম তা কে জানে। সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যেতো। লম্বা চেয়ারে গা এলিয়ে, নাইট-গাউন পরে বসে থাকতাম। নেশার ঘোরে আমার চিবুক এসে ঠেকতো বুকে। এইভাবে একটা সময় আমার মনে হতো, ভিজে স্যাঁতসেঁতে ভাব কেটে গিয়ে আমার শরীরের পরিচিত উত্তাপ ফিরে এসেছে। এক একদিন এর পর লাফিয়ে উঠে পোশাক পরে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়তাম। ধুলোর মতো জলকণা মিশ্রিত বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে বিষণ্ণ চিত্তে আমি স্বপ্ন দেখতাম একটা সুখী, সাধারণ জীবনের। শহর বা শহরের উপকণ্ঠে একটা সাধারণ ছোট বাড়ি, শহরে দিনে অন্তত একবারও যাওয়া যায় এরকম একটা জায়গা হলেই চলবে। বৃষ্টির মধ্যে ভবঘুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে এই সব ভাবতাম আমি। ঘুরে বেড়াতাম যতক্ষণ না অন্য কাজে প্রবৃত্তি আসত,

অথবা ঘুম পেতো।

আসামে থাকাকালীন আমার ঘুম ছিল খুব গভীর। বিশেষ করে সেই তিন সপ্তাহ, যখন আমি সদিয়ার চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলে কাজ করতাম। ওখান থেকে মাঝে মাঝে প্রায় মধ্যরাত্রে মোটরে বাংলোয় ফিরে আসতাম। পাহাড়ী রাস্তার খাদ এড়িয়ে অনেক ঘুর পথে ঘরে ফিরে এসে তখন আর জামা কাপড় ছাড়ার ইচ্ছে থাকতো না। প্রচুর রাম দিয়ে এক কাপ চা আর সঙ্গে কুইনাইন খেয়ে পোশাক পরেই শুয়ে পড়তাম। পরের দিন সকাল নটার মধ্যেই আবার ফিরে যেতে হতো কর্মক্ষেত্রে।

ক্রমশ আমার পোশাক-পরিচ্ছদে অবহেলা এলো। আর প্রয়োজনই বা কি ছিল! কয়েক শো মাইলের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই শ্বেতকায় ছিল। তারা মৌসুমী আবহাওয়ার সময় পাহাড়ে থাকতোই না। আর ছিল কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার। এদের বাড়িতে আমি কয়েকবার থেকেছি, যখন আমার মানসিক অবসাদ আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ওই সব পরিবারে ইংরাজীতে কথাবার্তা আমাকে যেন কিছুটা স্বস্তির পরিবেশে ফিরিয়ে আনতো। সকলে মিলে সন্ধ্যা থেকেই আমরা মদ খেতে শুরু করতাম।

রবিবার আমার চাকরেরা শিলং চলে যেত সারা সপ্তাহের রসদ আনতে। সেদিন আমি দুপুর অবধি ঘুমোতাম। জেগে উঠে দেখতাম মাথা ভারী হয়ে আছে আর মুখ ফুলে কিম্ভূত-দর্শন হয়েছে। বিছানাতে শুয়ে শুয়েই ডায়েরি লিখতাম। খুঁটি-নাটি অনেক কিছু টুকে রাখতাম পরবর্তীকালে আসামে শ্বেতকায়দের জীবনযাত্রা নিয়ে যদি কখনও একটা বই লিখি এই ভেবে। এর জন্য আমার নিজেকে বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হতো। আমার কর্মচাঞ্চল্যহীন স্নায়বিক অবসাদের দিনগুলো, আবার পাশাপাশি রেললাইন-পাতার প্রথম পথপ্রদর্শক রূপে আমার ভূমিকা, যেখানে আমার মন গর্ব আর শক্তিতে ভরপুর, এসবই তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতাম।

সারা জুলাই মাসে আমি একবার মাত্র শিলং গিয়েছিলাম। অনেক অনেক দিন বাদে সূর্যের কিরণ গায়ে মাখলাম। সিনেমা দেখলাম আর আমার গ্রামোফোনটা সারিয়ে নিলাম। কয়েকটা ডিটেকটিভ উপন্যাস কিনলাম। আসামে যাওয়ার পর থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু পড়ার মত মানসিক অবস্থাও আমার ছিল না।

আমি জানতে পেরেছিলাম হেড অফিসে আমার কাজের খুব প্রশংসা হচ্ছে। সেটা জেনেছিলাম আমি সরাসরি নরেন্দ্র সেনের কাছ থেকেই,

আমাদের শিলং-এর প্রতিনিধি মারফৎ নয়। এই প্রতিনিধি লোকটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারতাম না। প্রচণ্ড অহঙ্কারী এই আইরিশ লোকটার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাকে একবার শিলং-এ যেতে হয়েছিল। শুধু তার দেখা পাবার জন্য আমাকে সে অকারণে অপেক্ষা করিয়ে রেখে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। অথচ সে সময় তার এতটুকুও ব্যস্ততা ছিল না।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মিঃ সেনের একটা করে ইংরাজীতে টাইপ করা কয়েক লাইনের চিঠি আসতো। কাজ স্বাভাবিক গতিতেই এগোচ্ছিল। সদিয়ার কাছে কঠিন গিরিপথগুলোর সংস্কারে কাজ আর পুরো রাস্তাটা পরিদর্শনের কাজ শেষ করে যদি রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলতে পারি, তাহলে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় যেতে পারবো, এরকম একটা সম্ভাবনাও দেখা দিলো। কিন্তু প্রচণ্ড অবসাদের সময় যে ভয়টা আমার কেবলই হতো, ঠিক তাই হলো। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার স্নায়ুর ওপর অত্যন্ত চাপ থাকার ফলে প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আরও জটিল আকার ধারণ করলো।

একদিন বিকেলের আগেই বাংলোয় ফিরে এলাম। শরীর ভাল লাগছিল না। ঘরে এসে চা খেতে গিয়ে মনে হলো কোনো স্বাদ পাচ্ছি না। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। হ্যারল্ডের পরামর্শ মনে পড়লো। তিন গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আমি শুতে গেলাম। পরদিন আর ওঠার ক্ষমতা রইল না। ভুল বকতে শুরু করলাম। ফ্রাঙ্ক নামে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডাক্তার এলেন আমায় দেখতে। সব দেখেশুনে তিনি আমাকে সেদিনই সদিয়া পাঠিয়ে দিলেন। তখন পড়ন্ত বিকেল, কিন্তু সূর্য বিস্ময়করভাবে উজ্জ্বল ছিল। ফুল, পাখি, প্রকৃতি দেখতে দেখতে আমি চললাম সদিয়ার পথে। স্টেশনে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখে বিস্মিত হলাম। গত চারমাসে আমি কোনো বিদেশী মহিলা দেখিনি।

তারপর কি হয়েছিল আমার স্পষ্ট কিছু মনে নেই। শুধু বুঝতে পারছিলাম আমায় শিলং-এ আনা হয়েছে এবং আমাকে ইউরোপীয়ানদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। আমার জায়গায় কেউ লোক আসার আগেই নরেন্দ্র সেন আমায় দেখতে এলেন। এর পাঁচ দিন পর ট্রেনের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে রইলো দুজন নার্স এবং হ্যারল্ড। কলকাতায় পৌঁছে আমাকে সোজা তোলা হলো ট্রপিকাল হাসপাতালে।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম আমার

ঘরের দেওয়ালগুলো সাদা রঙের। ঘরে ক্যারামেল এবং অ্যামোনিয়কের গন্ধ। জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে এক ভদ্রমহিলা কিছু একটা পড়ছেন। মাথার ওপর চলমান পাখার একটানা শোঁ-শোঁ শব্দ। মনে হচ্ছিল আমার আধো ঘুম-জাগরণের মধ্যে কেউ যেন জোসেফ কন্‌রাডের বই 'লর্ড জিম'-সম্পর্কে কিছু বলছিল। বিছানায় সোজা হয়ে বসে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল যে উপন্যাসটা নেহাৎই মাঝারি ধরনের। এর চেয়ে অনেক ভালো উপন্যাস কন্‌রাডের যৌবনে লেখা 'আলমেয়ারস্ ফলি'।

আমি ভদ্রমহিলার উদ্দেশে বললাম,—'আল্‌মেয়ারাস্ ফলি' না পড়লে কন্‌য়াডের প্রতিভা সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

ভদ্রমহিলা আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—যাক্, ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি তাহলে কালা হয়ে যান নি।

তারপর প্রশ্ন করলেন—আপনার কিছু লাগবে?

আমার ঠাণ্ডা, রুগ্‌ণ খোঁচা-খোঁচা গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, আমি দাড়ি কামাতে চাই।

আরো বললাম, এই রকম অভদ্র চেহারায় আপনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি।

ভদ্রমহিলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর বললেন—যাক, আপনার জ্ঞান ফিরে এসেছে তাহলে। আমরা তো বলতে গেলে ক্রমশ হতাশই হয়ে পড়ছিলাম। এখন মিঃ হ্যারল্ড কার-কে টেলিফোন করতে হবে। উনি রোজ আপনার খবর নিতে আসেন।

হ্যারল্ডের যে আমার প্রতি এতখানি টান, সেটা জানতে পেরে আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল। এই অপরিচিত, বান্ধবহীন অবস্থায় নিজেকে ভীষণ একা আর অসহায় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কত দূরে আমার দেশ প্রায় পাঁচ সপ্তাহের পথ, আর আমি এখানে একা মৃত্যুপথযাত্রী।

ভদ্রমহিলা স্নিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন—কি হলো আপনার?

বললাম—কিছু না। আপনি যদি একটু আমার দাড়িটা কামাবার ব্যবস্থা করে দেন.....

আমার চোখের জল বাঁধ মানছিল না। মৃদু স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম—আপনার কি মনে হয় আমি ভালো হয়ে উঠবো? আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারবো? আবার দেখতে পাবো নিউইয়র্ক, প্যারিস?

তাঁর উত্তরটা আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু সেই দিনটা আমার স্মৃতিতে

অম্লান হয়ে আছে। এর পরই আমায় দেখতে এলেন কয়েকজন ইওরোপীয়ান ডাক্তার। তাঁরা চলে যাবার কয়েক মিনিট পরেই হ্যারল্ড এসে আমার করমর্দন করলো। তারপর অনর্গল বকে যেতে লাগলো, কলকাতার নানারকম খবরাখবর দিয়ে ঃ গারতির এখন প্রেমের খেলা চলছে মিড্‌ল ব্যাঙ্কের এক ম্যানেজারের সঙ্গে। গারতি এখন সিনেমা যায় সাড়ে তিন টাকার টিকিটে। বিয়ের পর নরিনকে দেখতে কুৎসিত হয়ে গেছে। আমার শোবার ঘরে এখন একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার বাস করছে। আর, হ্যারল্ড নিজে কিন্তু যুবকই আছে। এখনো বিকেলের দিকে স্কুলের মেয়েদের ধরে নিজের ঘরে নিয়ে আসে, আর আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর সামনেই নোংরামি করে। স্ত্রীর চিৎকার চেঁচামেচি সে কানেই তোলে না... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা যখন এই ধরনের বাজে কথাবার্তায় মগ্ন ছিলাম তখন মিঃ সেন ঘরে ঢুকলেন। তিনি পরম আন্তরিকতায় আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন এবং আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি ওঁকে হ্যারল্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। হ্যারল্ড যে ভাষায় মিঃ সেনকে সম্ভাষণ করলো, তা খুব ভদ্র ও মার্জিত ছিল না। বুঝতে পারছিলাম মিঃ সেন হ্যারল্ডের উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করছিলেন। মিঃ সেন বললেন,—অ্যালেন, তুমি অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছো। চিন্তা করো না, ভালো হয়ে যাবে। অন্যান্য সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

পরের দিন অফিস ছুটির পর তিনি আবার আসবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিঃ সেন বিদায় নিলেন।

মিঃ সেন বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারল্ড আমাকে বললো,—এই জাতীয় লোক সম্পর্কে খুব সাবধান থাকবি, অ্যালেন। উনি তোর ওপর এতো সহানুভূতি দেখাতে শুরু করলেন কেন? তোর সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না কি?

লজ্জায় লাল হয়ে কপট রাগ দেখিয়ে আমি বললাম—উল্টো-পাল্টা অলৌকিক কথা বলিস না তো!

অনেক দিন পর, মৈত্রেয়ীর মুখটা আবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কিন্তু এ এক অন্য মৈত্রেয়ী। মিসেস সেনের মুখের সঙ্গে যেন এ মুখের সাদৃশ্য অনেক বেশি। পানের রসে লাল টুকটুকে ঠোঁট, ঘাড়ের ওপর ঝুলে চুলের খোঁপা, মুখে মৃদু হাসিতে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ নিয়ে আরও সজীব। বেশ কিছুক্ষণ ওর রূপের ধ্যান করলাম আমি। মৈত্রেয়ীকে অনেক দিন না দেখতে

পাওয়ার বেদনা, শীঘ্রই আবার তাকে দেখতে পাওয়ার আশা ও আনন্দ, আবার কথা বলার সময় যে অস্বস্তি হবে, এসবের মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমার মন ছুঁয়ে গেল। এই সময়ে হ্যারল্ডের উপস্থিতি আমার শুধু বিরক্তিকর নয়, অসহ্য মনে হচ্ছিল। জানিনা কী করে সেই আশ্চর্য অনুভূতির ব্যাখ্যা করবো। মৈত্রেয়ীর প্রতি আমার কোনো বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব বা ভালবাসা, কিছুই ছিল না। আমি তাকে দেখেছিলাম খুবই সাধারণ একজন অহঙ্কারী বাঙালী মেয়ে হিসেবেই। সে ছিল এমন অদ্ভুত প্রকৃতির এক নারী যে একাধারে শ্বেতকায়দের ঘৃণা করতো আবার তাদের প্রতি আকৃষ্টও হতো।

হ্যারল্ড আমাকে যা বলে গিয়েছিল, সে সব শুনে আমার আনন্দ হবার মতো কিছু ছিল না। সে চলে যাক এটাই আমি চাইছিলাম। এক দিনে পর পর অনেক কিছুই ঘটে গেল। অনেক কিছুই জানলাম আর অনুভব করলাম। একটু-সুস্থ-হওয়া আমার শরীর এবং মনে মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব সেই মুহূর্তে আমায় যেন কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলছিল। বুঝতে পারছিলাম তার বাস্তব শারীরিক উপস্থিতি নতুন কোনো সমস্যার সৃষ্টি করলেও করতে পারে।

ভারতবর্ষে আসার পর আমি কখনো অসুস্থ হইনি, আর এত দীর্ঘকালীন অসুস্থতার স্মৃতিও আমার নেই। ইচ্ছে করতো বিছানা থেকে নেমে, জামাকাপড় পরে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। শহরের আলো আমার স্মৃতি আর বেদনা নতুন করে জাগিয়ে তুলছিল। ইচ্ছে করতো চায়না টাউনে গিয়ে 'চাউ' খাই, 'চাও'-এর পেঁয়াজ, নুডল্‌স্, ডিমের কুসুম, বাগদা চিংড়ির গন্ধ ও স্বাদ—সব যেন আমি অনুভব করতে পারছিলাম। ইচ্ছে করছিল ফেরার পথে 'ফিরপো'-এ নেমে জাজ্ শুনতে শুনতে একটা ককটেল্ খাই। হাসপাতালের বিস্বাদ খাবার আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। ধূমপান করাও নিষেধ ছিল।

পরদিন আমাকে দেখতে এলো আমার দুই বান্ধবী, গারতি আর ক্লারা। ওরা আমার জন্য প্রচুর চকোলেট, সিগারেট আর ফল নিয়ে এসেছিল। আমি কেবল ওদের বলছিলাম এখান থেকে পালাতে চাই, স্বাধীনতা চাই। এমন সময় হ্যারল্ড এসে পড়লো। সে আমার যেদিন ছুটি হবে সেরাত্রে পার্টি দেবার পরিকল্পনা শুরু করে দিলো। শুধু পার্টিই হবে না, সঙ্গে থাকবে লেকভ্রমণ। অনুষ্ঠানে যাতে কোনো খুঁত না থাকে তার জন্য গারতি তখনই কাগজ পেনসিল জোগাড় করে নিমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরি করতে লেগে গেল। তালিকা থেকে দুই সিম্পসন্ বাদ যাবে এটাও ওরা ঠিক করে ফেলল। কারণ নরিনের বাগ্‌দান

অনুষ্ঠানের সময় গারতি দেখতে পেয়ে গিয়েছিল যে ইশাক ঘরের কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে 'র' হুইস্কি খায় আর জেরাল্ড সিগারেট চুরি করে—ক্যাথারিনকে অবশ্য নিমন্ত্রণ করতেই হবে, কারণ সে নাকি আমার অসুখের কথা শুনে দারুণ দুঃখ প্রকাশ করেছে আর মাঝে মাঝে আমার খবর নিয়েছে। হুবার ভাইরা আর সুন্দরী আইভির ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এরকমই ঠিক করা হলো। বাদ বাকী নিমন্ত্রিতদের ব্যাপারে সবাই একমত হলো।

গারতিই বেশি কথা বলছিল এবং আমার হয়েই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। তার কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার মন এখানে ছিল না। গারতির মুখ থেকে আমার দৃষ্টি সরে গিয়ে প্রায়ই শূন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় নার্স এসে খবর দিলো মিঃ সেন আসছেন। আমি পড়লাম মহা ঝঞ্ঝাটে। যখন কোনো সম্মানীয় ভারতীয়কে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক-যুবতীদের সামনে আমায় দেখা করতে হতো, তখন একটা অস্বস্তি আমি অনুভব করতামই। গারতি আর ক্লারা কৌতূহলী চোখ নিয়ে দরজার দিকে তাকালো। প্রথমে ঘরে প্রবেশ করলেন নরেন্দ্র সেন মুখে স্মিত হাসি নিয়ে। তার পরেই এলো মৈত্রেয়ী। লঘু এবং ক্ষিপ্র ছিল তার পদক্ষেপ। আমার মনে হলো, আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। মনে পড়লো যে আজ আমি দাড়ি কামাইনি, যে নাইট গাউনটা পরে আছি তা আমার নয় এবং ওটা আমাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। নিজেকে হাস্যকর একটা জীব বলে মনে হচ্ছিল। মিঃ সেনের সঙ্গে করমর্দন করলাম একটু কষ্টের ভান করে, যাতে নিজের অপ্রতিভভাবটা একটু ঢাকতে পারি। তারপর আমি মৈত্রেয়ীকে নমস্কার জানাবার জন্য কপালে হাত ঠেকালাম। এই কপট গাম্ভীর্য আনতে গিয়ে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কী ভালো লেগেছিল যখন মৈত্রেয়ীকে আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবার পর সে অত্যন্ত স্বাভাবিক সপ্রতিভতার সঙ্গে তাদের করমর্দন করলো, আর জিজ্ঞাসা করলো, "How do you do?" মিঃ সেন হাসতে হাসতে বললেন, আমার মেয়ে দুটো পাশ্চাত্য রীতিতে ভব্যতা প্রকাশ করার ধারাটা ভালই রপ্ত করেছে।

তিনি সর্বক্ষণ গারতিকে লক্ষ্য করছিলেন এবং বিশেষ করে খেয়াল করছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম মতামতের সময় গারতির প্রতিক্রিয়া।

আমি যেন এক আগ্নেয়গিরির ওপরে বসেছিলাম। একদিকে আমার দুই বন্ধু আর হ্যারল্ড নিজেদের মধ্যে বকবক করে চলেছিল, আর অন্য দিকে

ঘরে উপস্থিত মিঃ সেন তাঁর মেয়েকে বাংলায় কিছু বলছিলেন। মৈত্রেয়ী আগ্রহভরে চারদিকে দেখছিল, কিন্তু তার দৃষ্টিতে ছিল তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ! যতবারই মৈত্রেয়ী কোনো আলোচনায় যোগ দিচ্ছিল, ততবারই তার ঠোঁটে ছিল একটা মৃদু হাসি যাতে ব্যঙ্গ আর সূক্ষ্ম পরিহাস মিশে ছিল। আমি মৈত্রেয়ীর মতো কোনো সরল মেয়ের মুখে এ জিনিস আশা করিনি। আমার অপরিচ্ছন্ন চেহারার জন্য নিজের ওপর আমার রাগ হচ্ছিল। একসঙ্গে গারতি, ক্লারা, হ্যারল্ড আর মিঃ সেনদের উপস্থিতি আমার কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মনেমনে ভাবছিলাম মৈত্রেয়ীর মধ্যে মুগ্ধ হবার মতো কিছুই নেই। ওকে ভালবাসতে পারা তো দূরে থাক, বড়জোর মাঝে মাঝে হয়তো দু-একবার দেখা করার ইচ্ছা জাগতে পারে। কিন্তু তবু তার সম্বন্ধে আমার একধরনের ঔৎসুক্য আমি অনুভব করছিলাম।

মৈত্রেয়ী বললো—মঁসিয়ে অ্যালেন, আমাদের বাড়ি কবে যাচ্ছেন?

মৈত্রেয়ীর কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত সুর ছিল যার ফলে আমার তিন বন্ধুই একসঙ্গে ঘুরে ওর দিকে তাকালো।

আমি বললাম,—যেদিনই ভাল হবো সেই দিনই যাবো।

কথা বলতে আমি ইতস্তত করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কী বলে ওকে সম্বোধন করবো। 'মিস্' শব্দটা ঠিক মানায় না, আবার ওকে 'দেবী' বলে সম্বোধন করতেও আমার সাহস হচ্ছিল না। আমার এই হতবুদ্ধিভাব লজ্জায় আমাকে লাল করে তুলেছিল, তাই ক্ষমা চাইতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

বললাম—কিছু মনে করবেন না। ঘরটা গুছোনো নেই, দাড়ি কামাতে পারিনি আজকে, সারাদিন খুব ক্লান্ত লাগছে।

আমি তীব্র ক্লান্তির ভাণ করতে থাকলাম, আর মনে মনে কামনা করতে লাগলাম, সবাই যেন চলে যায়। কারণ একসঙ্গে সকলের এই উপস্থিতিতে আমার দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

নরেন্দ্র সেন বললেন—অ্যালেন, তুমি কি জানো যে আমরা ঠিক করেছি এর পর থেকে তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে! এটা আমার স্ত্রীর প্রস্তাব আর আমরা সবাই এটাতে একমত হয়েছি। তুমি এখানকার রান্না করা খাবারে অভ্যস্ত নও এবং এর পর যদি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ো তখন তার ফল মারাত্মক হতে পারে। এছাড়া আর একটা দিকও আছে, আমাদের ওখানে থাকলে তোমার টাকা-পয়সার খরচও কম হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সেই

জমানো টাকা নিয়ে তুমি বছরে একবার হলেও দেশে যেতে পারবে, নিজের লোকজন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। আর আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো যে তোমার উপস্থিতি আমরা.....

নরেন্দ্র সেন তাঁর বাক্য সম্পূর্ণ করলেন না, শুধু মৃদু হাসিতে তা শেষ করলেন। মৈত্রেয়ী সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে আমায় কিছু বললো না, শুধু আমার উত্তরের অপেক্ষায় রইল। তাঁরা চলে যাবার পরই কেন ডায়েরিতে লিখে রাখিনি ঠিক সেই মুহূর্তে মানসিক অবস্থা কী রকম ছিল, সেই কথা ভেবে আজ আমার বড় অনুশোচনা হয়। একথা বলছি এই কারণে নয় যে ঘটনাগুলো বহু পুরোনো। আসলে পরবর্তীকালে যে মারাত্মক ভাবাবেগ এবং বিদ্রোহী মনোভাব আমার মধ্যে এসেছিল তা আমাকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন করে দিয়েছিল এবং ফলত আমার সেই সময়কার অনুভূতিগুলোও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও আজও স্পষ্ট মনে পড়ে আমার চিন্তা তখন দ্বিধা-বিভক্ত।

একদিকে একটা এমন জীবনযাপনের হাতছানি যা আগে কখনো কোনো শ্বেতাঙ্গের কপালে জোটেনি এবং যে জীবন লুসিয়্যাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু; একদিকে মৈত্রেয়ীর প্রতি আমার আকর্ষণ, যার প্রতিক্রিয়াকে পরবর্তীকালে মৈত্রেয়ীর তরফ থেকে এক রহস্যময় ঐতিহাসিক খামখেয়ালিপনা বলেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অন্য দিকে আমার স্বাধীনতাপ্রিয় মনের বিদ্রোহ। মনে হচ্ছিল ওখানে থাকলে আমার সমস্ত স্বাধীনতা খর্ব হবে, আমার ঊর্ধ্বতনের প্রচ্ছন্ন অদৃশ্য শাসনে আমার যৌবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ, এমন কি মদ্যপানও বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। আর সিনেমা দেখার ব্যাপারেও বোধ হয় তা সপ্তাহে একটাতে নেমে আসবে। এই দুটো বোধই আমাকে এত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দেবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু উত্তর তো একটা সময় দিতে হবেই, তাই আমি বলে ফেললাম—মিঃ সেন, আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমার ভয় হচ্ছে আমি না আপনাকে অসুবিধায় ফেলি।

বলতে গিয়ে কথাগুলো আমার মুখে একটু জড়িয়ে যাচ্ছিল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ঐ দুটি মেয়ে—গারতি আর মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে। বুঝতে পারছিলাম যে তারা দুজনে আমাকে নরেন্দ্র সেনের খাঁচায় পোরা বন্ধুর প্রস্তাবটায় বেশ মজা পাচ্ছিলেন। মিঃ সেন আর মৈত্রেয়ী আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্যরা ছিল জানালার কাছে। নরেন্দ্র সেন

হেসে বললেন—বোকার মতো কথা বলো না। আমার বাড়ির এক তলায় লাইব্রেরির পাশেই কয়েকটা ঘর খালি পড়ে রয়েছে। অসুবিধে আবার কি হবে! তাছাড়া তুমি থাকলে, আমার পরিবারের মধ্যে কিছুটা ইওরোপীয়ান সভ্যতাও তো ঢুকবে।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম শেষ কথাগুলো কি মিঃ সেন ঠাট্টা করে বললেন? কিন্তু গারতি আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দিল। আগেই আমরা বন্ধুরা নিজেরা কথা বলে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে মিঃ সেন বা তার সুন্দরী মেয়েরা যদি এই ধরনের কোনো বিপদে ফেলেন, তখন গারতি আমায় জিজ্ঞাসা করবে, 'অ্যালেন, তোমার প্রেমিকার খবর কি?' নরিন ইসাবেল বা লিলিয়ান যারই নাম প্রথমে মাথায় আসবে তারই নাম জিজ্ঞাসা করলেই হবে। মিঃ সেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গারতির সঙ্গে আমার চুক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু গারতির মনে পড়লো এবং ঠিক সময়েই সে সেই প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

মিঃ সেন প্রশ্নটা শুনেই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। মৈত্রেয়ী প্রশ্নকর্ত্রীকে দেখার জন্য মাথা ঘোরালো। উত্তরের অপেক্ষা না করে গারতি বলেই চললো—যাও যাও, অত সাধু সাজার কি আছে? বাড়ি ছাড়ার আগে তোমাকে ওর মতামত নিতে হবে তো? কি মিঃ সেন, ঠিক বলিনি?

মিঃ সেন গম্ভীর মুখে বললেন—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

মৈত্রেয়ী দারুণ অবাক হয়ে গারতিকে দেখছিল। তারপর সে সোজা তার বাবার চোখে চোখ রাখলো। ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য মিঃ সেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—অ্যালেন, তোমার পড়ার জন্য বই এনেছি। আমার মেয়ে পছন্দ করেছে Out of the East। বইটা ওর খুব ইচ্ছে ছিল তোমাকে পড়ে শোনাবে। কিন্তু আজ তো অনেক দেরি হয়ে গেল.....।

মৈত্রেয়ী বললো—বাবা, আমি তো ভালো ইংরাজী পড়তে পারি না।

এদিকে গারতি তার প্রথম প্রচেষ্টা বিফলে গেছে দেখে বলে উঠলো—কিন্তু অ্যালেন তোমার প্রেমিকার ব্যাপারে কিছু বললে না তো?

তাকে থামাবার জন্য আমি চিৎকার করে বললাম,—আমার কোনো প্রেমিকা নেই।

শুনে গারতি নীচু গলায় মিঃ সেনের কানে কানে বলে চললো—ও মিথ্যে কথা বলছে। আসলে ও একটা পাক্কা লম্পট।

সে একটা চমকপ্রদ দৃশ্যের সৃষ্টি হলো বটে। হতভম্ব, লজ্জিত মিঃ সেন

মৈত্রেয়ীর দিকে তাকালেন। হ্যারল্ডদের হাব-ভাব দেখে মনে হল তারা ভাবছে তারা জিতে গেছে। জানালার পাশ থেকে সে তাই আমায় বিজয়-সংকেত করছিল। ঐ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। আর আমি তখন মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম, একটা অলৌকিক কিছু ঘটুক যাতে সব কিছু মিটমাট হয়ে যায়। নিজেকে আড়াল করার জন্য যন্ত্রণার ভান করে দু'হাত দিয়ে কপাল ঘষতে থাকলাম। মিঃ সেন বললেন—আমরা চলি। অ্যালেন, তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিৎ।

মিঃ সেন আমার করমর্দন করলেন। আমিও চললাম, বলে হ্যারল্ড মিঃ সেন ও তাঁর কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিলো কোনো সৌজন্য প্রকাশ না করেই।

হ্যারল্ড এবং মিঃ সেনেরা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই গারতি আর ক্লারা হাসিতে ফেটে পড়লো। গারতি বললো—অ্যালেন, দেখলে কেমন হারিয়ে দিলাম!

ক্লারা মন্তব্য করলো—ও কিন্তু দেখতে খারাপ নয়। শুধু নিগারদের মতো, এই যা। ও মাথার চুলে ওগুলো কি পরেছে অ্যালেন?

পুনরায় আমার পুরনো মানসিকতা চাড়া দিয়ে উঠল। বিশ্বাস না থাকলেও মন্তব্যগুলো আনন্দ সহকারেই শুনতে লাগলাম। এমন কি মিঃ সেনদের বিরুদ্ধে মন্তব্যে আমিও যোগ দিলাম। গারতি পুরনো কথায় ফিরে গেল। বললো—নাও, তালিকাটা শেষ বারের মতো দেখে নেওয়া যাক। আমার মনে হয় হুবার ভাইদেরও নিমন্ত্রণ করলে ভালো হয়। বড় ভাই ডেভিডের গাড়িটা তাহলে পাওয়া যেতে পারে। আর অ্যালেন, আমার উপস্থিত বুদ্ধির একটু প্রশংসা করো—কিরকম বাঁচিয়ে দিলাম তোমাকে, বলো?

৪.

তখন রোজ সকালে আমার ঘুম ভাঙতো এক-একটা নতুন অনুভূতি নিয়ে। শোবার খাটটা ছিল দরজারপাশে। শুয়ে শুয়েই দেখতাম আমার অনুজ্জ্বল ঘরটাকে। এক দিকে উঁচুতে গ্রীল দেওয়া একটা জানালা। সবুজ রঙের দেওয়াল। পড়ার টেবিলের পাশে দুটো টুল আর বিরাট একটা আরাম কেদারা। বই-এর তাকে ডান দিকের দেওয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ছবি। প্রত্যেক দিনই ঘুমের আমেজ কাটাতে আমার বেশ কয়েক মিনিট লেগে যেতো। খোলা জানালা দিয়ে দালানের দিক থেকে যে সমস্ত আওয়াজ আসতো সেগুলোর উৎস, আর আমি কোথায় আছি—এইটে বুঝতে বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় কেটে যেতো। খাটের ওপর বসে থাকতো রক্তে ফোলা তুলতুলে কয়েকটা মশা। সেগুলোকে সরিয়ে খিল দেওয়া দরজা খুলে বেরিয়ে মুখ ধুতে যেতাম উঠোনের মাঝখানে একটা টিনের চাল দেওয়া ঘরে। সেই ঘরের মধ্যে ছিল একটা সিমেন্টের চৌবাচ্চা, যার মধ্যে বিকেলে বাড়ির চাকরেরা ডজন ডজন বালতি ভরে জল ঢেলে রাখতো। ঘটিতে জল ভরে আমি গায়ে ঢেলে স্নান করতাম। তখন ছিল শীতকাল, বাইরে উঠোনটা ছিল টালি-পাতা আর ভীষণ ঠাণ্ডা। শীতে আমার পা থেকে মাথা অবধি কাঁপতো। বাড়ির অন্য লোকেরা স্নানের সময় এক বালতি করে গরম জল সঙ্গে আনতো। তারা যখন শুনতো যে আমি ওই ঠাণ্ডা জলেই রোজ স্নান সারি, তখন তারা এত অবাক হতো যে তা বলার নয়। কয়েক দিন ধরে সারা বাড়িতে আমার স্নান নিয়েই আলোচনা চলতো। মনে মনে আশা ছিল মৈত্রেয়ী নিশ্চয়ই এক দিন আমার টাণ্ডা জলে স্নান করার তারিফ করবে। রোজ সকালে তাকে আমি দেখতাম একটা অত্যন্ত সাধারণ শাড়ি পরে খালি পায়ে এদিক ওদিক করছে। একদিন সে আমায় বললো, আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই দারুণ ঠাণ্ডা! সেই জন্যই আপনারা এত ফর্সা।

এই 'ফর্সা' শব্দটা সে উচ্চারণ করেছিল চা-এর টেবিলের ওপর রাখা আমার নগ্ন বাহুর দিকে তাকিয়ে। তার মনে ছিল যেন খানিকটা ঈর্ষার ভাব। তার-এই ঈর্ষা আমাকে অবাক করেছিল। তাদের বাড়িতে আসার পর বলতে গেলে তার সঙ্গে সেই আমার প্রথম বাক্যালাপ। কিন্তু আমাদের সেই আলাপন বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, কারণ মিঃ সেন এসে আমার সঙ্গে তখন কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

অন্য লোকের অসাক্ষাতে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমই

হতো। তাকে দেখতে পেতাম যখন সে বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করতো। কখনো কখনো শুনতে পেতাম তার গান। জানতাম দিনের বেশির ভাগ সময়টা সে কাটায় হয় শোবার ঘরে, আর নয়তো লম্বা বারান্দার এক কোণে। ক্রমশ আমার কৌতূহল বাড়ছিল এই মেয়ের ওপর যে একই সময় এতো কাছের, এবং এতো দূরের।

মনে হতো, সবসময় সে যেন আমাকে চোখে-চোখে রাখছে সন্দহক্রমে নয়, পাছে আমার কোনো অসুবিধা হয় এই ভেবে। একা একা থাকার ফলে কি না জানি না, এ বাড়ির অনেক কিছুই আমার কাছে অদ্ভুত আর দুর্বোধ্য ঠেকতো, আর সম্ভবত বুঝতে না পারার জন্যই হাস্যকর মনে হতো। প্রায়ই খালি-গায়ে একটি চাকর আমার কাছ আসতো। সে সঙ্গে করে নিয়ে আসতো ফল, দুধ, নারকেলের শাঁস আর ঘরে তৈরি মিষ্টি। লক্ষ্য করতাম দরজার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে সে তীব্র কৌতূহল নিয়ে আমার ব্যবহারের জিনিসপত্রগুলো দেখতো আর অনর্গল আমায় প্রশ্ন করে চলতো, আমার বিছানাটা পছন্দসই কি না, মশারি ঠিক মতো লাগানো হয় কি না, আমার ক্ষীর খেতে ভালো লাগে কি না, আমার কতজন ভাই-বোন আছে, ইত্যাদি। এর সঙ্গেই আমি কয়েকটা কথা হিন্দীতে চালাতে পারতাম আর আমি জানতাম আমার প্রতিটি উত্তর দো-তলায় মিসেস সেন এবং অন্যান্য মহিলারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মৈত্রেয়ীকে আমার একটু বেশি মাত্রায় অহঙ্কারী মনে হতো তখন। খাবার টেবিলে খাওয়ার সময়ও তার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি লেগে থাকতো। টেবিল থেকে সবসময়ই সে সবার আগে উঠে পড়তো আর পাশের ঘরে ঢুকে যেতো পান খেতে। সেখান থেকে তার বাংলা ভাষায় বলা কথাগুলো ভেসে আসতো। আর ভেসে আসতো তার উচ্চকিত ঝর্ণার মতো খিলখিল হাসির শব্দ। অন্য লোকের উপস্থিতিতে কখনই সে আমার সঙ্গে কথা বলতো না, আর আমরা যখন দুজনে আলাদা থাকতাম তখন যে তাকে কিছু বলবো, এ সাহস আমি পেতাম না। চুপ করে থাকতাম। ইওরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই অকারণ নীরবতা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমার তখন মনে হতো, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই নিশ্চয় ভদ্রতা আর সদাচারের লক্ষণ। তাই এটা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে নীরবেই নিজের ঘরে ফিরে যাওয়া আমার কাছে শ্রেয় বলে মনে হতো।

কখনো কখনো অবশ্য পাইপ খেতে খেতে তার কথা আমি চিন্তা করতাম।

ভাবতে চেষ্টা করতাম আমার সম্পর্কে মৈত্রেয়ীর কি রকম ধারণা, কী ও ভাবে আমার সম্পর্কে! ওর মুখের ভাব দেখে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এক একদিন ওকে দেখে অসাধারণ সুন্দরী মনে হতো। এত সুন্দরী যে দেখে দেখে আশ আর মিটতো না। ভাবতাম, ওকি নির্বোধ না প্রকৃতই সরল স্বভাবের? নাকি আদিম যুগের ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে আমি যে রকম ভাবতাম, সেই তাদের মতো? কতগুলো বাজে ভাবনা মাথায় ঘুর-ঘুর করছে ভেবে পাইপের ছাই ঝাড়ার মতো সেগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতাম, তারপরে আবার আমার বই-এর পাতায় ডুবে যাবার চেষ্টা করতাম।

মিঃ সেনের লাইব্রেরিটি ছিল একতলার দুটো ঘর জুড়ে। তাই নিত্য নতুন পড়ার বই-এর অভাব আমার ছিল না।

একদিন ভবানীপুরে আসার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, বারান্দার নিচে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো আমি হাত কপালে তুলে , আমার টুপি খুলে, তাকে নমস্কার জানালাম। ওকে কোনোভাবে অসম্মান করে না ফেলি, এই ভয়েই আমি অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে কাজটা করে ফেলেছিলাম। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো, কে আপনাকে আমাদের নমস্কার করবার নিয়ম শিখিয়েছে?

সেদিন তার মুখে ছিল এক আশ্চর্য বন্ধুত্বপূর্ণ মৃদু হাসি।

আমি উত্তর দিলাম, আপনিই।

মোটর গাড়িতে আমাদের সেই মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা আমার মনে পড়লো। সে সময়ে তার মুখে যে অস্বস্তি বা অস্থিরতা দেখেছিলাম, হঠাৎ যেন তা মৈত্রেয়ীর মুখে ফুটে উঠলো। সে আর কথা না বাড়িয়ে প্রায় দৌড়ে অন্দর মহলের দিকে চলে গেল। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম। অনভ্যস্ত নমস্কারের ভঙ্গি করে ওকে আমি অনর্থক বিরক্ত করলাম না তো? আমার ব্যবহারে ও কিছু মনে করলো না তো? ভেবেছিলাম ঘটনাটা মিঃ সেনকে জানাবো। কিন্তু কি কারণে যেন আর জানানো হয়ে ওঠেনি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন অফিস থেকে ফিরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় মৈত্রেয়ী এসে দরজায় টোকা দিলো। দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে সে ভয়ে ভয়ে বললো, আমার বাবা কখন ফিরবেন আপনি জানেন?

আমার দরজায় মৈত্রেয়ীকে দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আজ স্বীকার করছি সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা উচিত ছিল, তা সেদিন ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। তাকে ঘরের ভেতরে আসতে বলার বা বসতে বলার সাহস আমার হলো না। তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে এত অসংলগ্ন কথা বলেছিলাম, যা আজ মনে পড়লে হাসি পায়। সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার মা-ই আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন। আপনি সারা দিন পরিশ্রমের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা এই ঘরে কাটান। আমাদের বাড়িতে আনন্দ করার মতোও কিছু নেই। সন্ধের পরও যদি আপনি এইরকম ভাবে একা-একা কাটান, তাহলে আপনি তো আবার অসুখে পড়বেন!

—এ-ছাড়া আমি আর কী করতে পারি?

—আপনি যদি চান, তাহলে আমার সঙ্গে গল্প করতে পারেন, অথবা বাইরে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসতে পারি আমরা।

দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি বললাম, আমার তো কোনো চেনা লোক নেই এখানে, তাছাড়া এমন কোনো বন্ধুও নেই যার বাড়িতে গিয়ে আমি গল্প করতে পারি।

ও মৃদু হেসে উত্তর দিলো, সেই ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটে বুঝি এরকম ছিল না, না?

তারপরে হঠাৎ কী মনে করে বারান্দার দিকে চলে গেল, বলে গেল, দেখে আসি চিঠিপত্র কিছু এসেছে কিনা।

দরজায় ঠেস দিয়ে আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজছিল। সুরটা শ্রুতিমধুর ছিল না। এ ধরনের সুর তার দোতলার শোবার ঘর থেকে প্রায়ই আমার কানে ভেসে আসতো। তার শোবার ঘরের একটা জানালা ছিল রাস্তার দিকে। আর দরজাটা ছিল বাড়ির ভেতরের দিককার বারান্দায়। সেই বারান্দায় লতিয়ে উঠেছিল একটা লাল ফুলের গাছ। প্রায়ই তাকে গান গাইতে অথবা ছোট বোনের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে শোনা যেতো। মাঝে মাঝে তাকে হঠাৎই খুব কাছের মানুষ বলে মনে হতো, যখন সে বারান্দা থেকে ঝুঁকে নিচের কারো ডাকের জবাবে মাথা নিচু করে ছোট্ট একটা চিৎকার করে বলতো, 'যাচ্ছি'।

মৈত্রেয়ী কিছু চিঠিপত্র হাতে নিয়ে ফিরে এলো। আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সাড়ির কোণে চাবি বাঁধার চেষ্টা করছিল। সে খুব অহঙ্কারের সুরে

বললো, চিঠির বাক্সের চাবি আমিই রাখি।

তারপর চিঠির ওপরের নামগুলো দেখতে দেখতে একটু দুঃখের সঙ্গেই বললো, কিন্তু আমাকে কেউ চিঠি লেখে না।

—আপনাকে কে চিঠি লিখবে?

—কেন, যে কেউ লিখতে পারে।

তার কথা বুঝতে না পেরে তার দিকে আমি একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলাম। সেও এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলো। বললো,

—মনে হচ্ছে আমি ব্যাকরণে ভুল করলাম।

—না, না, আপনি তো কোনো ভুল করেননি।

—তাহলে আপনি আমার দিকে ওইভাবে তাকিয়ে রইলেন কেন?

—তাকিয়ে রইলাম কেন? আমি বুঝতে পারছিলাম না, অচেনা কোনও লোক আপনাকে চিঠি লিখবে কেন?

—সত্যিই অসম্ভব, না? বাবাও ঐ কথা বলেন। বাবা কিন্তু আপনাকে খুব বুদ্ধিমান ভাবেন।

—সত্যি নাকি?

আমি ঠাট্টা করে উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেলাম। প্রত্যুত্তরে বোকার মতো হাসলাম। ও কিন্তু আগের কথার রেশ ধরে বলতে লাগলো, আপনি আমাদের বারান্দাটা দেখবেন?

আমি সানন্দে রাজী হলাম। আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ছাদের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আকাশ দেখতে, সূর্যের আলো গায়ে মাখতে, পার্ক আর বাংলোওয়ালা পাড়াটাকে ভালো করে ওপর থেকে দেখতে। প্রথম প্রথম এই পাড়ায় এসে আমি প্রায়ই পথ হারাতাম।

—আমি কি এই পোশাকেই যেতে পারি?

আমার প্রশ্নে মৈত্রেয়ী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো দেখে বললাম, দেখুন আমার গায়ে কোট নেই, টাই নেই। পায়ে টেনিস খেলার জুতো, তাও আবার মোজাবিহীন।

সে আমাকে লক্ষ্য করতেই থাকলো, আর হঠাৎই প্রশ্ন করলো, আপনাদের বাড়িতে লোকে বারান্দায় যেতে গেলে কী করে?

—আমাদের বাড়িতে বারান্দাই নেই।

—সত্যি! একদম নেই?

—না, একটাও নেই।—খুবই দুঃখের কথা। তাহলে আপনাদের বাড়ির লোকেরা আকাশ, কী ভাবে দেখেন? সূর্য কীভাবে দেখেন?

—কেন? যেখানে খুশি, রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে, যেখানে ইচ্ছে গিয়ে দেখে।

সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বললো, এই জন্য আপনারা এত ফর্সা আর সুন্দর। জানেন আমারও ভীষণ ফর্সা হতে ইচ্ছে করে। তা সম্ভব নয়, না?

—আমি জানি না....পাউডার মাখলে বোধহয় হয়....।

মৈত্রেয়ী রেগে গেল। বললো—পাউডার তো ধুয়ে যায়। আপনি যখন ছোট ছিলেন, তখন কি আপনাকে পাউডার মাখিয়ে ফর্সা করা হয়েছিল?

—না, ঠিক তা নয়।

—আপনাকে পাউডার মাখালে আপনি আর সুস্থ থাকতেন না। তলস্তয় বলেছেন।

আমি অবাক হলাম। তার মুখটা এখন পাল্টে গেছে। খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে বললো, আপনি তলস্তয়কে চেনেন না? বিখ্যাত রুশ-লেখক! জানেন, প্রথম জীবনে তিনি খুব ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েও শেষ বয়সে সব ছেড়েছুড়ে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন, ঠিক ভারতীয়দের মতো। চলুন, বারান্দায় যাবেন তো?

আমরা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। আমার একটু ভয় ভয় করছিল যখন দোতলায় মেয়েদের ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে ইচ্ছে করেই জোরে জোরে কথা বলছিল যাতে সবাই আমার উপস্থিতি টের পায়। বিশেষ করে বোধ হয় তার মাকে জানান দেবার জন্যই।

বারান্দায় এসে আমার মনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। বাড়ির ওপরতলা থেকে পাড়াটাকে একেবারে অন্যরকম মনে হচ্ছিল। অনেক শান্ত, আর অনেক সবুজ। রাস্তার ধারে গাছগুলো আমি লক্ষ্য করেছি, কিন্তু তারা যে সংখ্যায় এতো, তা ভাবতে পারিনি। রেলিং-এ হেলান দিয়ে নিচের উঠোনটা দেখলাম। মনে পড়ে গেল এ বাড়িতে আমার আসার সেই প্রথম দিনটিতে সিঁড়ির ধাপের ওপর মৈত্রেয়ীর হাসিতে-ফেটে-পড়া চেহারাটা। মনে হচ্ছিল সেই দিনটা কতো তাড়াতাড়িই পুরনো হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কতো দিন পার হয়ে গেছে, আমি কতো পুরনো আর পরিচিত হয়ে গেছি। তখন মৈত্রেয়ী এসে আমার ঘরে দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছে তার বাবা কখন ফিরবেন।

আমি ওকে ঠিক বুঝেও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল ওর

মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক আদিম শিশু। ওর কথাবার্তা আমায় আকর্ষণ করতো। ওর অসংলগ্ন চিন্তাধারা, সরলতা আমায় মুগ্ধ করতো। নিজেকে তখন রীতিমত সেইরকম এক সভ্য, স্বাভাবিক মানুষ মনে হতো, যে কি না একজন প্রায় অসভ্য মানবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছে।

—আমার বোন ভালো ইংরাজী বলতে পারে না, কিন্তু জানেন ও সব বুঝতে পারে।

মৈত্রেয়ী নিজের বোনকে বারান্দায় এনে কথাটা বললো।

—ও আপনাকে একটা গল্প বলতে বলছে। আমিও গল্প শুনতে খুব ভালবাসি।

তখন আসন্ন সন্ধ্যার কাল। অনেক দিন পরের আশ্চর্য সুন্দর আকাশের নিচে আমি। প্রকৃতির পটপরিবর্তন হচ্ছে। সামনে দুটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। যেন হঠাৎই পর্দা সরে গিয়ে নতুন ভালোলাগা একটা দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর আমি বললাম, অনেক কাল গল্প পড়িনি। তা ছাড়া আর একটা অসুবিধাও আছে, তা হলো আমি ভালো গল্প বলতে পারি না। ভালো করে গল্প বলতে পারার জন্য প্রতিভা থাকা দরকার। সকলের তা থাকে না।

কথাটায় ওরা খুব দুঃখ পেলো। ওদের দুঃখ এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে, তা অনুভব করে আমার ভীষণ খারাপ লাগলো। ভালো হোক খারাপ হোক, ছোটবেলায় পড়া যা-হোক কিছু মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই মনে আসছিল না। নিজেকে তখন এত নির্বোধ আর অসহায় লাগছিল! পেরো, গ্রীম, অ্যাণ্ডারসন, হার্ন, 'এদের লালটুপি পরা ছেলে' 'ঘুমন্ত অরণ্যের সুন্দরী' 'যাদুকর ঐশ্বর্য' এই সব গল্পগুলোর কথা মনে পড়লো। কিন্তু গল্পগুলো তখন এত খেলো মনে হলো যে, যদি শোনাতে গিয়ে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়? তাই বাদ দিলাম। ইচ্ছে করছিল ওদের এমন কিছু বলি, যার মধ্যে দুঃসাহসিকতা, ঘটনার জটিলতা, এসব আছে। মনে হচ্ছিল এক কথায় এমন কিছু বলি, যা একজন বুদ্ধিমান, সংস্কৃতিবান, সপ্রতিভ যুবকের বলার পক্ষে উপযুক্ত আর যা ওদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থাৎ যা ছোট মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীকেও আনন্দ দিতে পারে, মৈত্রেয়ীকেও সমান কৌতূহলী করে তুলতে পারে। পরিতাপের বিষয় এইরকম কিছু আমার তখন মনে পড়লো না।

—একটা গাছের গল্প বলুন আমাদের! ওর ছোট বোন ছবু বললো। আমার

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যা-হোক কিছু বানিয়ে বলি। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলতে শুরু করলাম ঃ

—অনেক, অনেক দিন আগে এক দেশে একটা গাছ ছিল, যার শিকড়ের নিচে ছিল গুপ্তধন। একদিন এক নাইট—।

ছবি জিজাসা করলো—নাইট কী?

মৈত্রেয়ী তাকে বাংলায় বোঝাতে লাগলো 'নাইট' কাদের বলে। আর সেই সুযোগে আমি গল্পের বাকি অংশ ভাবতে শুরু করলাম। পরে যা বললাম, তা এই ঃ

এক রাত্রে নাইট স্বপ্ন দেখলো যে এক পরী তাকে ওই ধনরত্নের জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

ওই রকম বোকা বোকা একটা গল্প বলতে গিয়ে এত লজ্জা হচ্ছিল, যে আমার আর ওদের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না, তাই অকারণে জুতোর ফিতে বাঁধতে শুরু কলাম। যাই হোক এক সময় গল্প আবার বলতে শুরু করতেই হলো ঃ

—একটা ম্যাজিক আয়নার সাহায্যে নাইট সেই সব ধন-রত্ন উদ্ধার করতে গেল।

গল্পটা আর বাড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ী সবই বুঝতে পারছে। কিন্তু চোখ তুলে দেখলাম, সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার গল্প শুনছে...।

—কিন্তু নাইট দারুণ বিস্ময়ে দেখলো ধন-রত্নের ওপর একটা জ্যান্ত ড্রাগন বসে পাহারা দিচ্ছে ; তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুন...।

এই জায়গাটা বলতে গিয়ে লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে গেল।

—তখন...

হঠাৎ ছবু বাধা দিয়ে বললো—কিন্তু গাছটা? গাছটা কী বললো?

—গাছটা তো এমনি সাধারণ গাছ! জাদু গাছ তো নয়, তাই সে কথা বলতে পারতো না।

—কিন্তু কথা বলার জন্য তাকে জাদু গাছই বা হতে হবে কেন?

আমি মহা বেকায়দায় পড়লাম। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম।

—যাইহোক গল্পটা এরকমই। এই গাছটা কথা বলতে পারতো না। ওর প্রাণ ছিল না।

ছবু মহা উত্তেজিত হয়ে দিদিকে কিছু বলতে শুরু করলো। এই প্রথম

বাংলা না জানার জন্য আমার প্রচণ্ড দুঃখ হলো। সুরেলা, মিষ্টি গলায় ছবু কিছু বলছিল।

—ও কী বলছে?

—ও আমাদের বাড়ির গাছগুলোর কথা তুলে জিজ্ঞাসা করছে যে, এই গাছটিরও প্রাণ আছে কিনা?

আমি বললাম সব গাছেরই প্রাণ আছে।

—ওর একটা প্রিয় গাছ আছে বুঝি?

—বড়োগাছ নয়। উঠোনের ধারে হয়েছে একটা চারা গাছ, যার ডালপালা-গুলো দেখবেন রেলিং অবধি উঠে এসেছে,—ছবু রোজ গাছকে খেতে দেয়, —নিজে যা যা খায়, সব।

যাক কথাবার্তা অন্য দিকে ঘুরে যেতে প্রাণে বাঁচলাম।

—খুব ভালো ছবু, খুব ভালো! কিন্তু তোমার গাছ তো পিঠে খায় না।

ছবি আমার মন্তব্য শুনে বললো,

ও হ্যাঁ—ওটা, আমিই খাই। অবিশ্যি ওকে একটু একটু দিই।

পাইপ খাবার ভান করে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিলাম। কাঠের খিলটা দিয়ে দরজা বন্ধ করে ডায়েরিতে পুরো ঘটনাটা টুকে রাখতে শুরু করলাম। বিশেষ করে, আমার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর কথাগুলো। তার চিন্তার রূপ। বারান্দায় আমার গল্প বলার কষ্টকর অভিজ্ঞতা। ছবুর মানসিকতা—যে নিজের সঙ্গে জড় পদার্থের অনুভূতির পার্থক্য করে না, সে গাছকে পিঠে খেতে দেয়, কারণ সে নিজে পিঠে খায়, যদিও সে ভালোভাবেই জানে গাছটা পিঠে খায় না। ভারী মজা লাগছিল আমার।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। অফিসের কাজ শেষ হয়েছে। মিঃ সেন আমাকে ছেড়ে দেবার সময় কাঁধে হাত রেখে বললেন,—অ্যালেন, দেখো আমার স্ত্রীর তোমার ওপর খুবই সহানুভূতি আছে আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি আমাদের বাড়িকে নিজের বাড়ি বলেই মনে করবে। তুমি যখন যে ঘরে ইচ্ছে যেতে পারো। আমরা গোঁড়া নই, আর বাড়িতে পর্দাপ্রথাও নেই। তোমার যখন যা দরকার আমার স্ত্রীকে বলবে অথবা মৈত্রেয়ীকে বলবে,—আশা করি মৈত্রেয়ী তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পেরেছে।

তাঁর কথায় আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

মিঃ সেন বললেন,—কিছু মনে করো না। বিদেশী তুমি, ভারতীয় মেয়েরা এখনো সেকেলে রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই এদের ব্যবহারে

কিছু মনে করো না।

এরপর তিনি মৈত্রেয়ীর ব্যাপারে দুটো সত্য ঘটনা শোনালেন। একদিন তাদের ইটালীয়ান কন্‌সুলেটে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। কন্‌সুলেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় গাড়িতে ওঠার জন্য কন্‌সাল তাদের সাহায্য করছিলেন। একটাই মাত্র ছাতা ছিল, মৈত্রেয়ী যাতে ভিজে না যায়, তাকে ভালোভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য কন্‌সাল ছাতার তলায় তার হাতটা ধরলেন। মৈত্রেয়ী এত ভয় পেয়ে গেল যে, ছাতা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে লাফিয়ে মোটরে উঠলো। আর সেই যে তার কান্না শুরু হলো ভবানীপুরের বাড়িতে মা'র কোলে আশ্রয় নেবার আগে আর তা থামলো না। ঘটনাটা বছর খানেক আগেকার। তখন মৈত্রেয়ীর প্রায় বছর পনেরো বয়স, ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে আই. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আর একটি ঘটনা হলো, একটি ইওরোপীয় পরিবারের নিমন্ত্রণে তারা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। অন্ধকারে বক্সে, একটি ফুলবাবু তার হাত ধরার চেষ্টা করায় মৈত্রেয়ী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বেশ জোরেই বলেছিল, যাতে আশপাশের সবাই শুনতে পায়, 'আপনার মুখে জুতোর বাড়ি মারবো।' সমস্ত বক্সের লোকেরা উঠে দাঁড়াল। এক মহিলা (কলকাতার সবাই তাঁকে চেনে বলে নামটা গোপন রাখা হলো) মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। মৈত্রেয়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার কি ইংরেজী ব্যাকরণে ভুল হয়েছে?'

কাহিনী দুটো শুনে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু নিজের মনে একটা প্রশ্ন আমি এড়িয়ে যেতে পারিনি। সেটা এই যে, মৈত্রেয়ী বাস্তবিকই কি অত সরল, না কি রসিকতা দিয়ে তার স্বভাব ঢাকতে চেষ্টা করছে, আর আমাদের নিয়ে খেলা করছে! এই ধারণা আমাকে তাড়া করে ফিরতো যখনই বাড়িতে আশপাশের ঘর থেকে তার জোরে কথা বলার আওয়াজ বা উচ্চৈঃস্বরে হাসির শব্দ ভেসে আসত।

মিঃ সেন একদিন বলেছিলেন—জানো অ্যালেন, ও কবিতা লেখে।

—তাই নাকি! দেখুন, আমারও কেমন যেন সন্দেহ ছিল.....!

এই ঘটনা জানার পর মৈত্রেয়ীর প্রতি আমার কিছুটা বিরাগ এলো। এদেশের সব মেয়েরাই কবিতা লেখে, সব প্রতিভাবান সন্তানরা কবিতা চর্চা করেন আর মিঃ সেন তাঁর মেয়েকে প্রতিভাময়ী বলে মনে করেন,—এ চিন্তাগুলো আমার বিরক্তি উৎপাদন করতো। যতবার তিনি আমাকে

বলতেন ঃ ওর প্রতিভা আছে! তখনই মৈত্রেয়াকে আমার মনে হতো, মেয়েটা নির্বোধ।

মিঃ সেন আমাকে তির্যক্ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে এ-ও বলতেন—হ্যাঁ হে, ও দার্শনিক, কবিতা লেখে। ওর কবিতার প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

আমি নিরাসক্তভাবে মন্তব্য করলাম—তাই নাকি!

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সন্ধ্যাবেলা মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আবার মুখোমুখি হয়ে গেলাম। ও লাইব্রেরি থেকে একটা বই হাতে করে বেরোচ্ছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহাসের সুরে বললাম, জানতাম না আপনি কবি।

সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

—অবশ্য কবিতা লেখা কোনো দোষের জিনিস নয়। তবে দেখতে হবে সে কবিতা যেন সুন্দর হয়—

—আপনি কি করে জানলেন আমার কবিতা সুন্দর নয়?

—দেখুন, কথাটা বোধ হয় বোঝাতে পারিনি। আসলে, বলতে চেয়েছি, আপনার কবিতায় সৌন্দর্য নিশ্চয়ই থাকতে পারে, তবে কবিতায় দর্শন—জীবনকে জানার অভিজ্ঞতা আপনার যথেষ্ট আছে?

সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো তারপর আবার তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো। লক্ষ্য করলাম, তার হাসির সঙ্গে মিশে আছে অদ্ভুত এক আন্তরিকতা। লজ্জা-জড়ানো এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে সে তার হাত দুটো রেখেছিল নিজের বুকের ওপর।

—হাসছেন কেন?

হঠাৎ সে থেমে গেল।

—কেন, হাসতে বারণ আছে?

—না তা নয়, যার যা ভালো লাগবে সে তাই করবে। কিন্তু শুধু আপনার হঠাৎ এই হাসির কারণটা যদি বলে দেন.....

—বাবা আপনাকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করেন.....

আমি অধৈর্য হবার ভঙ্গি করলাম।

ও বললে, ভয় হয় ভুল করে আপনার রাগের কারণ না হই।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো, যা দেখে আমার আনন্দ হলো। বললাম, আমি রাগ করলে আপনার ভয় হবার কারণ কি?

—কারণ আপনি আমাদের অতিথি। ভগবানই অতিথিকে পাঠিয়ে দেন।

—আর অতিথি যদি খারাপ লোক হয়?

যেমন ভাবে মানুষ একটা শিশুকে প্রশ্ন করে সেইভাবেই তাকে প্রশ্ন করছিলাম। যদিও তার মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছিল।

—ভগবান তাকে ডেকে নেন—

—কোন্ ভগবান?

—তার ভগবান।

—কেমন করে? প্রত্যেকটা লোকেরই আলাদা ভগবান আছে নাকি?

শেষ কথাগুলোর ওপর আমি বেশ জোর দিয়েছিলাম। সে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, তারপরে চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবলো। তখন ওর চোখে ছিল, স্নেহময় কোমল নতুন এক অভিব্যক্তি!

—আমার কি কিছু ভুল হলো?

—আমি কী করে জানবো? আমি তো আপনার মতো দার্শনিক নই।

—দেখুন, আমি ভালোবাসি স্বপ্ন দেখতে, চিন্তা করতে, কবিতা লিখতে....

এই হচ্ছে দার্শনিকতা!—আমি নিজের মনে ভাবলাম, এবং হাসলাম।

—আমি অনেকদিন বাঁচতে চাই। আমি রবি ঠাকুরের মতো বৃদ্ধ হতে চাই। যখন মানুষ বুড়ো হয় তখন সে বেশি ভালোবাসতে পারে, আর কম দুঃখ পায়। এই ভাবে কথা বলতে বলতে লজ্জায় ও লাল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবার জন্য উন্মুখ হলো। কিন্তু কি ভেবে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো। ও বোধহয় বুঝতে পারছিল যে তার কথাগুলো আমি কীভাবে নেবো। সে তার বোধের অতীত ও তৎক্ষণাৎ বিষয়ান্তরে গেল। বললো—মা খুব চিন্তা করছেন। তিনি একটা বইতে পড়েছেন যে ইওরোপে রোজ লোকে সুপ খায়। আমাদের বাড়িতে তো সুপ হয় না, সেজন্য আপনি রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

তাকে শান্ত করার জন্য বললাম, আমি সুপ ভালোবাসি না।

শুনে মৈত্রেয়ীর চোখ আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠলো।

—কিন্তু আপনারা এত ভাবছেন কেন? এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা?

—মা ভাবছেন, তাই—

ও আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মত পাল্টালো। ওর এই অকস্মাৎ নীরব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে খুব বেকায়দায় ফেললো। মনে হলো আমি কি তার মনে কোনো আঘাত দিয়ে ফেললাম!

—যদি কোনো অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। আপনাদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয় তা আমার এখনো ভালো করে রপ্ত হয়নি।

সে চলে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়ালো। যে ভাবে আমার দিকে তাকালো সে দৃষ্টির অর্থ আমি বোঝাতে পারবো না। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বললো—কেন আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন? আমায় আপনি কষ্ট দিতে চান?

আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললাম—না না সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। আমি ভাবছিলাম আপনি রেগে গেছেন তাই...

—একজন পুরুষমানুষ কী করে একটা মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে?

—যখন সে ভুল করে ....এটাই আমার অভ্যাস।

—একজন যুবতী মেয়ের কাছে?

—এমনকি একটা শিশুর কাছেও। এটা ঠিক যে....

—সব ইওরোপীয়ানরাই কি এরকম?

আমি ইতস্তত করছিলাম।

—প্রকৃত সভ্য ইওরোপীয়ানরা....

চোখ বন্ধ করে গভীর ভাবে ও কিছু চিন্তা করলো, তারপরে, ঝংকার দিয়ে হেসে উঠলো আর সেই আগেকার ভঙ্গীতেই তার দুহাত বুকের কাছে চেপে ধরলো।

—বোধ হয় বিদেশীরা নিজেদের মধ্যেই ক্ষমা ভিক্ষা করে থাকেন। কিন্তু আমার কাছেও কেউ ক্ষমা চাইতে পারে.....!

—নিশ্চয় পারে।

ছবুর কাছে?

—নিশ্চয়।

—ছবু তো আমার চাইতেও কালো।

—এটা কি সত্যি কথা?

মৈত্রেয়ীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। বললো, হ্যাঁ, সত্যি কথাই। আমি আর মা, ছবু আর বাবার চাইতে ফর্সা। আপনি লক্ষ্য করেন নি?

—তাই না হয় হলো। তাতে কি যায় আসে?

—কেন? আপনি কি দুটো একই মনে করেন? জানেন কী, কালো বলে ওর বিয়ে দিতে খুবই অসুবিধে হবে আর অনেক টাকা লাগবে?

এই কথাগুলো বলতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল। লজ্জায় ও লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজেও খুব বিচলিত বোধ করছিলাম। হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য আমি লুসিয়্যাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম একজন যুবতী মেয়ের পক্ষে ওই জাতীয় বেচাকেনার গল্প করতে কতখানি খারাপ

লাগতে পারে। দুজনের পক্ষেই সৌভাগ্য বলতে হবে যে, মিসেস সেন সেই সময় ওকে ওপর থেকে ডাক দিলেন। মৈত্রেয়ী বইটা বগলে করে চেঁচিয়ে 'যাচ্ছি' বলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে গেল।

আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। আজকের অভিজ্ঞতা মুগ্ধ হয়ে ভাবছিলাম। রাতের খাবার সময় এগিয়ে আসছিল। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। বাঙালীদের রীতি অনুযায়ী রাতের খাওয়া হতো খুব দেরিতে, রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। তারপরে আমরা শুতে যেতাম।

ডায়েরিতে কিছু লেখার জন্য সেটা খুললাম। ফাউন্টেন পেনটি শূন্যে ধরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর ডায়েরিটা বন্ধ করতে করতে মনে মনে বললাম—'বোকামি'।

৫.

একথা আজ খোলাখুলি স্বীকার করবো, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রথম দিকে আমি কখনোই ভালোবাসার কথা চিন্তা করিনি। বরং বলা চলে ওর রহস্যময় প্রকৃতির প্রতি আমি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম। যখনই অবকাশ পেতাম, তার কথা চিন্তা করতাম। ডায়েরিতে একগাদা ঘটনা ও আলোচনা লিপিবদ্ধ করতাম। মাঝে মাঝে যে অসুবিধায় পড়তাম না, তা নয়—ওর কাজলকালো চোখদুটির অদ্ভুত সৌন্দর্য, অবোধ্য ওর উত্তরগুলো, ওর বাঁধভাঙা হাসি। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে ঐ ষোড়শী তরুণীর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু পদে পদে এ-ও বুঝতাম, ওর চলাফেরার মধ্যে এক মোহিনী আহ্বানের শক্তি লুকিয়ে ছিল। ভবানীপুরে থাকাকালীন দিনগুলো আমার কেমন অলৌকিক আর অবাস্তব বলে মনে হতো। এত তাড়াতাড়ি, আর এত স্বাধীনতা নিয়ে একটা ভারতীয় পরিবারের মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পেরেছিলাম, যা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। কোনো কোনো দিন, যখন মনে মনে আমার প্রকৃত জীবনে, অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব জীবনধারার মধ্যে ফিরে যেতাম, তখন এই ভারতীয় স্বপ্নের জগৎ যে অলৌকিক বলে মনে হতো, তাতে সন্দেহ নেই। আশ্চর্য পরিবর্তন আমার! পুরোনো জগতের কিছুই আর ভালো লাগতো না। না জীবন-ধারা না বন্ধুবান্ধব। এখন আর পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যা আমাকে আকর্ষণ করে না। পলিটিক্যাল ইকনমি, ইতিহাস, আর কিছু রোমান্টিক উপন্যাস—এগুলোর মধ্যেই আমি ডুব দিয়েছিলাম।

একদিন মৈত্রেয়ী এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি বাংলা শিখতে চাই কি না। তাহলে ও রাজী আছে আমার শিক্ষকতা করতে। এর আগে চলতি বাংলা কথোপকথনের দু একটা বই আমি পড়েছিলাম। মৈত্রেয়ী যখন চিৎকার করে কিছু বলে অথবা যখন রেগে যায়, তখনকার ভাষা—এসব বোঝবার জন্যে গোপনে গোপনে এই বই আমি পড়তাম। আমি জানতাম 'যাচ্ছি' মানে 'আমি যাইতেছি'। এ ছাড়া আর একটা শব্দ যা প্রায়ই শুনতাম, 'কী ভীষণ', যার অর্থ হলো 'ইহা অস্বাভাবিক'। আমার ছোট্ট বইখানা এর বেশি কিছু আমাকে শেখাতে পারেনি, তাই মৈত্রেয়ী যখন আমাকে বাংলা শেখাবার প্রস্তাব দিলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। শর্ত ছিল, পরিবর্তে তাকে ফরাসী শেখাতে হবে।

সেইদিন থেকেই দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের অব্যবহিত পরে আমার শোবার ঘরে আমাদের পাঠ শুরু হলো। প্রথমে আমি বলেছিলাম লাইব্রেরিতেই

বসবো, কিন্তু মিঃ সেন নিজেই আমার শোবার ঘরে আমাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে বললেন যাতে আরো নিরুপদ্রবে পড়াশোনা হয়। নরেন্দ্র সেনের তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহ এবং মিসেস সেনের এই উদার মনোভাব আমি ভালো চোখে দেখিনি। কখনো কখনো এরকম সন্দেহ যে মনে বাসা বাঁধেনি তা নয় যে, আমার আশ্রয়দাতারা আমার সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন না তো! যদিও এটা ছিল অসম্ভব, কারণ এতে তাদের সবাইকেই জাত খোয়াতে হতো।

প্রথম প্রথম পড়ার টেবিলে মৈত্রেয়ীর থেকে অনেক দূরে বসতাম আমি। ও আমার অসুবিধাগুলো শান্ত ভাবে বোঝবার চেষ্টা করতো, কিন্তু ভালো বুঝতে না পারার ফলে কয়েকদিন পর থেকে আমার কাছ ঘেঁষে বসতে শুরু করলো। কিন্তু এত নিবিষ্ট মনে আমাকে লক্ষ্য করতো যে আমি পড়ায় মন দিতে পারতাম না। 'হ্যাঁ', 'না' ছোট ছোট মন্তব্যে পাঠের দায় সেরে তাকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করতাম। আর নিজের মনটাকে যেন সমর্পণ করতাম আমার নিজের দৃষ্টির কাছে। আমার চোখ থেকে ফুটে বেরোতো এমন এক দৃষ্টি, যেন সেটা দৃষ্টি নয়। এক তরল ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ! আমি নিবিষ্ট মনে তার মুখ দেখতাম। দেখতে দেখতে মনে হতো ও যেন ছাঁচে ঢালা সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে মূর্তিমতী বিদ্রোহ। মৈত্রেয়ীর তিনটি ছবি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু সেগুলোর মধ্যে এই মৈত্রেয়ীকে চিনতে পারতাম না।

বাংলা পড়ার শেষে আমাদের চুক্তি মতো ফরাসী ভাষার পাঠ আরম্ভ হলো। আমি তাকে বর্ণমালা ও বিভিন্ন সর্বনাম সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো—'আমি একটি যুবতী মেয়ে' এটা ফরাসীতে কী হবে? আমি লিখে দিলাম। সে খুব খুশি হয়ে বারবার বলতে লাগল, 'জ্য সুই য়ুন্ জ্যেন ফিই'।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ও একেবারে সঠিক উচ্চারণ করছিল। কিন্তু ওকে যা শেখাতে যাচ্ছিলাম তা আমার মাঠে মারা গেল। পড়াতে গেলেই সে আমায় থামিয়ে দিতো আর ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ফরাসী অর্থ বলে দেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো—যেগুলোর মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই।

ও এই প্রস্তাব করলো ঃ আপনি অনুবাদ করে দিন, আমি বার বার বলে অভ্যেস করে নিই।

যেন ভাষা শেখার এক সুন্দর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে ও। আমাদের মধ্যে কৌতূহলী কথাবার্তার বিনিময় শুরু হলো। মৈত্রেয়ী বারবারই আমায় জিজ্ঞাসা

করতো আমি ঠিক ঠিক অনুবাদ করছি কি না।

কিছুদিন যাবার পর ও আমার দিকে ওই অদ্ভুতভাবে তাকানোটাও বন্ধ করলো। কথা প্রধানত আমিই বলতাম। আর সেই সময় ওর নোট বুকেও হিজিবিজি কেটে চলতো। একদিন আমি যখন পড়াচ্ছিলাম, ও ওর নোট বুকে অন্তত বার দশেক রবীন্দ্রনাথের নাম সই করলো, তারপরে একটা ফুল আঁকতে শুরু করলো। ফুল আঁকা শেষ হলে ও লিখতে শুরু করলো, 'কালকুতা', 'জরেগ্রেত', 'পুরকোয়া'। তারপর করলো কি, বাংলায় বানিয়ে বানিয়ে কবিতা লিখতে লাগলো। আমার তখন মনে হচ্ছিল বুঝি কোনো অপরিচিত লোকের সামনে বসে আছি। বিরক্ত হচ্ছিলাম কিন্তু ওকে থামিয়ে দেবার আমার সাহস হলো না। এই রকম চলছিল। হঠাৎই একদিন ও আমায় প্রশ্ন করলো—যখন আপনি পড়ান তখন যে আমি লিখি, এটা আপনি পছন্দ করেন না, না? তা কথাটা বলতে এত ইতস্তত করছেন কেন?

তাড়াতাড়ি করে কী উত্তর দিয়েছিলাম তা আর আজ মনে নেই, তবে আমি যে রেগে গিয়েছিলাম তা আমি স্বীকার করছি। আমি পড়ানো চালিয়ে গেলাম। এবং যথারীতি ও লিখে চললো, 'ইল্ এ তার', 'ইল্ এ ত্রো তার', 'মে হিল ন্য পা ব্র্য তার।' আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম,—এসবের মানে কী?

—এই একটু মজা করছিলাম!—বলে সে প্রত্যেকটি শব্দ মুছে ফেলে সেই জায়গায় একটা করে ফুল আঁকতে শুরু-করলো। আমার মাথায় একটু বুদ্ধি খেলে গেল, বললাম, তুমি ছবিকে ফরাসী শেখাও না!

বলেই আমি হেসে ফেললাম। আমার হাসিতে ও-ও মজা পেলো।

—আপনার মনে হচ্ছে আমি পারবো না? আমি আপনার চাইতে অনেক ভালো পড়াতে পারবো।

সে গম্ভীর হয়ে এই কথাগুলো বললো, আর তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় দেখতে লাগলো। আমি মৈত্রেয়ীর এই চেহারা আগে কখনও দেখিনি। এক আশ্চর্য আনন্দে আমি শিউরে উঠছিলাম। সেদিন ওকে পরিপূর্ণভাবে 'নারী' বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ও একান্ত আপনার। এই সময়গুলোতে আমি ওকে যতটুকু বুঝতে পারতাম, যত গভীরভাবে বুঝতে পারতাম, ঠিক ততখানিই ওকে দুর্বোধ্য মনে হতো, যখন ও অন্যের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত থাকতো।

আমি ফরাসীতে কী উত্তর দিয়েছিলাম মনে নেই। অনুবাদ করে তার গুরুত্ব কমাতেও আমার ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু ও লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এবং আমায়

বললো, কথাটা আবার বলুন। তা শুনে নিয়ে বাক্যটার প্রতিটি শব্দ ও মুখস্থ করে টেবিল থেকে অভিধান নিয়ে সেই রহস্যময় বাক্যের অর্থ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হলো। কিন্তু এতো করে কিছুতেই যখন বুঝতে পারলো না, তখন প্রচণ্ড রেগে গেল। বললো, আপনি মজা করতে জানেন না।

—পড়ানোর সময় মজা করতে আমি ভালবাসি না।

যতখানি রাগের ভান এবং উচ্চারণে রুক্ষতা আনার দরকার ছিল ততখানি বোধহয় হয়নি। ও কী বুঝলো তা ওই জানে। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলো। ভাববার সময় ওর অভ্যেসই ছিল চোখ বন্ধ করা। আমি দেখলাম সারা মুখের তুলনায় চোখের পাতাগুলো একটু ফর্সা, তার ওপর হাল্কা একটা বেগুনি আভা। হঠাৎই সে উঠে পড়ে বললো, দেখি কিছু চিঠিপত্র এলো কিনা।

আমি ওর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবছিলাম ও কি কিছুই শিখবে না বলে মনঃস্থ করেছে? মিঃ সেনের কাছে আমি কী কৈফিয়ৎ দেবো! মৈত্রেয়ী অবশ্যি তাড়াতাড়িই ফিরে এলো, হাতে চিঠির বদলে দু গুচ্ছ ফুল। বারান্দার লতানে গাছেরই ফুল বলে মনে হলো।

—পড়া কি আবার শুরু করবো? 'জ্য সুই য়ুন্ জ্যেন ফিই'।

—ভালো হয়েছে। এ বাক্যটা তুমি আগেই শিখেছো। তারপর?

—'জ্য প্রাঁ ল' ফ্রাঁসে'।

—কিন্তু এগুলো তো গত সপ্তাহে পড়ানো শেষ হয়ে গেছে।

—সেই গাড়িতে যে মেয়েটাকে দেখেছিলাম, ওকেও কি ফরাসী শেখান? হঠাৎই ও প্রশ্ন করে বসলো একটু যেন ভয়ে ভয়ে।

—আরে দূর! ও একটা গবেট। ওকে পাঁচ বছর ধরে পড়ালেও...

—পাঁচ বছর পরে আপনার বয়স কত হবে?

—তিরিশ একত্রিশ হবে।

—অর্ধেকেরও কম বয়স। যেন ও ওর নিজের জন্যই বললো।

তারপরে ও ওর খাতার ওপর ঝুঁকে আবার লিখতে শুরু করলো রবীন্দ্রনাথের নাম, বাংলায় এবং ফরাসীতে। তখন বাস্তবিকই আমার রাগ হচ্ছিল একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধের জন্য তার আদিখ্যেতা দেখে। এক সময় স্মৃতির কথা বলেছিলাম যাতে ও একটু ঈর্ষান্বিতা হয়। কিন্তু এখন ও স্মৃতিকে ভুলেই গেছে। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ও আসলে যতটা সরল তার চাইতে বেশি সরল সেজে ও আমাকেই পরিহাস করতে চাইছে।

একটা বছর-ষোল'র বাচ্চা মেয়ে আমাকে ঠাট্টা করছে এটা ভেবে আমার অসহ্য লাগছিল, বিশেষ করে যখন ওর ওপর আমার এতটুকু দুর্বলতা ছিল না।

আমি ওর উপস্থিতিতে আনন্দ পেতাম নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। বিভিন্ন ব্যাপারে ও আমার ভুল ধরার চেষ্টা করতো, আমায় বিচিত্র হাস্যকর জীব রূপে প্রতিপন্ন করতে চাইতো। এই সব ছেলেমানুষীর জন্য ওর উপস্থিতির অন্যরকম কোনো গুরুত্ব আমার কাছে ছিল না। আমিই ছিলাম প্রথম যুবক যাকে মৈত্রেয়ী অত কাছ থেকে দেখার, চেনার সুযোগ পেয়েছিল। আমাকে মোহিত করার জন্য ওর চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। এই শেষের ব্যাপারটাই আমাকে মজা দিতো খুব। আমি জানতাম এই খেলার ব্যাপারটা খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বেশি দূর গড়ানো থেকে নিজেকে বিরত রাখার, ঊর্ধ্বে রাখার প্রতিরোধ ক্ষমতা আমার আছে। সমকালীন ডায়েরির পাতাগুলো থেকে এ তথ্যই আমি পাচ্ছি যে, নিজের মানসিকতার ওপর তীক্ষ্ণ নজরও আমি রেখেছিলাম। অবশ্যই আমার নজর ছিল মৈত্রেয়ীর কলাকৌশলেরও ওপর। যেদিন থেকে ও তার প্রাথমিক ভীরুতা কাটিয়ে উঠে স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে বক্‌বক্‌ করতে আরম্ভ করলো, সেদিন থেকেই মনে হতো ও একটা নাটক করছে।

ও উঠে পড়লো। বই গুছিয়ে হাতে নিয়ে দু-গুচ্ছ ফুলের একটা গুচ্ছ টেবিলে রেখে অপরটি হাতে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। যে ফুলের গুচ্ছটা টেবিলে পড়ে ছিল, সেটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম—এটা পড়ে রইলো যে।

মৈত্রেয়ী ফিরে এসে অপর ফুলের গুচ্ছটাও হাতে নিলো এবং পড়ানোর জন্য আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে রওনা দিলো। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ও ফিরে তাকালো, ঘুরে দাঁড়িয়ে ফুলের গুচ্ছটা আমার টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিলো। অপর গুচ্ছটা নিজের মাথার চুলে পরে নিতে নিতে সে দৌড়ে পালালো। ঘরে বসে বসে শুনতে পাচ্ছিলাম সে এক সঙ্গে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ লাফ দিয়ে পার হতে হতে দোতলায় উঠে যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ লেগে গেল ঘটনাটাকে কী ভাবে গ্রহণ করবো এই ভাবতে ভাবতে। এটা কি প্রেমের প্রস্তাবনা? ডায়েরি খুলে একটা নির্বোধ মন্তব্যের সঙ্গে পুরো ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করলাম।

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে মৈত্রেয়ী জানতে চাইলো ফুলটা নিয়ে

আমি কী করলাম?

—ফুলটা রেখে দিয়েছি, শুকনো হয়, হোক।

কথাটা বানিয়ে বললাম। আমি চাইছিলাম যে, ও মনে করুক আমার হৃদয়ে প্রেমের কবিতা লেখা শুরু হয়ে গেছে। দুঃখের সঙ্গে বললো যে ওর নিজের ফুলটা দোতলায় ওঠার সময় সিঁড়িতে পড়ে গেছে।

অফিসে সারা দিন ধরে এই অভাবিত, অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক ঘটনার জের চললো। একটা আশ্চর্য স্বপ্নময় অনুভূতি আমায় ঘিরে রইলো। বাড়ি ফিরে এসে আয়নায় মুখ দেখে জীবনে প্রথম নিজেকে আরও সুন্দর দেখতে না হওয়ার জন্য দুঃখ হলো। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই আমার সেই পুরনো অনমনীয় মনোভাব ফিরে এলো এবং অভিনেতাদের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁদরামি করার জন্য প্রচণ্ড হাসি পেলো। হাসতে হাসতে আমি বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভাবতে ভালো লাগছিল যে আমার এখনও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়নি। ঠিক সেই সময় মৈত্রেয়ী বইপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—আজ আমার পড়া আছে কি?

আমি বাংলায় উত্তর দিলাম এবং আমরা বাংলাতেই কথা বলতে শুরু করলাম। বাংলা আমি তাড়াতাড়ি শিখে নিচ্ছিলাম। এর আর একটা কারণও অবশ্য ছিল। প্রতিদিন বিকেলে আমি ছবুর সঙ্গে লেখা পড়া করতাম। মৈত্রেয়ী আমায় আনুবাদের জন্য একটা বাক্য দিলো। বাক্যটা যখন লিখে দিচ্ছিলাম তখন সে জিজ্ঞাসা করলো—ফুলটা কোথায় রেখেছেন?

—শুখোবার জন্য চাপা দিয়ে রেখেছি।

—দেখি একবার।

কী উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না। কারণ আসলে ফুলটা আমি জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। আমি রহস্য মাখিয়ে বললাম—সেটা পাচ্ছি না।

—কেন, খুব গোপন জায়গায় রেখেছেন বুঝি?

মনে হচ্ছিল ধরা পড়ে গেছি। চুপ করে রইলাম যাতে ওর বিভ্রান্তি না কাটে। আমাদের লেখাপড়া শেষ হলো। মৈত্রেয়ী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠে গিয়ে বারান্দা থেকে এক গোছা ফুল তুলে নিয়ে এলাম। ফুলটাকে পাইপের গরম ছাই দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। তখন ফুলটাকে দেখে আর বোঝা যাচ্ছিল না যে সেটা সদ্য তোলা। খাবার টেবিলে

আবার দেখা ওর সঙ্গে। ওর চোখে তখন আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। অনবরত হাসছিল মৈত্রেয়ী।

—মা বলছেন আমরা না কি ছেলেমানুষী করছি।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। মিসেস সেনের দিকে তাকালাম। উনি শান্তভাবে হাসলেন। হঠাৎই আমার খুব খারাপ লাগলো। আমাদের ভাবপ্রবণ ছেলেমানুষীগুলোও উৎসাহিত করা হচ্ছে দেখে মনে হলো যেন কোনো ষড়যন্ত্র চলছে আমায় নিয়ে যাতে আমি মৈত্রেয়ীর প্রেমে পড়ি।

এখন যেন বুঝতে পারছি কেন মৈত্রেয়ীকে আমার ঘরে পড়তে পাঠানো হয়েছিল, কেন মিঃ সেন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়বার ছল করে সব সময় শোবার ঘরের দিকে রওনা দিতেন, কেন দোতালার কোনো লোক আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে নিচে নামতো না। আমার মনে হচ্ছিল, আমি তক্ষুণি ওই বাড়ি ছেড়ে পালাই।

খাবার টেবিলে আমরা তিনজন। মিঃ সেনের বন্ধুর বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। মাথা নিচু করে আমি খেয়ে যেতে থাকলাম। মৈত্রেয়ী অনর্গল বকে যেতে থাকলো। লক্ষ্য করতাম মৈত্রেয়ীর মুখ ওর বাবা বা আর কোনো অপরিচিত লোকের সামনেই শুধু বন্ধ হতো। বাড়ির আর সকলের সামনেই ও বকে যেতো। আমায় বললো—মা বলছিলেন আপনার শরীরের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলা একটু বেড়ালে ভাল হতো।

জানিনা কী নিরাসক্তি আর অবজ্ঞা নিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম ও কথার।

সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস সেন যেন সেটা বুঝতে পারলেন। তিনি বাংলায় মেয়েকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সঠিক বুঝতে পারলাম না। মৈত্রেয়ী মুখ গম্ভীর করে কী যেন উত্তর দিলো আর টেবিলের তলায় পা দিয়ে আমার পায়ের পাতায় চাপ দিলো। আমি কিছুই না দেখার না বোঝার ভান করে বসে রইলাম। কিন্তু সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল মিসেস সেনকে ক্ষুণ্ন হতে দেখে। ওঁকে আমি নিজের মায়ের মতো দেখতাম। খাওয়ার পর মৈত্রেয়ী বারান্দার শেষ অবধি আমার সঙ্গে এলো। এর আগে রাত্রে আমার শোবার ঘরের কাছে কখনও ও আসেনি।

—দয়া করে আমার ফুলটা ফেরৎ দিন।

আমি বুঝতে পারছিলাম ও অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কথা বলতে গিয়ে ইংরেজী ভুল করলো। আমি ওকে ঘরে ঢুকতে বলার সাহস পাইনি, কিন্তু ওইই চৌকাঠ পেরিয়ে প্রথম সুযোগেই ঘরে চলে এলো। আমি ওকে

শুকনো ফুলটা দেখালাম।

—এই যে ফুলটা। আমার কাছে রাখি? আমি চাই ওটা আমার কাছেই থাকুক।

হয়ত কথাগুলো ঠিক এরকমই ছিল না। রহস্যময় অস্পষ্ট এক অনুভূতি তখন আমায় আচ্ছন্ন করে ছিল। সে ফুলটা হাতে তুলে নিলো, দেখলো, তারপর দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে ফেললো। হাসতে হাসতেই বললো,

—এটা সেই ফুল নয়।

—কেন?

আমার ধরাপড়া ফ্যাঁকাশে মুখ সে বিজয়িনীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলো।

—ওটাতে আমার একটা চুল জড়ানো ছিল।

সেদিন মধ্যরাত্রিতে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পাচ্ছিলাম মৈত্রেয়ীর ঘর থেকে গুন-গুন্ করে গানের সুর ভেসে আসছে।

৬.

একদিন নরেন্দ্র সেন আমার দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে দেখি তিনি তাঁর মেয়ের সঙ্গে কোথাও বেরোচ্ছেন। মৈত্রেয়ীর পরণে ছিল তার প্রিয় কফি -সবুজ রঙের একটা শাড়ি, গায়ে মেরুণ রঙের শাল, আর সোনালী জরির কাজ করা তুর্কি চটি ছিল পায়ে। মিঃ সেন বললেন, মৈত্রেয়ী সৌন্দর্যের মূল সূত্রের ওপর বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে।

ভালোই তো—আমি প্রশংসার ভঙ্গিতে হাসলাম। মৈত্রেয়ী উদাসীনভাবে তার শাল নিয়ে পাকাচ্ছিল। ওর হাতে কাগজে পাকানো ওর বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি। ও খুব সুন্দর করে চুল বেঁধে ছিল। কেওড়া আতরের প্রচণ্ড উগ্র সুগন্ধ ব্যবহার করেছিল। সেই গন্ধে আমার সারা ঘর ভরে গেল। আমি ওকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালাম, বললাম, ও যেন একদম ঘাবড়িয়ে না যায়। নরেন্দ্র সেন একটু গর্ব করেই বললেন,—ও এই প্রথম বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে না। দুঃখের বিষয় তুমি ভালো বাংলা জানো না, নইলে তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারতে .....।

আমি একটু চুপসে গিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। অনেক তোড়জোড় করে একটু পড়া শুরু করলাম। কি রকম একটা অস্থিরতা আমায় গ্রাস করছিল। মৈত্রেয়ীর রূপই আমাকে আবিষ্ট করে তুলছিল। কোনোদিন ভাবতেও পারিনি ওই বাচ্চা মেয়েটা আমাকে এই রকম অস্থিরতার মধ্যে ফেলতে পারে। বার বার বিড়বিড় করছিলাম নিজের মনে 'সৌন্দর্যের মূল সূত্র', 'মূল উপাদান'। তারপরে নিজের মনেই ভাবলাম, ব্যাপারটা নিয়ে আমি কি খুবই বাড়াবাড়ি করছি না?

ঘন্টা দুয়েক কেটে যাবার পর বাইরে তাদের গাড়ি থামবার আওয়াজ পাওয়া গেলে মৈত্রেয়ীকে অভিনন্দন জানাবো বলে আমি এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় চলে এলাম। মৈত্রেয়ীকে কেমন যেন একটা বিষণ্ন মনে হলো।

—কেমন হলো বক্তৃতা?

—সবাই ঠিক বুঝতে পারেনি। আসলে ব্যাপারটা নিয়ে ও এত গভীর ভাবে ভেবেছে যে...। সৃষ্টির অনুভূতি, সৌন্দর্যের গভীরে প্রবেশ, এসব তত্ত্বকথা সাধারণ মানের শ্রোতারা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারেনি।

আমার মনে হচ্ছিল, মৈত্রেয়ী বোধহয় একটু দাঁড়াতে চায়। আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়। কিন্তু দেখা গেল সে কোনো কথা না বলে সোজা দোতলায় উঠে গেল। ওর শোবার ঘরের জানালা বন্ধ করার শব্দ শুনতে

পেলাম। আমি আর আমার ঘরে থাকতে পারলাম না। পার্ক থেকে একটু ঘুরে আসবো ভেবে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। হঠাৎই দোতলার বারান্দা থেকে আমাকে উদ্দেশ-করা তার ডাক শুনলাম—কোথায় যাচ্ছেন?

মৈত্রেয়ী বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। পরণে বাড়িতে পরার ধবধবে পরিষ্কার সাদা শাড়ি, কাঁধের ওপর খোলা চুল, নগ্ন বাহুলতা। উত্তর দিলাম, একটু বেরোচ্ছি, তামাক কিনে ফিরবো।

—কেন? কোনো চাকরকে দিয়ে আনিয়ে নিন না?

—আর আমি? আমি কি করবো?

—আপনি যদি চান তো ওপরে চলে আসুন। আমরা দুজনে গল্প করবো, আমার ঘরে বসে।

এই অতর্কিত আহ্বান আমাকে উদ্বেলিত করলো। আমি স্বচ্ছন্দে সব ঘরেই যাতায়াত করতাম, কিন্তু কখনো মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরে ঢুকিনি। এক নিমেষে আমি ওর ঘরে পৌঁছে গেলাম। ও দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর মুখ ছিল ক্লান্ত, দৃষ্টি অনুনয়মাখানো, আর ঠোঁট দুটো ছিল অসম্ভব লাল। পরে জেনেছিলাম, বাঙালী মেয়েরা তাদের সৌন্দর্যচর্চার রীতি হিসেবেই, কোথাও বাইরে যাবার আগে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে নেয়।

—দয়া করে জুতো খুলে ঢুকুন।

ঘরের সংলগ্ন বারান্দার কাছে নিচু মোড়ার ওপর সে আমায় বসতে বললো। ঘরটা আয়তনে আমার ঘরের মতই বড়। সংলগ্ন ঘেরা বারান্দায় একটা লেখার টেবিল। ঘরে একটা খাট, একটা চেয়ার আর দুটো মোড়া ছিল। দেওয়ালে কোনো ছবি নেই, কোনো আলমারী বা আয়নাও ছিল না ঘরে।

—এই খাটে ছবু শোয়।

—আর তুমি?

—ঐ মাদুরে।

খাটের তলায় গুটানো একটা পাতলা মাদুর ও আমায় দেখালো। আমি অবাক হয়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে ওকে আমার মানুষ নয়, দেবী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোনো সন্ন্যাসিনীর সামনে বসে রয়েছি। হাসতে হাসতে ও বললো—প্রায়ই ওই বারান্দায় গিয়ে শুই। দারুণ হাওয়া দেয় আর নিচের রাস্তার আওয়াজ শোনা যায়।

বাড়ির সামনের রাস্তাটা এমনই যে, ওখান দিয়ে রাত আটটার পর লোক চলাচল করে না। সেটাকে ঠিক রাস্তাও বলা চলে না, বরং পার্কের একটা

কোণের দিক বললে ঠিক বলা হয়।

—ওই রাস্তার আওয়াজ শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। কোথায় গেছে ওই রাস্তাটা কে জানে।

আমি মজা করে বললাম—ক্লাইভ স্ট্রীটে।

—আর ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে?

—গঙ্গায়।

—তারপর?

—তারপর সমুদ্রে।

ও যেন একটু শিউরে উঠলো। আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো—আমি যখন ছোট ছিলাম, ছবুর চাইতেও ছোট, তখন আমরা প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে পুরী যেতাম। ওখানে আমার ঠাকুরদার একটা হোটেল ছিল। পুরীর সমুদ্রের মতো বড় বড় ঢেউ আর কোথাও নেই। এই বাড়ির মত উঁচু উঁচু ঢেউ।

আমি কল্পনা করছিলাম দৈত্যের মতো সেই বিশাল বিশাল ঢেউয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মৈত্রেয়ী যেন সৌন্দর্যের মূল সূত্র সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছে। আমি হাসি চাপতে পারলাম না।

—হাসছেন কেন?

—বাড়ির মত বড় ঢেউ? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

—এই জন্য? আমার ঠাকুরদা হলে আরও বাড়িয়ে বলতেন। জানেন, ওঁর এগারটা সন্তান ছিল!

আমার দিক থেকে ও মুখ ঘুরিয়ে নিলো। ওকে কোনোভাবে কোনো আঘাত দিয়ে ফেলেছি নাকি? এটা ভেবে নিয়ে আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইলাম।

—প্রয়োজন নেই। প্রথমবারেই আপনি এত ঘটা করে ক্ষমা চেয়ে রেখেছেন যে, নতুন করে আর ওর প্রয়োজন নেই। নিজের ওপর ভরসা নেই নাকি? আচ্ছা, আপনার সুইনবার্নকে কেমন লাগে?

আমি তার অনর্গল কথা বলার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। উত্তরে বললাম, সুইনবার্ন পড়তে আমার ভালো লাগতো এক কালে।

টেবিলের ওপর থেকে একটা পুরনো বই নিয়ে এলো ও। পেনসিলে দাগ দেওয়া Anactoria-র একটি অংশ দেখালো আমায়। আমি জোরে জোরে সেই অংশটা পাঠ করলাম। কবিতাটির কয়েক লাইন পড়ার পর আমার হাত থেকে বইটা ও কেড়ে নিলো।

—সম্ভবত সুইনবার্নকে বাদ দিয়ে অন্য কবিদের ভালো লাগবে আপনার।

লজ্জিত হয়ে স্বীকার করলাম এবং আমার পছন্দে গুরুত্ব দেবার জন্য বললাম, সমস্ত Neo-romantic কবিতা পল ভ্যালেরির যে-কোনো একটা সাধারণ কবিতার কাছে তুচ্ছ।

ও খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল, আর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু যেই দেখলো আমি দার্শনিক কবিতার সমালোচনা করছি, আর যে-সমস্ত কবিতা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে চলেছে, সেগুলো দুটো পৃথক্ ভাষারও বটে, তখন ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো—আপনি চা খাবেন?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই করিডর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নিচে রান্না ঘরে কিছু নির্দেশ পাঠালো।

—আশা করি আমার প্যাণ্টের ওপর চা ওল্টাবে না। যে দশা করে ছিলে গত বছর লুসিয়্যাঁর।

আমার মনে হয়েছিল, কথাটা শুনে ও হেসে উঠবে এখুনি। কিন্তু তা না করে ও বাংলায় বিস্ময়সূচক কোনো শব্দ উচ্চারণ করে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর পায়ের শব্দ থেকে বুঝতে পারছিলাম ও তার বাবার অফিস ঘরে গেছে। কয়েকমুহূর্ত পরে আবার তেমনি করে ছুটতে ছুটতে ও ফিরে এলো। হাতে দুখানা বই।

—এ দুটো আজ সকালেই ফ্রান্স থেকে এসেছে। সারা দিন আমার বক্তৃতা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে ভুলেই গিয়েছিলাম।

বই দুটো ছিল লুসিয়্যাঁর 'L' Inde avec les Anglais-এর দুটো কপি। কাকে পাঠিয়েছে কিছুই লেখা ছিল না।

—একটা বই আপনার।—মৈত্রেয়ী আমায় বললো।

আমি বললাম, এখন আমরা দুজন কী করবো আন্দাজ করতে পারছো? আমার বইটা আমি তোমাকে উপহার দেবো আর তোমারটা তুমি আমায় দেবে।

মৈত্রেয়ী আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। সে ধৈর্য রাখতে পারছিল না। দৌড়ে কালি কলম আনতে ছুটলো। আমি কী লিখছি দেখার আগ্রহ তার চোখে-মুখে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। আমি লিখলাম 'আমার বান্ধবী মৈত্রেয়ী দেবীকে, একজন ছাত্র ও শিক্ষক'। আমার লেখা দেখে সে আদৌ সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তার হাতের বইটাতে সে লিখলো, 'আমার বন্ধুকে'।

—যদি এই বইটা কেউ চুরি করে নেয় তখন?

—কী আসে যায়? সেই চোর হয়ত পরে আমার বন্ধুও হতে পারে।

হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে সে বসলো মাদুরে। বসে বসে আমার চা খাওয়া দেখতো থাকলো।

ক্রমশ রাত হয়ে এলো। রাস্তার গ্যাসের আলোয় তালগাছের নীল-নীল ছায়া ঘরের মধ্যে পড়েছিল। মনে মনে ভাবছিলাম বাড়ির অন্য বাসিন্দারা সব গেল কোথায়? কারো কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। এটা কি ষড়যন্ত্র? মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরে আমাদের একদম একলা ছেড়ে দেওয়া? ঘরে আলো বলতে রাস্তার আলো যেটুকু এসে পড়েছে।

—আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম—খুব মিষ্টি গলায় বললো ও।

—আজ থেকে কেন? আমরা তো অনেক দিন আগে থেকেই বন্ধু হয়েছি। সে বললো, যদি আমরা বন্ধু হয়ে থাকি, নিশ্চয় ও আমাকে ওর দুঃখের কথা জানাতে পারবে। আমি ওর সব কিছুই আমাকে বলতে বললাম। কিন্তু মৈত্রেয়ী চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো। আমিও নীরবে ওকে দেখতে লাগলাম।

—আজকের কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথ আসেননি।

কথাটা শুনে একটু খারাপ লাগলো। বোধ হয় আমার পৌরুষেও আঘাত লাগলো। ইচ্ছে করছিল ওর একটু বিরক্তি উৎপাদন করে ওকে রাগিয়ে দিতে। বলতে ইচ্ছে করছিল আমাকে ....বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা ওর উচিত হয়নি।

রাগাবার জন্যই বললাম—তুমি রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসো?

হঠাৎই মৈত্রেয়ী কী রকম যেন পাল্টে গেল। আমার দিকে ফিরে তিক্ত কণ্ঠে বললো, আপনি তো অন্ধকারে যুবতী মেয়েদের সঙ্গে একলা বসে থাকতে ভালবাসেন, তাই না?

—এ রকম একলা বসে থাকার ঘটনা এই প্রথম ঘটলো, কিছু না ভেবেই আমি উত্তর দিলাম। হঠাৎই সে খুব ক্লান্তির ভঙ্গিতে পা ছড়িয়ে বসলো। বললো, আমার এ সব ভালো লাগছে না। আমি এখন একটু একলা থাকতে চাই।

কোনো কথা না বলে আমি নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে জুতো পরলাম। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল।

নিচের সমস্ত আলোগুলো জ্বালা হয়ে গিয়েছে তখন। সেই সময়কার ডায়েরির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

"ওকে যে আমার প্রত্যেক দিনই সুন্দর লাগে তা নয়। ওর সৌন্দর্য ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের মত। ওর মুখ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। ভাষার যাদুতে ও মুগ্ধ হয় সবচেয়ে বেশি। মনে পড়ে কতদিন সারারাত্রি ওর কথা ভেবেছি। একটা ছায়াচিত্রের মতো নীল রেশমের শাড়িতে মোড়া ওর শরীর। ওর মাথায় একরাশ চুল। পারস্যবাসীরা সাহিত্যে মেয়েদের মাথার চুলের সঙ্গে সাপের তুলনা করে কেন?

আমি জানি না কি ঘটতে যাচ্ছে। আমি কি ভুলে যাবো আমার অস্তিত্ব। হে ভগবান কবে শান্তি পাবো?

ছবু একটা গল্প লিখেছে। মৈত্রেয়ী ছাদে বসে সেটা অনুবাদ করে আমায় শোনালো। গল্প বলতে বলতে ও খুব হাসছিল। গল্পটা এই রকম ঃ এক রাজার একটা ছেলে ছিল। তার নাম ছিল ফুল। একদিন ফুল ঘোড়ায় চেপে অরণ্যে প্রবেশ করলো। যেই সে বনে এলো, অমনি সেখানকার সব কিছু ফুলে পরিণত হলো। শুধু রাজপুত্র আর তার ঘোড়া যেমন ছিল তেমনই রইলো। প্রাসাদে ফিরে সে তার বাবাকে এই আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করলো। রাজা এই ঘটনা বিশ্বাস করলেন না। রাজপুত্রকে মিথ্যা কথা বলার জন্য প্রচণ্ড বকলেন। তিনি রাজপণ্ডিতদের বললেন শাস্ত্রে মিথ্যা কথা বললে কী হয় সে কথা পড়ে শোনাতে আর মিথ্যা কথা বললে কী শাস্তি হয় সে সবের কিংবদন্তী শোনাতে। রাজপুত্র দৃঢ়তার সঙ্গে বললো যে সে সত্যি কথাই বলছে। রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজপুত্রের কথা যাচাই করার জন্য সেই অরণ্যে গেলেন। সেখানে যাওয়া মাত্র সকলেই ফুল হয়ে গেল। একটা দিন কেটে গেল। তারপর রাজপুত্র সমস্ত শাস্ত্রের বই এনে তার পাতা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে উড়িয়ে দিতে লাগলো। সেই টুকরো পাতার স্পর্শে রাজা এবং তাঁর সৈন্যদল আবার বেঁচে উঠলো।

নরেন্দ্র সেনের চরিত্রের খারাপ দিকগুলো হলো তিনি অকারণ গর্বে অহঙ্কারী। নিজেকে উনি প্রতিভাবান বলে মনে করেন। সে দিন রাত্রে ছাদে গিয়ে এক পাশে আমায় ডেকে নিয়ে প্যারিসের বারবণিতাদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে চাইলেন। শুনলাম তিনি রক্তচাপ আর চোখের চিকিৎসার জন্য ফ্রান্সে যাচ্ছেন কয়েক মাসের জন্য।

মিঃ সেনের মামাতো ভাই মন্টু দিল্লী থেকে এখানে এসেছে। ওখানে সে ছিল একটা সেকেণ্ডারি স্কুলের শিক্ষক। এখানে গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল স্কুলে লেকচারারের একটা চাকরি পেয়েছে। ছোটোখাটো রোগা ছেলেটির বয়স

আন্দাজ তিরিশ হবে। সে থাকে আমার পাশের ঘরটায়। দেখতে দেখতে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। সে বললো ইচ্ছে করেই সে কলকাতায় চাকরি নিয়েছে বিয়ে করার জন্য। তার নিজের বিয়ের ইচ্ছে নেই, কিন্তু মিঃ সেন নাছোড়বান্দা। মন্টুর খুব ভয়ও করছে বিয়ের ব্যাপারে। চোখ বন্ধ করে সে ইংরেজী বলে আর খুব হাসতে পারে।

চারদিন ধরে মন্টুর বিয়ের উৎসব আজ শেষ হলো। কনের নাম লীলু। (কালো কালো, সাধারণ দেখতে একটা মেয়ে, কিন্তু মনে হয় খুব সহানুভূতিশীলা হবে)। কনের বাড়িতে আর এখানে বিরাট ভোজ হলো। বাস্তবিকই, যাবতীয় আয়োজন মিঃ সেনই করলেন। আমার কাছে তিনি আবার অভিযোগও করলেন যে মন্টু বড়ো অস্থিরমতি, যে-কোনো সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেয়, ইত্যাদি। মন্টু তাঁকে এতো ভক্তি করে যে সে তার নববিবাহিত বধূর কৌমার্যও দান করতে প্রস্তুত। শুনে অবাক হলাম। ভারতে নাকি এরকম প্রথা এখনও কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে যে শিষ্য তার বিয়ের প্রথম রাতটা গুরুকে নিবেদন করে। মন্টু আমাকে বহুবার বলেছে যে মিঃ সেন তার শুধু মামাতো পিসতুতো দাদাই নন, তিনি ওর গুরুও।

আমি দু'জায়গাতেই গিয়েছিলাম। দু-জায়গাতেই প্রথম সারিতে আমায় জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। রেশমের ভারতীয় পোশাক পরেছিলাম। আমায় চমৎকার দেখাচ্ছিল একথা বলতেই হবে। অনুষ্ঠানে নিজে থেকে আমার উদ্যোগ, পরিশ্রম আর সবার সঙ্গে বাংলায় কথা বলার চেষ্টার জন্যে আমি সবারই প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, এখানকার সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান আমাকে মোহিত করেছে। কোনো কিছুতেই ভারতীয়দের বন্ধুত্বের প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। মিসেস সেনের স্নেহ, মায়া, মমতা এত প্রগাঢ় আর এত পবিত্র যে তার তুলনা হয় না। সবাই ওঁকে মা সম্বোধন করে কথা বলছিল। আমি নিঃসন্দেহ যে, ভারতবর্ষ ছাড়া মাতৃহৃদয়ের এই তীব্র আবেগ আর কোথাও নেই।

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে এই রকম একটি কল্পনা আমায় ভীষণ আনন্দ দিতো। যতদিন উৎসব চলছিল, আমি সর্বদা ওর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতাম। বাগ্‌দত্তা.... প্রেমিকা। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কখনো আমি মোহে অভিভূত হইনি বা আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম, ওকে যতটা সুন্দরী ভাবছি আসলে ও অতটা সুন্দরী নয়। ওর কোমর শরীরের তুলনায় বেশি ভারী ইত্যাদি খুঁত ধরে নিজেকে ওর চিন্তা

থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এইভাবে যে আরও বেশি করে ওর চিন্তায় ডুবে যাচ্ছি, সে কথা সবসময় স্মরণে থাকতো না।

ও-বাড়িতে আমাকে নিয়ে যে-সমস্ত বক্রোক্তি করতো তা আমার কানে আসছিল, সেগুলো ঠাট্টা না সত্যি বুঝতে পারছিলাম না ; একটা প্রায় অসম্ভব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিবাহের প্রস্তাব। প্রস্তাবটা মিঃ সেনেরই এবং একদিন খাবার টেবিলে শুনলাম মিসেস সেনও সমর্থন করেছেন। এটাকে ষড়যন্ত্র বলা যাবে কি? বিয়েকে এঁরা পবিত্র, সামাজিক, ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। আমাকেও এঁরা আন্তরিকভাবে গভীর স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। মৈত্রেয়ীও এখন উচ্চ বাঙালী সমাজে যথেষ্ট পরিচিতা। অনায়াসে আমার চাইতে অনেক ভালো স্বামী সে পেতে পারে।

মৈত্রেয়ীকে বিয়ে করলে আমার কি হবে? এটা কি সম্ভব যে আমি আমার বিবেচনাবোধ, স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি সব হারাবো এবং ফাঁদে পড়ে সম্মতি জানাবো? সন্দেহ নেই এযাবৎ যে কজন যুবতীকে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী সব দিক থেকেই আকর্ষণীয়া কিন্তু এটাও স্থির নিশ্চিত যে আমি ওকে বিয়ে করতে পারি না।

তাহলে কী করবো আমি? বিয়ে করে এক পরাধীন জীবনযাপন করবো এরপর? জীবন স্থির হয়ে যাবে এক বৃত্তের মধ্যে। আমার যথেচ্ছ দেশভ্রমণ...বাকি আর সব!

এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। এক স্বপ্নের রাজ্যে কিছুক্ষণ বিচরণ করছি। গতরাত্রে বাসর ঘরে যুবতী মেয়েরা গান গাইছিল। ফুলে ফুলে ঢাকা সেই ঘর। মৈত্রেয়ী এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত তার কবিতা পাঠ করলো।

এখানে যে কথা বলবো, অর্থাৎ যে মানসিক অবস্থার কথা বলবো, সেই অবস্থা আমাকে মারাত্মকভাবে বিব্রত করছিল। যদি কোনোভাবে বুঝতে পারতাম বা সন্দেহ করতাম যে লোকে আমার সম্ভাব্য বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে, সঙ্গে সঙ্গেই এক পাশবিক আবেগে আমি মথিত হতাম। ইন্দ্রিয়গুলো শরীর মন উভয়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতো। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয় করছে। বিপদও কি আমাকে উদ্বিগ্ন করছে? আমি বিয়ে করবো না এটা স্পষ্ট করে বলতে আমার সাহস হচ্ছে না ; আবার এ জায়গা ছেড়ে চলেও যেতে পারছি না, সেটা অশালীনতা হবে বলে।

একটা নৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলার চেষ্টা করছি, যদিও আমার রিপু

আমায় উত্তেজিত করছে।

আজ মণ্টু মেয়ে-মহলে আমার কথা ফাঁস করে দিয়েছে। আমি ওকে বিশ্বাস করে বলেছিলাম যে আমি বিয়ে করতে চাই না, আর কোনোদিন বিয়ে করবোও না। মনে হলো একথা শুনে মৈত্রেয়ী রেগে গেছে, আর এক অদ্ভুত ক্ষোভের দৃষ্টি নিয়ে আমায় দেখছে। আমার কাছে আর পড়তে আসছে না। কাজ থেকে আমি ফিরে আসার পর রোজ যেমন আমার সঙ্গে গল্প করতো তাও বন্ধ করে দিয়েছে। মিসেস সেনও কেমন যেন হয়ে গেছেন! আমার প্রতি যে উষ্ণ স্নেহ ওঁর ছিল তাতে যেন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। ওদের এই হঠাৎ পরিবর্তন আমাকে অস্থির করে তুলছে।

আজ বিকেলে যখন ঘরে বসে লিখছি, তখন মৈত্রেয়ীর প্রচণ্ড হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। খোকার কোনো ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে বোধহয় সে হাসছে। আমার প্রচণ্ড ঈর্ষা হলো। খোকা মৈত্রেয়ীদের একজন গরীব আত্মীয়। এই যুবকটি মণ্টুর বিয়ে উপলক্ষে ভবানীপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে তার ভূমিকা ছিল প্রায় বাড়ির জঞ্জালের মতো। বারান্দার সামনের দিকে একটা ঘরে সে থাকতো। ওর সঙ্গে হাসাহাসির শব্দে ঈর্ষায়, রাগে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার লজ্জাও হলো নিজের অবস্থা উপলব্ধি করে।

মৈত্রেয়ী আমার মধ্যে কোনো স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে পারেনি একথা সত্য। অন্য দিকে তার বাড়ির লোকজনদের স্নেহ-ভালোবাসাও আমি উপলব্ধি করেছিলাম। ভয় আমার হয়েছিল যখন বিয়ের ফাঁদ পাতার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম, আর আজ যখন আমি ঘোষণা করে দিলাম যে আমি বিয়ে করবো না অবিবাহিত থাকবো, তখন অবস্থাটা আর আগের মতো রইলো না। কিন্তু এবার মৈত্রেয়ীর নিস্পৃহতা আর অবহেলা আমার মধ্যে ভালোবাসা জাগিয়ে তুললো। আজ আমি ঈর্ষাপরায়ণ আবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সন্ত্রস্ত, ভীত। আমার একাকীত্ব আমায় কষ্ট দিচ্ছে।

কী অদ্ভুত পরিবর্তন! এখন আমি খেতে বসি মণ্টু আর মিঃ সেনের সঙ্গে। মেয়েরা পরে খায়। মৈত্রেয়ীর অভাবে খাবার টেবিল থেকে সব আনন্দই চলে গেছে। অফিসের কাজ পরিদর্শনের জন্য দক্ষিণ বঙ্গে চলে যেতে চাইলাম। ফেরার পর বাড়ি পাল্টাবার একটা অজুহাত খাড়া করবো। এখানে যা অভিজ্ঞতা হলো আমার, তার এখন চূড়ান্ত পর্যায় চলেছে। অভিজ্ঞতার পর্বটা অত্যন্ত দীর্ঘ।

দুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্রান্ত। আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। চারদিক জলে ভেসে গেছে। জলে-ডোবা রাস্তাগুলো দেখার জন্য আমি বারান্দায় গেলাম। হঠাৎ মৈত্রেয়ীকে দেখতে লাগলাম। দারুণ জমকালো পোশাক—চেরি রঙের ভেল্‌ভেট, কালো রঙের ব্রাউজ, সিল্কের। ও একই দৃশ্য দেখছিল। জানতাম ও বৃষ্টি নিয়েও কবিতা লেখে। হয়ত আজ ও আমার শোবার ঘরের ওপরে ওর শোবার ঘরে বসে একটা কবিতা লিখেই বাইরে এসেছে। খুবই নিস্পৃহ আর ঠাণ্ডা ছিল ওর চাউনি। অল্প দু একটা কথাও হলো।

এ-বাড়িতে নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। অথচ এইখানেই আমি পেয়েছিলাম সবচেয়ে বেশি স্নেহ, মায়া, মমতা! পেয়েছিলাম আন্তরিকতা, যা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী। মনে হচ্ছিল এক জমাট শীতলতা আমাকে ঘিরে ধরছে চারপাশ থেকে। আমার সব স্বতঃস্ফূর্ত ভাব চলে গেছে। খাবার টেবিলে আমি নীরব ; শোবার ঘরে নিজেকে মনে হতো অসুস্থ। মাঝে মধ্যে নিজেই এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করতাম। এক অদ্ভুত উপলব্ধিতে পৌঁছতাম যা এ যাবৎ আমি অনুভব করিনি।

গতকাল থেকে সম্পর্কটা আবার একটু ভালোর পথে। অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আমি নরেন্দ্র সেনের কাছে মণ্টুর মন্তব্যের সমালোচনা করেছিলাম। আমি ঠিক জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছিলাম। মণ্টু আমার কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল যে, আমি বিবাহ নামক প্রথাটাকেই ঘৃণা করি। তাই আমার চারপাশের লোকেরা, যাঁরা এটাকে পবিত্র এবং আবশ্যকীয় সামাজিক কর্ম বলে মনে করেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ বা এটাকে অসমর্থন না জানিয়ে থাকতে পারেননি। আমি বোঝাতে পেরেছিলাম যে মণ্টু ঠিক বলেনি। যাই হোক, আমার কথাবার্তার পরে বেশ বুঝতে পারছিলাম, যে শীতলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকখানিই কেটে গেল।

গতকাল আমি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বললাম স্বাভাবিকভাবে। অনেক দিন বাদে আমরা হাসলাম। লাইব্রেরিতে আজ অনেকক্ষণ গল্প করলাম দুজনে। কার্পেটে বসে 'শকুন্তলা' পড়া হলো। ওর গৃহশিক্ষক এসেছিলেন, আর আমি আগে থেকেই পড়ার সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি চেয়ে রেখেছিলাম।

রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে ও একটা কবিতা আবৃত্তি করলো। তারপর নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল। যাবার আগে বিষণ্ণ সুরে বলে গেল, কবিতাই হচ্ছে তার জীবনের শেষ কথা।

আমি কি মৈত্রেয়ীকে ভালবাসি?

পরবর্তী মাসগুলোর ডায়েরির সংক্ষিপ্তসার ঃ—

আমরা দুজনে পৌরুষ নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

আলোচ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান, পাণিণি এবং অন্যান্যরা। মৈত্রেয়ীর পড়াশোনা বিশেষ ছিল না, কিন্তু ওর আগ্রহ এবং মনোযোগ সে অভাব পুরণ করে দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম আমাকে ওর ভাল লাগে। একথা ও স্বীকারও করে ছিল। ও বললো ও আত্মসমর্পণ করতে চায় কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আঁকা কোনো নায়িকার মতো সমুদ্র সৈকতে, প্রচণ্ড ঝড়ের প্রারম্ভে। ... সাহিত্য!

মৈত্রেয়ীর প্রতি আমার আসক্তি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল। গ্রাম্য কবিতার মতো সরলতা, সহযোগীর আন্তরিকতা এবং এও স্বীকার্য যে এক শারীরিক টানেরও সংমিশ্রণ ছিল সেটা। কার্পেটে বসে পড়াশোনা করার সময় কখনো কখনো ওর আলতো স্পর্শই আমাকে ভীষণ বিচলিত করতো। অনুভব করতে পারতাম ওর মধ্যেও এক চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ছে। সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে অনেক কথাই বলতে পারতাম। সাহিত্য সাহায্য করছিল আমাদের মনের ভাবপ্রকাশে, সরাসরি কোনো কথা না বলেই। কখনো কখনো মনে হতো আমরা দুজনেই পরস্পরকে চাই!

পরবর্তী সময়ে যুক্ত টিকা ঃ

আমার ধারণা ঠিক নয়। মনে হচ্ছে মৈত্রেয়ীর প্রেমের গভীরতা সম্পর্কে কেনো ধারণাই নেই। খেলার ছলে, মেলামেশার অবাধ স্বাধীনতায় ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দেহজ প্রেম সম্পর্কে ওর কোনো ধারণাই ছিল না।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় ঃ—

সেদিনটা ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি এগারোটা অবধি আমি মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরে। আমরা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' থেকে কিছু অনুবাদ করছিলাম এবং কাব্য আলোচনা করছিলাম। রাত্রিতে মিঃ সেন একটা ডিনার পার্টি থেকে ফিরে হঠাৎই আমাদের এ ঘরে এলেন। আমি শান্ত ভাবেই কথা বলতে থাকলাম কিন্তু মৈত্রেয়ীর মুখ চোখ পাল্টে গেল। সে আমার হাত থেকে বইটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে মুখের সামনে খুলে ধরলো।

—আমরা বাংলা পড়ছি...

আমি অবাক হলাম।

এই ভাবেই কি ওর মিথ্যা বলা শুরু হয়েছিল?

পরবর্তীকালে যুক্ত টীকা ঃ

না। আমি বোধ হয় ওকে ভুল বুঝেছি। ও মিথ্যা বলেনি। বলাকা অনুবাদের জন্য আমি ওর ঘরে রয়ে গেছি একথা সে অন্য কেউ হলে হয়ত অনায়াসেই বলতে পারতো কিন্তু হঠাৎ বাবাকে দেখে কী করবে, কী বলবে বুঝতে না পেরে আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে নিয়েছিল।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় ঃ—

আজ আমি ওর জন্য পদ্মফুল এনে ছিলাম। তোড়াটা বিরাট ছিল। তোড়াটা হাতে নিতে ওর মুখ ফুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমার হাত ধরে ও আমায় অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানালো। আমার স্থির বিশ্বাস হলো যে ও আমায় ভালোবাসে। সারাদিন ধরে ও আমার জন্য কবিতা লেখে। আমায় আবৃত্তি করে তা শোনায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ওকে ভালোবাসি না। খানিকটা বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ হয় মাত্র। ওর দেহ-মন আমাকে বিচলিত করে সত্য। ওর চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হলো ঃ আমি লীলুর সঙ্গে ওর বিষয়ে কথা বলছিলাম। লীলুকে সাবধান করে দিলাম, যে সমস্ত কথা আমায় বললো, সেগুলো যেন মন্টুকে আবার না বলে বসে।

—ও আমার কী করবে?—লীলু ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

—আমি ওসব জানি না। পারিবারিক ঝগড়া সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।

মন্টু ওকে শাস্তি দেবেই, যে ভাবেই হোক, মৈত্রেয়ী জানালো, 'যে ভাবেই হোক' শব্দগুলোর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে। ও ওদের সম্পর্কে আরও অনেক কথা বললো।

তাহলে ও জানে ওদের দাম্পত্য-জীবনের গোপন কথা। পরে ও বলেছিল যে ভালোবাসা আর আবেগপ্রবণ কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও নিজে যেন কোনো পাগলামি না করে বসে। আমাকে ও অনেক অবিশ্বাস্য গোপন কথা বলেছিল। সে সব কথা বন্ধুত্বের প্রাথমিক স্তরেই কী করে বলা সম্ভব বুঝতে পারছিলাম না।

পরবর্তীকালে সংযুক্ত টীকা ঃ—

মৈত্রেয়ী বাস্তবিকই খেলা করছে। লীলু ওকে দাম্পত্য প্রেম কাকে বলে বোঝাচ্ছিল। কতটুকু ও বুঝতে পারছিল জানি না তবে সফল দাম্পত্য প্রেমের সূত্রগুলো বলতে খুব মজা পেতো।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় ঃ—

লীলু, মন্টু, মৈত্রেয়ী আর আমি পাড়ার একটা সিনেমা হলে সিনেমা

দেখতে গিয়েছিলাম। হিমাংশু রায়ের একটা ভারতীয় ছবি দেখানো হচ্ছিল। মৈত্রেয়ী আর আমি পাশাপাশি বসে ছিলাম। কথা বলছিলাম আর হাসছিলাম আমরা। কিন্তু ছবির পরেই ও হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। অন্ধকার, বদ্ধ ঘর, ছবির বিষয়, না আমার সান্নিধ্য, কোন্‌টা যে দায়ী তা বুঝতে পারলাম না। আমি জানি যে, ও সম্পূর্ণ শুদ্ধ হলেও ভীষণ রকমের ইন্দ্রিয়পরায়ণা। আমার ভারতীয় বন্ধুরা, ভারতীয় নারীদের এই বিস্ময়কর দিক সম্পর্কে জানিয়ে ছিল। একজন অসূর্যম্পর্শা যুবতী কুমারী মেয়ে তার ফুলশয্যার রাত্রেই নিজেকে এক নিখুঁত দক্ষ প্রেমিকা এবং নিপুণ দেহশিল্পীরূপে প্রকাশ করতে পারে।

মৈত্রেয়ী ওর প্রথম প্রেমের কথা আমার কাছে প্রকাশ করলো। একটি বাঙালী যুবক, এখন সে ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করছে। এ থেকে কি এটাই বুঝবো, ও খুবই সাধারণ মাপের ভাবপ্রবণ ব্যক্তিত্ব?

পরবর্তীকালে সংযুক্ত টিকা ঃ—

ওই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ও এটাই ব্যক্ত করতে চাইছিল যে, ওই ঘটনা ছিল আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের ঘটনা, যা ও ভুলে যেতে চায়।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় ঃ—

আবার ওর জন্য ফুল এনেছিলাম। ও খুব রেগে গেছে আমার ওপর। কারণ ফুল শুধু ওর জন্যই আনি না, মিসেস সেন এবং অন্যান্যদেরও দিই। মনে হচ্ছে মণ্টু কিছু সন্দেহ করছে। যখনই আমরা নিরিবিলি দুজনে কথা বলি, অমনি মণ্টু আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। 'আমাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে' বলা সত্ত্বেও মণ্টু ওখানে থাকার জন্য জেদ করতে থাকে।

মিঃ সেন আর আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে ওঁর ফ্রান্স যাওয়া পিছিয়ে গেছে। ভাবছিলাম এটা কি আমার ভুল, না উনি সত্যিই মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছেন? ফেরবার পথে যখন গাড়িতে বসে আমি আদৌ মৈত্রেয়ীকে ভালোবাসি কি না ভাবছি, তখনও আমাদের ফুলশয্যার কল্পনা আমার সব চিন্তা-ভাবনাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। ফলে বিরক্তি আসছিল নিজের ওপরেই।

একটা কৌশল অবলম্বন করলাম। ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে চললাম। যেন আমার ভয় করছে, কী হবে; যেন আমি ওর প্রেমে পাগল এবং ভীত।

আজ সকালে ও আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রায় জোর করে আমার ঘরে এসে ছিল। একজন ভারতীয় যুবতীর এ-হেন আচরণ বোধ হয় এই প্রথম। জানি না কোথায় এর শেষ হবে! ও আমাকে বিচলিত করে, মোহগ্রস্ত করে, কিন্তু তবু ওকে আমি ভালোবাসতে পারছি না। শুধুই খেলা করে যাচ্ছি।

অদ্ভুত ওলোটপালট-করা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বেশি দূর যাওয়া আমার ভুল হয়েছে। সরলতার ভান করা আরও বেশি করে ভুল। ভেবেছিলাম ভারতীয় নারীর হৃদয় জয় করার সঠিক রাস্তাটাই ধরেছি। কিন্তু ও কেবলমাত্র এক ভারতীয় নারীই নয়, ওর মধ্যে রয়েছে এক সহজাত বোধ আর সেটা কাজে পর্যবসিত করার ব্যাপারে ওর ছিল অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি। পুরুষ নারীর পুজো করবে এটা ও একেবারেই পছন্দ করতো না। এটাকে সে অমার্জিত এবং কুরুচির পরিচায়ক বলে মনে করতো। ভীষণ বিদ্রূপ করতো ও এ ধরনের ঘটনার কথা শুনলে। ও স্বপ্ন দেখতো একজন পুরুষের , যে নিম্নস্তরের ভাবপ্রবণতা দমন করতে সমর্থ। আমার ব্যবহার কি ওকে হতাশ করছিল...!

বাঃ বেশ ভালো। তাই যদি হয় তো আমিও আমার কৌশল পাল্টাবো। আমাদের আগের কথাবার্তাতেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে আমি খোলাখুলিই সব কথা বলতে পারি। ও কখন আসবে, আবার কখন আমার ঘরে বসে দুজনে গল্প করতে পারবো। এই সব ভেবে পাগলের মত অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। আমার ব্যবহারে ওর প্রতিক্রিয়াগুলো আমি নজর করবো। কিন্তু আমি প্রথমেই জানাবো যে ওর ভালোবাসা পাবার কোনো আগ্রহই আমার নেই। আমি জানি ও আমাকে ভালোবাসে। ও ওটা লুকোতে পারে না। আমি জানি ও ক্রমশ আমার কাছে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে! চব্বিশ ঘণ্টা যদি আমরা একলা থাকতে পারি, আমি নিঃসন্দেহ যে ও আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু হায় ভগবান, ও কেন আমায় অপমান করে! কেন ও বলে যে গতানুগতিক প্রেমকে ও ঘৃণা করে?

অন্য কোনো নারী আমাকে এতখানি বিচলিত কোনো দিন করতে পারেনি। এই গরমের মাসগুলোতে কাজের চাপের পর আমার ইন্দ্রিয়দমন আমায় পীড়া

দেয়। আবার মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা আমায় ভীষণ ভয়ও পাইয়ে দেয়। এই বিয়ে হতে চলেছে, এটা আমি জানি। প্রতিদিন এর নতুন নতুন প্রমাণ আমার কাছে এসে হাজির হয়! মিসেস সেন নিজের ছেলের মতো আমায় স্নেহ-মমতা দিয়ে আগলে রাখেন। মিঃ সেন আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন 'আমার ছেলে।'

গতকাল রাত্রিতে খাবার টেবিলে মিসেস সেন আমায় বকলেন—তাঁকে এখনও 'মাদাম' বলে সম্বোধন করার জন্য। এখনও ভারতীয় রীতি অনুযায়ী তাঁকে 'মা' বলে ডাকতে পারছি না কেন জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর সন্ন্যাসিনীর মতো প্রশান্তভাব আমাকে প্রভাবিত করে। তাঁর সরলতা আমায় মুগ্ধ করে। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

ঠাট্টা দিয়ে আমায় আক্রমণ করা হলো। মন্টু চায় আমি ওকে 'মামা' আর লীলুকে 'মামী' বলে ডাকি, যদিও লীলুর বয়স এখন সতেরোও হয়নি। খুব মজা পেলাম।

মৈত্রেয়ীকে নিয়ে সমস্যা ঃ সামান্য কারণেই আমরা রেগে যাই। এই জাতীয় ঝগড়া দিনে অন্তত দুবার হবেই। ও আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে যে সমস্ত উপায়ে, সেগুলোর সঙ্গে সহানুভূতি, মমতা ছাড়া শারীরিক ছোঁয়াও থাকে! বাকি সময় আমার কাটে কাজ নিয়ে বিরক্তিতে। মনে ভাবি একদিন আমাদের এই আবেগসর্বস্ব গোপন বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না। রাগ ভেঙে যায়, বন্ধুত্ব জোড়া দেবার জন্য আমি আবার ওকে খুঁজি। আবার কখনো-কখনো ও-ই আগে থেকে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আমাদের প্রেম-প্রেম খেলা আবার শুরু হয়। মনে হচ্ছে নিজেকে বেশি দিন আর শাসনে রাখতে পারবো না।

আজ ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার শোবার ঘরে আমরা একাই ছিলাম। ওকে একবার জড়িয়ে ধরার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। উভয়েই আমরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। অনেক কষ্টে ইচ্ছে দমন করে ওর হাতে শুধু একটা আলতো করে কামড় দিলাম। আমি নিজের কাছে নিজেই একটা ভয়ের বস্তু হয়ে উঠছি।

পরবর্তী কালে সংযুক্ত টিকা ঃ—

আমি ভুল করেছিলাম। মৈত্রেয়ী এতটুকুও উত্তেজিত হয়নি। ও আমার মনোভাব বুঝেই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ও শুধুই মজা করতে চেয়েছিল তার বেশি কিছু নয়। আমিই উল্টোপাল্টা ভেবে নিয়েছিলাম।

ডায়েরির পরবর্তী অধ্যায় ঃ

মৈত্রেয়ীর মতো এই রকম অসাধারণ মেয়ে খুব কমই হয়। বিয়ের পর কি ও আর পাঁচজনের মতো সাধারণ হয়ে পড়বে না?

একদিন বিকেলে মৈত্রেয়ী আমার ঘরে এলো। ওর গায়ে ছিল রাজপুতানার একটা পোশাক। সেই পোশাকে ওকে প্রায় নগ্ন দেখাচ্ছিল। স্বচ্ছ কাপড়ের নিচে ওর বাদামী রঙের বুকের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল। ওর গায়ের রঙের চেয়ে ওই অংশ ঈষৎ ফর্সা। আমি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল নিশ্চয় মিঃ সেন বাইরে গেছেন, আর ও এই সুযোগে ইচ্ছে করেই এইরকম উত্তেজক পোশাক পরে আমার ঘরে এসেছে। মিঃ সেন থাকলে ওই রকম পোশাক পরতে ওর সাহস হতো না।

কারণে অকারণে আমার ঘরে ও হাজির হয়। অকারণে ঝগড়ার প্ররোচনা দেয়। আবেগে ও দীপ্তিময়ী হয়ে উঠছে দিন দিন। ওর দেহ ভীষণ প্রলোভন জাগায়।

নিজের রিপু দমন করার জন্য আমি ওকে কুৎসিত, মোটা, দুর্গন্ধে ভরা মহিলা রূপে ভাবার চেষ্টা করছি। একটা অন্য ছবি ভেবে নিয়ে তার ধ্যান করতে শুরু করলাম, কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। মিছিমিছি স্নায়ু উত্তেজিত করা। কিছুই বুঝতে পারছি না ও আমায় কোথায় নিয়ে যাবে!

আজ সকালে ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হলো। আমার কতকগুলো বোকামির জন্য ও রেগে গেল এবং আমাকে ভয় দেখালো যে এক সপ্তাহ আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি জানিয়ে দিলাম ও যা খুশি করতে পারে আমার তাতে কিছুই যায়-আসে না। এই কথাগুলো বলতে পেরে আমার বেশ হাল্কা লাগছিল। এখন ভালোভাবে নিজের কাজে মন দিতে পেরেছি। লীলু দূত হয়ে এসে আমায় জানালো যে মহিলা-কবি একেবারে চুপসে গেছে। উত্তরে আমি জানালাম যে আমি একটুও রাগ করিনি, তবে মৈত্রেয়ী যা চাইছে তা চালিয়ে যেতে পারে।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে সব মেয়েরাই এক! সর্বত্র একই সুর ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, বুদ্ধিমতী, বোকা, সৎ, নষ্টচরিত্র যা কিছু হোক খাবার টেবিলে মৈত্রেয়ী আমার পাশে এসে বসলো। প্রায় একশো বছরের পুরনো একটা দারুণ জমকালো সাড়ি পরে এসেছিল ও। মৈত্রেয়ী কাঁদছিল কোনো কথা বললো না, সামান্য কিছু খেলো। 'মা' সবই বুঝতে পারলেন খাওয়ার পর আমাদের মধ্যে একটু বোঝাপড়া হলো। মৈত্রেয়ী আমাকে ভর্ৎসন করলো ওকে বিনা দোষে অভিযুক্ত করার জন্য, বিনা দোষে ওকে ভুল বোঝার জন্য। ও বললো—ও যে প্রেম, সমবেদনা ইত্যাদি বিশ্বাস করে না, একথ সত্যি নয়।

৭.

লড়াইটা চলেছিল প্রায় মিনিট পনেরো ধরে। ওর হাত দুটো আমার হাতের মধ্যে ধরে প্রচণ্ড আবেগে চেপে ধরে প্রায় গুঁড়িয়ে ফেলার জোগাড় করেছিলাম। ও যখন হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছিল, কাঁদছিল, মুখ বিকৃত করছিল, তখন ওকে অপূর্ব লাগছিল দেখতে। মনে মনে নিশ্চয়ই ও রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা করছিল সাহায্যের জন্য। কিন্তু অবশেষে ও হার স্বীকার করলো। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম ওর মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছিল। যে আনন্দ ছিল বেদনা, শারীরিক সান্নিধ্যের উষ্ণতা, আর ওর ওপরে আমার জোর খাটানোর অধিকারবোধের সংমিশ্রণ।

আমি ওকে ওর শোবার ঘরের দিকে নিয়ে গেলাম।

—উঃ!— আমার হাত দুটো একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি ওর হাত দুটো পরম স্নেহভরে তুলে নিলাম। হাত বুলিয়ে দিয়ে ওর হাত দুটো চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। ভারতে এটা একটা অচিন্তনীয় কাজ। যদি কেউ জানতে পারতো তাহলে বোধ হয় মৈত্রেয়ীকে খুন করে ফেলতো।

কিছুক্ষণ পরে ও নিঃশব্দে ঘরে এক গুচ্ছ ফুল ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

একদিন অন্যান্যদর সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে ও নিজে যেচেই আমার পাশে বসেছিল। অন্ধকার হল্-এ ও আমায় বললো যে আমাদের নিজেদের ব্যাপারে একটা আলোচনা করা দরকার। আমি ওকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম যে এখন ঐ আলোচনার সময় নয়, কারণ এখানে আমরা আনন্দ করতে এসেছি এখানে বসে ওইসব ভাবপ্রবণ আলোচনায় যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। মৈত্রেয়ীর শান্তভাব চলে গেল এবং ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু আমার মনে সে জন্য একটুও চাঞ্চল্য আমি বোধ করিনি।

সিনেমা হল্ থেকে বেরিয়েও সে একইভাবে কেঁদে চললো। আমি থাকতে না পেরে বেশ চেঁচিয়েই বললাম, কি হচ্ছে মৈত্রেয়ী!

ওই দিনই সন্ধ্যাবেলা ও আবার আমার শোবার ঘরে এসে শালে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। কেন কাঁদছে, এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। একটু পরেই অন্যান্যরা আমার ঘরে যখন উপস্থিত হলো তখন আবার হাসিতে ফেটে পড়লো।

মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আজ

দেখলাম অনেকটাই শক্ত হয়ে উঠেছে। একবার মাত্র কান্নাকাটি হলো আজ। আজ আমারই কিন্তু খারাপ লাগছিল বেশি। আজকের কথাবার্তার সময় বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। শেষকালে আমি ওকে চলে যেতে অনুরোধ করলাম। ও চলে যেতেই বিছানায় আশ্রয় নিলাম। নিজেকে ভীষণ হাস্যকর লাগছিল। আমিই ওকে কথা দিয়েছিলাম আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে। আমি কী বোকা! নিজের কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে একটার পর একটা মিথ্যা স্বীকার করে ওর চোখেই ছোট হয়ে গেছি। আমি অদ্ভুত আচরণ করেছি। ও ওর তরফে ঠিক শান্ত ব্যবহারই করেছিল। এই আবেগময় খেলার ফলে আমরা দুজনেই দুজনের কাছে ছোট হয়ে গেছি। ঠিক করলাম আমাদের এই খেলা শেষ করতে হবে। আবার আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনতেই হবে।

হায়! যতটা মনে হয় সবকিছু এত সহজ নয়। আমি ওকে ভালোবাসি, ভয়ঙ্করভাবেই ভালোবাসি। আবার ওকে ভয়ও পাই। আমার প্রতি ওর অন্যায় ও স্বীকার করলো। মেঘ কেটে গেছে।

ভয় আর আনন্দ, এ দুয়ের সংমিশ্রণে আমার মধ্যে কী যে হয়ে চলেছে! নতুন নতুন সমস্যা আর চিন্তা। ভাবপ্রবণ, আবেগহীন গভীর প্রেম কি সম্ভব? আর, আমি ভাবপ্রবণ হই বা না হই তাতেই বা কী যায়-আসে?

আমার মন কি বিষিয়ে গেছে? আমি কি নিজের খেয়ালেরই দাস হয়ে পড়ছি? সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমি ছিলাম একজন সুখী পুরুষ। আপ্লুত ছিলাম জীবনীশক্তির জোয়ারে ; আবার নতুন করে বাঁচার প্রেরণায়। আমি মৈত্রেয়ীকে বলতে প্রস্তুত ছিলাম ঃ তুমি কি আমার স্ত্রী হতে চাও? আমি এখনও ওই কথা বলতে প্রস্তুত। ওর স্বামী হতে পারলে আমি সত্যিই সুখী হবো...ও এত পবিত্র...এত শান্ত।

আজ বিকেলে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বিয়ে নিয়ে আলোচনা হলো। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম আমি ওকে বিয়ে করেছি। ও আমার স্ত্রী, আমি এই পরিবারের কর্তা! জীবন কি বিস্ময়কর! আমি তৃপ্তি চাই, আর চাই মানসিক শান্তি।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মৈত্রেয়ী জানালো যে ওর মন খুব খারাপ। রবীন্দ্রনাথ ওকে কোনো চিঠি দেননি। রবীন্দ্রনাথ ওর গুরু, বন্ধু, আদর্শ এবং ভগবান। ও বললো ওদের যোগাযোগ সবাই ভালো চোখে দেখে। একেবারে 'খাঁটি বাঙালী ভক্তি'। কিন্তু আমার কি ঈর্ষা হচ্ছে? পরোক্ষভাবে আমি ওকে অনেক

গোপন প্রেমের কথা বলেছি। ও যখন সব জানে, ঠিক করেছি ওকে বলে দেবো যে আমাদের এই প্রেমেরও কোনো পরিণতি নেই।

আমি কখনই এমন কাউকে বিয়ে করতে পারবো না যে আগে অন্য কারো সঙ্গে প্রেম করেছে।

আমার যে রাগ হয়েছে তা ও বেশ বুঝতে পেরেছে। রাতের খাওয়ার পর আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা হয়নি। এক লাইন লিখে জানিয়েছিল যে আমি ওকে অপমান করেছি। আমি কোনো উত্তর দিইনি।

অপ্রত্যাশিত ঘটনা! কখনও রাগ হয়, আবার আনন্দও হয়। প্রেম বিষের মতো! বিয়ের স্বপ্ন দেখি। আমার সন্তানদের মানসচক্ষে দেখতে পাই। সমস্ত সময় নষ্ট করছি। আমার পক্ষে বাস্তবিকই মনঃস্থির করা শক্ত। আমার আসক্তি আমি ত্যাগ করতে চাই না।

রাত্রিতে ভূমিকম্প হলো। আমার জ্বর ছাড়েনি। সকালে মৈত্রেয়ীকে একটা দামী উপহার দিলাম।

প্রচণ্ড মানসিক চাপের দিন। এইদিনের সম্পর্ক বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মৈত্রেয়ী আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চেয়েছিল। আমায় জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপারটা আমি কোথায় নিয়ে যেতে চাই। ওকে সান্ত্বনা দিতে আমি নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চললাম। ওর সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

মন্টু, খোকা, সবাই লক্ষ্য করছিল। আমি একটি কথাও বলিনি। ও যদি অপমানিত বোধ করে থাকে তার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আমার নিজের মনটাকে শক্ত করে রাখতে পেরেছি।

খোকা ঠিক সেই সময় আমার ঘরের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং সবই শুনতে পাচ্ছিল। হতাশ হবার ভঙ্গি নিয়ে মৈত্রেয়ী কাঁদছিল। একটা কাগজের ধারে লিখেছিল—ও মরতে চায়। খোকা যা শুনতে পেয়েছিল, একজন ভারতীয় নারীর পক্ষে তা ছিল যথেষ্ট অসম্মানের।

অবশেষে ও শান্ত হলো। আমার ঘর গুছিয়ে দিলো। টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুল এনে রাখলো। আমি একটাও কথা বলিনি।

অবাস্তব বিশ্বাস এবং মরীচিকার ওপর একটা কবিতার বই লিখছে মৈত্রেয়ী।

ইওরোপে যুবতীরা কি ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করে সে সম্পর্কে আজ বললাম ওকে। আমার কৌমার্য এখনও আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলো এবং তা নেই ধরে নিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। দৈহিক শুদ্ধতা নিয়ে ওর এই রহস্যজনক গোঁড়ামি দেখে বিচলিত হলাম।

সন্ধ্যাবেলা আলোচনা আবার সেই এক বিষয়েই এসে দাঁড়ালো—ওর বিয়ে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস অন্য যেখানেই ওর বিয়ে হোক না কেন ও অসুখী হবেই। আমি বললাম যে আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো বোধহয় শ্বেতকায় হয়ে জন্মানো। যদি ভারতীয় হয়ে জন্মাতাম খুব ভাল হতো। আমার এই কথায় ও খুবই বিচলিত হয়ে পড়লো। আমি ভয়ঙ্কর একটা প্রশ্ন করে বসলাম ঃ আমাদের বিয়ে হতে পারে না কেন?

ও খানিকক্ষণ প্রস্তর-মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে রইল, তারপর আমাদের কথা কেউ শুনে ফেলেছে কিনা দেখার জন্য ও ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পরে উত্তর দিলো, ভাগ্য বা বিধাতা এইভাবেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম ভাগ্য বা বিধাতা কেন, গোঁড়া কুসংস্কারই কি এর জন্য একমাত্র দায়ী নয়? ওর উত্তর ছিল, বিধাতা এইসব সংস্কারের মধ্য দিয়েই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন। আর আমার প্রেম নাকি ক্ষণিকের মোহ।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রেম, যা প্রথম আমার অসম্ভব ভাবাবেগের নিদর্শন বা শিশুসুলভ খেয়ালীপনা বলে মনে হতো, তা মৈত্রেয়ীর মনোভাবের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, টেনে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর অবধি—প্রায় আমার বুদ্ধির অতীত এক কল্পনার জগতে, যেখানে থেকে নিজেকে আমায় সুখী, পরিপূর্ণ সুখী বলে মনে হতো। জানি না কি ভাবে এর ব্যাখ্যা দেবো।

অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমি বিয়ের কথা চিন্তা করছি।

ওর দেখা পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠছে। ও সব সময়ই শোবার ঘরে। হয় লিখছে, নয় গান গাইছে। আমি লীলু মারফৎ কয়েকটা নির্দোষ প্রেমপত্র পাঠালাম, কিন্তু ও কোনো উত্তরই দিলো না। প্রথম রাত্রে খুবই কষ্ট হলো।

অনেক কিছু ভাবলাম। দ্বিতীয় দিনেও যে ভাবনা ছিল না তা নয়। তারপর এখন আর কিছুই হচ্ছে না। ভাবছি মৈত্রেয়ী ছাড়া বাঁচা এমন কিছু কঠিন নয়।

৮.

কয়েদিন পরে এক বিকেলে হঠাৎই আমার সঙ্গে হ্যারল্ডের দেখা। ওকে ওর স্বভাবের তুলনায় কম ছটফটে লাগছিল, কিন্তু চোখে সেই শয়তানির অভাব ছিল না।

—যা শুনছি সেটা কি সত্যি অ্যালেন? তুই কি মিঃ সেনের মেয়েকে বিয়ে করছিস?

আমি লজ্জার লাল হয়ে গেলাম। ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলামও। বেকায়দায় পড়লে যা আমি সচরাচর করে থাকি। হ্যারল্ড আমার ইয়ার্কিতে কোনো কানই দিলো না, বরং জানালো, সে খবরটা অফিস থেকেই পেয়েছে। একটা পিক্‌নিক করার জন্য আমার খোঁজে ও আমাদের অফিসে গিয়েছিল। ও আরও জেনে এসেছে যে, এর জন্য আমি নাকি ধর্মত্যাগ করে হিন্দু হচ্ছি। ও নিজে গীর্জায় যেতো যুবতী মেয়েদের দেখার জন্য। বিশেষ করে সুন্দরী আইরিনকে। কিন্তু আমার ব্যাপার শুনে ওর আমার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও লুকোতে পারলো না। হ্যারল্ড জানালো নরেন্দ্র সেন একটি শয়তান এবং আমাকে যাদু করা হয়েছে। আমায় উপদেশ দিলো গীর্জায় পাঁচ টাকা জমা দিয়ে আমার জন্য বিশেষ করে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে। আমি রেগে ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবো, ঠিক করলাম।

—আর সবাইকার খবর কী?

—সবাই তোর জন্য দুঃখ করে। ভবানীপুরে গিয়ে তুই বিস্তর পয়সা জমাচ্ছিস। থাকা, খাওয়ার খরচা নেই, বাইরেও বেরোস না। সারাদিন কি করিস?

—রিজিওনাল ম্যানেজারের পোস্টে অ্যাপ্লাই করবো। বাংলা না জানলে হবে না, তাই বাংলা শিখছি।

হ্যারল্ড আমার কাছে পাঁচ টাকা ধার চাইলো সন্ধ্যায় Y. M. C. A.-তে বলড্যান্সে-এ যোগ দেবার জন্য।

—তুই যাবি না?—জিজ্ঞাসা করলো হ্যারল্ড।

আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হয়নি। ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীট বা রিপন স্ট্রীটে থাকা দিনগুলোতে যে অমূল্য সময় আমি নষ্ট করেছি তা পূরণ করা আর সম্ভব নয়। আমি হ্যারল্ডকে লক্ষ্য করছিলাম। ওর কাল্‌চে মুখ, পিটপিটে চোখ, এই সেই সঙ্গী যার সঙ্গে আমি বহু সন্ধ্যা, রাত্রি নষ্ট করেছি মেয়েদের পেছনে ঘুরে। আমার বর্তমান জীবন এত শুদ্ধ আর পবিত্র যে ওকে আমার একজন

অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ও আমার বর্তমান ঠিকানা টুকে নিলো এবং কথা দিলো খুব শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা করবে—নিশ্চয়ই কিছু টাকা হাতাবার মতলবে।

বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম সমগ্র পরিবার চায়ের টেবিলে। মন্টু, মন্টুর বৌ লীলু, খোকা আর তার দুই বোন যাদের আমি কদাচিৎ দেখেছি। হ্যারল্ডের সঙ্গে আমার কথাবার্তা ওদের আমি অকপটে জানালাম, এবং এই শহরে অন্যান্য ইওরোপীয়ান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যে জীবন আমি নিজেও কাটিয়েছি, তার প্রতি আমার বিতৃষ্ণার কথাও প্রকাশ করলাম। আমার কথা শুনে ওরা মুগ্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা আমায় চোখ দিয়ে গিলছিল, আর দুর্বোধ্য কথ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে সম্ভবত আমার প্রশংসা করছিল। মন্টু তার অভ্যাসমতো চোখ বুজে আমার করমর্দন করলো। একমাত্র মিঃ সেন, উৎসাহের প্রাবল্য দেখে কিনা জানি না, তাঁর অভ্যাসমত ডিটেকটিভ উপন্যাস হাতে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

মৈত্রেয়ী, খোকা আর লীলুর সঙ্গে আমি ছাদের দিকে গেলাম। মাথায় একটা বালিশ দিয়ে কার্পেটে শুয়ে পড়লাম এবং আরামে সন্ধ্যার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার চটি আমার পায়েই ছিল। পায়ের ওপর পা শূন্যে নাড়াতে নাড়াতে একঘেয়ে লাগার জন্য আমি পাঁচিলের ওপর পা দুটো ভর দিয়ে রাখলাম। গত কয়েক মাসে আমি এদেশী ভদ্রতার রীতিনীতি অনেক শিখে ফেলেছিলাম। যেমন কারো গায়ে পা লেগে গেলে, আমাকে ঝুঁকে ডান হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে মাথায় ছোঁয়াতে হবে, এই রকম নানান কিছু। সেই জন্যই পাঁচিলে পা রাখার সময় আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। ঠিক সেই সময় আমার নজরে এলো লীলু মৈত্রেয়ীর কানে কানে কিছু বলছে। মৈত্রেয়ী আমায় বুঝিয়ে দিলো লীলু বলছে আপনার পা দুটো খুব সুন্দর। মৈত্রেয়ীর দৃষ্টিতে ঈর্ষা আর দুঃখ দুইই মিশে ছিল। লজ্জায় এবং আনন্দে আমি লাল হয়ে গেলাম। আনন্দ, কেননা আমি নিজেকে কুৎসিত মনে করতাম আর সেজন্য আমার দৈহিক রূপের কেউ একটু প্রশংসা করলেই আমি মোহিত হয়ে যেতাম। আমি উত্তরে সঠিক কী বলেছিলাম মনে নেই। তবে এটুকু মনে পড়ছে যে আমি বলতে চেয়েছিলাম, পায়ের সৌন্দর্যের কোনো গুরুত্ব আমাদের অর্থাৎ সাহেবের কাছে অন্তত কিছুই নেই, কেননা ওটা আমাদের দেশে ঢাকাই থাকে প্রায় অধিকাংশ সময়ই।

মৈত্রেয়ী শুনে খুশি হলো।

—আমাদের এখানে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। আমরা খালি পায়ে পা ঘষে দিয়ে আমাদের আদর জানাই। দেখুন, এই রকম.....

মৈত্রেয়ী শাড়ি একটু তুলে নিয়ে নগ্ন পায়ে লীলুর দিকে এগোলো। লীলু তার পায়ের পাতা দিয়ে মৈত্রেয়ীর পায়ে চাপ দিচ্ছিল আর আলতো করে বুলিয়ে দিচ্ছিলো। মৈত্রেয়ীকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা মানুষ চুম্বনে যে রকম তৃপ্তি পায় প্রায় সেই রকম আরাম উপভোগ করছে। শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পায়ের গোড়ালি দিয়ে লীলু মৈত্রেয়ীর পায়ের ডিম অবধি ঘষছিল, আবার মাঝে মাঝে জোরে চেপে ধরছিল পায়ের তলায় নিজের পায়ের পাতা, পা দিয়ে পা জড়িয়ে ধরছিল। দুটো নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই ব্যবহার আমার ভাল লাগছিল না। হিংসাও যে হচ্ছিল না তা নয়।

হঠাৎ মৈত্রেয়ী পা সরিয়ে নিয়ে খোকার কালো মোটা পায়ের ওপর রাখলো। আমি দেখলাম খোকার রোদে-পোড়া পীচে-ঝলসানো নোংরা পা অনায়াসে মৈত্রেয়ীর শরীরের মিষ্টি স্পর্শ পাচ্ছে। একটা কুকুরকে আদর করার সময় সে যেরকম করে, খোকার ভঙ্গি ছিল হুবহু সেই রকম। দুঃখের বিষয় সেই সময় মৈত্রেয়ীর মুখটা ছিল আমার দিকে পেছন করা। আমি দেখতে চাইছিলাম, ওই যুবকটির সঙ্গে শরীর সংযোগে মৈত্রেয়ীর ইন্দ্রিয় কতটুকু সুখ পাচ্ছে; কারণ ওর শরীরের শিহরণ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝেই ও প্রবল শব্দে হেসে উঠছিল ওই ইতর ক্লাউনটার ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে। ঐ হাসির মধ্যে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আত্মসমর্পণের আর দখলিকৃত হবার বাসনার নিঃশব্দ ইঙ্গিত।

অনেকবার আমি ভেবেছি শরীর দখলের এই যে পদ্ধতি এটা কি শোধরানো যায় না? রুচিপূর্ণ, সভ্য, মার্জিত এবং নিত্য নতুন! বুদ্ধি, সূক্ষ্ম চিন্তা, ভঙ্গির বিনিময়ে-প্রকাশে কি বোঝানো সম্ভব নয় আত্মসমর্পণ? সবচেয়ে পাগল করা দৈহিক মিলন তার আগে কি কোনোভাবেই সম্ভব?

সেই সন্ধ্যার পর, অনেক দিন ধরেই আমার একটা অদ্ভুত হিংসা হতো প্রত্যেকটা লোকের ওপর, যারা প্রায়ই নরেন্দ্র সেনের বাড়িতে আসতেন। সুন্দর সুন্দর যুবকেরা; কেউ কবি, কেউ গায়ক—মৈত্রেয়ী যাদের সঙ্গে গল্প করতো, হাসতো। আমি মন্টু, খোকা ওদেরও হিংসা করতাম। বিশেষ করে খোকা। যে মৈত্রেয়ীর সম্পর্কে কাকা এবং সেই সুবাদে যখন ইচ্ছে ওর হাত ধরা, কাঁধ চাপড়ানো, চুল ধরে টানবার অধিকার ভোগ করতো। ওকে আমার বাস্তবিকই একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হতো। কিন্তু মৈত্রেয়ী ছিল সম্পূর্ণ

উদাসীন। আমি অচিন্ত্যকেও হিংসা করতাম। ওই কবির সঙ্গে মৈত্রেয়ীর আলাপ হয়েছিল একবারই মাত্র, তার সঙ্গে ওর শুধু টেলিফোনেই কথাবার্তা হতো। অচিন্ত্যবাবুর পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ কবিতা পাঠাতো মৈত্রেয়ী। হিংসা করতাম এক গণিতজ্ঞকেও, যিনি খুবই কম আসতেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে মৈত্রেয়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিতো। মৈত্রেয়ী স্বীকারও করেছিল যে বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতি ওর একটা দুর্বলতা আছে। তবে সবচেয়ে হিংসা করতাম ওর ঐই গুরু, বন্ধু, পথপ্রদর্শক কবি রবীন্দ্রনাথকে। ওকে একদিন যতখানি সূক্ষ্মভাবে সম্ভব বলেও ছিলাম যে ও এইভাবে আত্মসত্তা বিকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ও এত সরলভাবে বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকালো যে আমি বাধ্য হলাম পিছিয়ে আসতে।

মৈত্রেয়ীর সঙ্গে খোকার সেই আচরণ আমাকে অনেকদিন ধরে পীড়া দিয়েছিল। সেই সন্ধ্যার কথা ভাবতাম আসন্ন সন্ধ্যার আকাশে একটা দুটো করে ফুটে ওঠা তারাগুলো দেখতে দেখতে। ওদের কথাবার্তা কথ্য বাংলায় চলার ফলে অতি সামান্যই আমি বুঝতে পারতাম। তাছাড়া মৈত্রেয়ীর হাসিই আমাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছিল। খোকার প্রতিটি মন্তব্যে ওর ওই উচ্চৈঃস্বরে হাসি আর বিচিত্র মুখভঙ্গি আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। মৈত্রেয়ী আমার মনের ভাব অনুভব করতে পেরেছিল, আর সেই জন্যই সে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি কি না, অবসর সময়ে অর্থাৎ অফিসের পরে ওর বাবার লাইব্রেরির ক্যাটালগ তৈরির কাজে ওকে সাহায্য করতে পারবো কি না, এবং সেই সুযোগে আমরা দুজনে যে আলাদা গল্প করতে পারবো, এই ইঙ্গিতও দিয়েছিল।

ঐ ক্যাটালগের ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি আগে কিছু জানতাম না। শুনেছিলাম নরেন্দ্র সেনের লাইব্রেরিতে প্রায় হাজার চারেক বই আছে। পরে শুনলাম উনি সব 'বই'-এর একটা সুশৃঙ্খল তালিকা করে ছাপিয়ে রাখতে চান, যাতে ওঁর মৃত্যুর পর উনি বইগুলো কোনো কলেজকে দান করে যেতে পারেন। তাঁর ওই পরিকল্পনা আমার হাস্যকর মনে হলেও আমি সম্মত হয়েছিলাম। ও বলেছিল,—বাবার সাহস হচ্ছে না আপনাকে অনুরোধ করতে। উনি ভয় পাচ্ছেন যে এতে আপনার সময় নষ্ট হবে। আমি একটা মেয়ে, কোথাও যাই না, বাড়িতে সামান্যই কাজ থাকে । তাই আমাকে.....

আমার মনে পড়ছে প্রথম সুযোগেই ভেবে চিন্তে মতামত না দেওয়ার জন্য নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। বুঝতে পেরেছিলাম বেশ কিছুটা সময় আমার

এখানে নষ্ট হবে। তাছাড়া ভয়ও করছিল, আবার না আমাদের সেই পুরনো খেলা শুরু হয়ে যায়।

পরের দিন চা খাবার আগে দেখি লাইব্রেরির দরজায় মৈত্রেয়ী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

—আসুন, আমি যতটুকু করতে পেরেছি আপনাকে দেখাই।

টেবিলের ওপর গোটা পঞ্চাশেক বই কাত করে সাজানো, যাতে নামগুলো সহজেই পড়া যায়।

—আপনি এই পাশ থেকে শুরু করুন, আমি উল্টো দিক থেকে শুরু করছি। দেখি কোন্ বইটাতে এসে আমরা মুখোমুখি হই।

ওকে খুব বিচলিত লাগছিল। ওর ঠোঁট কাঁপছিল, আর প্রায়ই আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি লেখবার জন্য বসলাম, কিন্তু কেবলই একটা বিপদ ঘটার পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আবার আমাদের মধ্যে পুরনো সম্পর্ক জেগে উঠতে চলেছে। চিন্তা হচ্ছিল, এইভাবে কি ওর হৃদয়ের গভীরে আলোকপাত করা সম্ভব হবে? খুব হালকাভাবেই আমি আমার এই অনুভূতির কথা ভাবছিলাম। লিখতে লিখতে নিজেকেই প্রশ্ন করছিলাম, আমি কি ওকে এখনো ভালোবাসি? বোধ হয় না, ওকে ভালোবাসার আমি অলীক কল্পনা করেছিলাম মাত্র। আবার বুঝতে পারলাম, ওর বন্য মোহিনী শক্তিই আমাকে আকর্ষণ করে। নিজের সম্পর্কে আমার পরিষ্কার ধারণা হয়েছিল যে আমি শুধুই মোহগ্রস্ত প্রেমিক নই। কিন্তু ঘটনাগুলোর প্রারম্ভে আমার চেতনা যখন স্বচ্ছ ছিল তখন আমার এই সব কিছু মনে হয়নি। মনে হয়েছিল এটাই বাস্তব।

অন্যমনস্ক হয়ে একটা বই নিতে গিয়ে হঠাৎ আমার হাত মৈত্রেয়ীর হাতের ওপর পড়লো। আমি দ্রুত হাত সরিয়ে নিলাম।

—আপনি কোন্ বই অবধি এলেন?

আমি ওকে বইটা দেখালাম। ঠিক ওই বইটার আগের বই অবধিই ও এসেছিল। বইটা ছিল Wells-এর 'Tales of the unexpected'।

ও যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হলো। বললো, দেখেছেন! নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য শক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে।

উত্তরে আমি মৃদু হাসলাম। বাস্তবিক আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই আকস্মিকতায়। টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর নামগুলো থেকে ইচ্ছে করলে অর্থ বার করা যেতেই পারে। যেমন, 'স্বপ্ন', 'আমাকে তোমার সঙ্গে নাও', 'সাহায্যার্থে', 'কিছুই নতুন নয়', ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি এমন একটা

উত্তর ভাবছিলাম যার একাধিক অর্থ হতে পারে, কিন্তু সেই সময় ছবু আমাদের চা খেতে যাবার জন্য ডাকলো। খুব ভালো লাগছিল। আমরা পরস্পরের দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম।

চা খেতে বসে আমি দারুণ উৎসাহে কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম। আমি এত আন্তরিকতার সঙ্গে চৈতন্যদেবের জীবন ও বিশ্বাস সম্পর্কে বলছিলাম যে মিসেস সেন আমার কাছে এসে বসলেন। ক্রমশ তাঁর চোখ জলে ভরে এলো।

—তোমাকে একজন প্রকৃত বৈষ্ণব মনে হচ্ছে।

এই প্রশংসায় আমার যে কী আনন্দ হলো তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। আমি উত্তর দিলাম, বৈষ্ণব ধর্মকে আমি সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি। এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিতর্ক শুরু হলো। মন্টুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করলো। মৈত্রেয়ী মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, তারপর হঠাৎ সে বলে উঠলো,—তোমরা ধর্ম সম্পর্কে কি জানো?

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল মৈত্রেয়ী। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে কী উত্তর দেবো বুঝতে পারছিলাম না। মন্টু ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। মৈত্রেয়ী দৌড়ে লাইব্রেরির দিকে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে চা শেষ করলাম।

সবাই কেমন চুপ করে গেল। আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম। কয়েকটা চিঠি লেখার ছিল, সেগুলো নিয়ে বসলাম। কিন্তু মন বসলো না। একটা অস্থিরতা আমায় কষ্ট দিচ্ছিল ; মনে হলো মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

সেদিনটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমার ডায়েরির অংশ তুলে দিলাম ঃ

আমি ওকে দেখলাম চোখের জলে বিপর্যস্ত অবস্থায়। আমি বললাম, আমাকে এখানে আসতে বলা হয়েছে বলেই এসেছি। এ কথায় ও খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। আমি পাঁচ মিনিট সময় চাইলাম যাতে আমার চিঠিটা শেষ করে আসতে পারি। ঘর থেকে ফিরে এসে দেখলাম টেবিলের সামনে একটা আরাম চেয়ারে বসে ও ঘুমচ্ছে। আমি ওকে জাগালাম, ও চোখ বড় বড় করে জেগে উঠলো। আমি ওকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকলাম। ও বেশ উপভোগ করছিল আমার দৃষ্টি। মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞাসা করছিল, কী হলো? কী হলো?

তারপরে একসময় চুপ করে আমার চোখে চোখ রেখে বসে রইলো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো, রহস্যময় এক স্নিগ্ধ, মিষ্টি শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে আমরা বসে রইলাম। সেই সময় আমার মনের মধ্যে কী হচ্ছিল তা আমার পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব। দেহ মনে এক তীব্র উত্তেজনা বোধ করছিলাম, কিন্তু তা ছিল কোনো রকম যৌন-চেতনা-বোধের ঊর্ধ্বে। এক স্বর্গীয় আনন্দের জগতে বিচরণ করছিলাম আমি। প্রথমে দৃষ্টিই যথেষ্ট ছিল, তারপরে হাতে-হাত রাখলাম আমরা। চোখের মিলনে ছেদ ঘটলো না। জোরে চেপে ধরলাম, আবার আদরে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলাম ওর দুটো হাতে। (আমি কিছু দিন আগেই প্রেম সম্পর্কে চৈতন্যদেবের ধারণা পড়েছিলাম, আর তাইই ব্যক্ত করতে চাইছিলাম)। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি ওর হাতে চুম্বন করলাম। ও আনমনে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল প্রবল উত্তেজনায়, কিন্তু তাও ছিল অতি পবিত্র। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে করছিল ওর মুখে চুম্বন করতে, কিন্তু অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সংযত রেখেছিলাম। আমাদের অবস্থানটাও খুব নিরাপদ ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে যে-কেউ আমাদের দেখতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। ওকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করে ছিলাম আমাদের মিলনে বাধা কিসের। ওর একটা শিহরণ দেখা দিলো এই প্রশ্নে। আমি ওকে রাগিয়ে দেবার জন্যে কবির শেখানো মন্ত্র দুবার উচ্চারণ করতে বললাম যাতে ওকে কোনো অশুচিতা স্পর্শ না করতে পারে। ও আমার কথা শুনলো, কিন্তু শুনে ওর কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে যা ঘটেছে তা প্রেম, দৈহিক পবিত্রতা বজায় রেখেও তা প্রেমই।

আমার স্পর্শ এবং দর্শন দিয়ে অতিপ্রাকৃত স্তরে পৌঁছনোর অভিজ্ঞতা হলো। দুঘণ্টা ধরে চলেছিল আমাদের এই অভিজ্ঞতার পর্ব। স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে-কোনো দিন, যে-কোনো সময় আমরা আবার ওই খেলায় মগ্ন হতে পারবো।

এরপর ও আমায় অনুরোধ করলো চটি খুলে ওর পায়ে পা ঠেকাবার জন্য। আমি জীবনে ভুলতে পারবো না আমার সেই প্রথম স্পর্শের অনুভূতি। এই স্পর্শ আমাকে ভুলিয়ে দিলো আমার সব হিংসা, সবার প্রতি আমার ঈর্ষা, যার জন্য এতদিন আমি ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাচ্ছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম মৈত্রেয়ী ওর পায়ের পাতা, ওর পা সমর্পণের মধ্য দিয়ে ও নিজেই আমার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। সেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম ছাদের সেই ঘটনা। মনে হলো এই প্রথম, শুধু আমাকেই ও এই সৌভাগ্য প্রদান করলো। আমি আমার পায়ের পাতা ওর হাঁটুর পেছন অবধি

তুলে দিয়ে সেই মায়াময় কোমলতা, উষ্ণতা অনুভব করলাম। মনে মনে ভাবলাম আমিই প্রথম পুরুষ যে অতখানি স্বাধীনতা ভোগ করলো। পা দিয়ে ওর পা জড়িয়ে ধরলাম। এইভাবে যে আমরা কতক্ষণ সময় কাটালাম তা বলতে পারবো না। মনে করতে পারি না সেই সময়ে আর কিছু করেছিলাম কিনা, তবে মৈত্রেয়ীর মনের স্বরূপ আমি অনুধাবন করতে পারলাম। ছ-ছটা মাস আমি অর্থহীন জেদে হারিয়ে ফেলেছি। আজ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম ও আমার সম্পূর্ণ অধিকারে।

আমি যে ওকে ভালোবাসি একথা হয়ত ওকে স্পষ্ট করে জানাইনি, কিন্তু আমার মনে হতো আমাদের দুজনের অনুভূতির কাছেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ছিল। ওর প্রত্যেকটা ভঙ্গির মধ্যেই আমি খুঁজে পেতাম সমব্যথিত্ব, সহমর্মিতা, এবং ভালোবাসার এক নিঃশব্দ বাণী। আমি বিশ্বাস করতাম না যে ও আমাকে ভালোবাসে না এবং ওর প্রতি আমার ভালোবাসায় ওর আস্থা নেই। তাই যখনই ও সামান্য অন্যরকম ব্যবহার করতো বা আমাদের মিলনের কথা বললেই মুখে হাত চাপা দিতো, কিম্বা গুরুতর অবস্থায় চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে চুপ করে থাকতো, আমি দুশ্চিন্তার শিকার হতাম। এসব সত্ত্বেও আমার মনে হতো ওর পরিবারবর্গের সঙ্গে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তায় মৈত্রেয়ীও যোগ দিতো এবং তাদের উৎসাহিত করতো।

একদিন আমি যখন বললাম যে ওকে আমি ভালোবাসি, ও তখন দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিলো। আমার কথার প্রতিক্রিয়া যে কি হলো আমি সঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি যখন উষ্ণ আন্তরিকতা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম বাংলায় কয়েকটা ভালোবাসার কথা বলার জন্য, ও উঠে পড়লো। আমাকে একজন সদ্যপরিচিতের মতো ভাব দেখিয়ে বললো—আমায় ছেড়ে দিন। আমি বুঝতে পারছি আপনি আমায় ঠিক বুঝতে পারেননি। আমি আপনাকে ভালোবাসি বন্ধুর মতো, একজন ভীষণ প্রিয় বন্ধুর মতো। আমি আপনাকে অন্যভাবে দেখতে পারি না। আর দেখতে চাইও না...

—কিন্তু মৈত্রেয়ী, এখন আর এটা নিছক বন্ধুত্ব নয়, এটা ভালোবাসা, প্রেম...

আমি হঠাৎই আমার উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে পেয়েছিলাম।

—আত্মা, মন অনেক রকম ভালোবাসার অস্তিত্ব স্বীকার করে।

—সত্যি কথা। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে আমার প্রেমিকা হিসেবে পেতে চাই। তুমিও তা জানো। আর এটা থেকে তুমি নিজেকে আড়াল

করার চেষ্টা করছো কেন? আমরা পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। এই সত্য ঢাকবার জন্য আমরা নিজেদের যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছি। আমি তোমায় ভালোবাসি মৈত্রেয়ী, আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমি কথাগুলো বলছিলাম একটা বাংলা বাক্যের সঙ্গে পাঁচটা ইংরেজী বাক্য মিশিয়ে।

—আপনার নিজের ভাষায় কথাগুলো আবার বলুন।

এলোমেলোভাবে মাথায় যে ভাবে এলো, কথাগুলো আমি ফরাসীতে আবার বললাম। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। সবে ঘরে আলো জ্বালা হয়ে গিয়েছিল। লাইব্রেরিতেও আলোর প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। বললামও সে কথা। ও উত্তর দিলো—না ছেড়ে দিন। দরকার নেই।

—কেউ এসে পড়লে? আমাদের দুজনকে যদি কেউ এভাবে অন্ধকারে দেখে, তখন?

—বয়ে গেছে আমার। আমরা ভাই-বোনের মতো রয়েছি এখানে।

আমি না বোঝার ভান করলাম। ওকে আদর করার জন্য ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটো ধরলাম। ও আমায় জিজ্ঞাসা করলো—কেন তুমি মাঝে মাঝে এইরকম অবুঝ হয়ে ওঠো?

ওর কণ্ঠস্বরে প্রশ্রয় আর হাল্কা হাসির আমেজ ছিল। আমি নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে উত্তর দিলাম—কারণ তুমি মাঝে মাঝেই এমন বোকামি করো, যার কোনো অর্থ হয় না।

মৈত্রেয়ী নিজের হাত দুটো আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শুরু করলো কাঁদতে। আর তারপরে লাইব্রেরি ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করলো। ওকে যেতে না দেবার জন্য ওর চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে খুব নিচু স্বরে ওকে আমি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। তুমি অমন করে কেঁদো না। ওকে বললাম আর ওর শরীরের স্নিগ্ধ সৌগন্ধ, কুমারী তনুর উষ্ণতায় আমার সংযম হারিয়ে যাচ্ছিল। আমি ক্রমশ ওকে আমার শরীরের সঙ্গে জোরে চেপে ধরছিলাম। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ও ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। অস্ফুট স্বরে বলছিল না না! ... ওর কথা শুনে ভয় করছিল আমার। যে-কেউ ওর কণ্ঠস্বর শুনে ফেলতে পারে এই ভয়ে আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। ও কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে গেল না। দরজার দিকে না গিয়ে ও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। রাস্তার গ্যাসপোস্টের স্বল্প আলো ওই জায়গাটায় এসে পড়েছে। ওর চোখ, এলোমেলো চুল, কামড়ে-ধরা ঠোঁট আমার শরীরে শিহরণ এনে দিচ্ছিল।

অদ্ভুত এক আতঙ্ক আর আকর্ষণ-মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল শুধু। একটা কথাও বলতে পারছিল না। আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। জড়িয়ে ধরলাম। দুহাত দিয়ে ওর মুখটা তুলে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলাম। তীব্র আবেগ আর উন্মত্ততায় দিশেহারা তখন আমি। আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম।—ভেজা ভেজা, ফুলের মতো কোমল, আর সৌগন্ধযুক্ত এই ঠোঁট আমি কোনোদিন চুম্বন করতে পারবো ভাবতেও পারিনি। প্রথমে ও ওর নিবিড় ঠোঁট দুটিকে গুটিয়ে শক্ত করে রাখছিল, কিন্তু ক্রমশ ভেঙে গেল ওর প্রতিরোধ ক্ষমতা। পরিপূর্ণ মেলে ধরলো ওর আরক্তিম অধর। তারপরে চুমু খেলো আমার ঠোঁটে। আলতো করে কামড়েও দিলো দু-একবার। ও ওর শরীরের ভার আমার শরীরে এলিয়ে দিলো। আমি ওর সুগঠিত কোমল বুকের স্পর্শ আমার শরীরে অনুভব করছিলাম। অনুভব করতে পারছিলাম ওর সমস্ত শরীরের জ্যামিতিক বিন্যাস।

জানি না কতক্ষণ আমরা এই অবস্থায় ছিলাম। একটা সময় যেন মনে হলো, মৈত্রেয়ী হাঁপাচ্ছে। আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ও একটা ভগ্নস্তূপের মতো মাটিতে পড়ে গেল। আমি ওকে টেনে তোলবার জন্য নিচু হলাম, কিন্তু ও আমার পা দুটো ছুঁয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, না-না-আমাকে তুমি—ছুঁয়ো না। বলে আমাকে আবার নিজের মায়ের নামে, মিসেস সেনের নামে শপথ করালো। আমি চুপ করে রইলাম। তারপরে ও নিজে নিজেই উঠে পড়লো। চোখের জল মুছে, চুল ঠিকঠাক করে নিলো। কিন্তু আমাকে এড়াতে পারলো কী? এক দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ও ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কী করবো। আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। ওকে আমি জয় করেছি। এই আনন্দ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে এলো অনুতাপ। এবং অনুতাপের পরে ভয়। অস্বীকার করবো না তখন এক প্রচণ্ড ভয় আমাকে বিচলিত করলো। খেতে যাওয়ার আগে অবধি কিছুই করতে পারলাম না। কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারলাম না। ভাবছিলাম খাবার টেবিলে ওর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস কি আমার হবে! এখন এই মুহূর্তে ও আমার সম্পর্কে কী ভাবছে! ভয় হচ্ছিল যদি ও ওর মার কাছে অথবা লীলুর কাছে সব বলে দেয়! আমি কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। মৈত্রেয়ী খাবার টেবিলে এলো না। খাওয়ার পর লীলু আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো,—আমাদের মহিলা কবি আপনাকে এই কাগজটা দিতে বলেছে।

আমার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এক প্রচণ্ড উত্তেজনা আর আতঙ্কে আমি যেন আমার হৃৎস্পন্দনের ধক্-ধক্ আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি কাগজটা খুললাম। যাতে কেউ না বুঝতে পারে, সেই জন্য ফরাসীতে লেখা ঃ লাইব্রেরিতে এসো সকাল ছ-টায়।

৯.

আমাকে অফিসে পৌঁছতে হতো সকাল দশটার মধ্যে। রাত আটটায় চায়ের টেবিলে হাজিরা দিতে হবে। তাই সন্ধ্যা ছটার মধ্যেই বাড়ি চলে আসার চেষ্টা করতাম, যাতে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় মৈত্রেয়ীর সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পাই। সেই রাতে আমি ভালো করে ঘুমুতে পারিনি। বার বার দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। আমি স্বপ্নে দেখছিলাম, মৈত্রেয়ীকে হারাচ্ছি আমি। দাড়িওয়ালা এক স্বর্গীয় দূত আমায় এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। নরেন্দ্র সেন নিঃশব্দে তাঁর টেরাস থেকে আমার চলে যাওয়া দেখছেন। ঘুম ভেঙে দেখি আমার কপাল ঘামে ভিজে গেছে। মনে হচ্ছিল, না-জানি কী ভীষণ পাপ আমি করে ফেলেছি!

যথা সময়ে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে দেখা হলো। ওর পরণে ছিল ধবধবে সাদা শাড়ি, গায়ে হাল্কা ধোঁয়াটে রঙের শাল। বুঝতে পারছিলাম না আমার ঠিক কী ভাবে এখন ওর সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। ওকে জড়িয়ে ধরবো, না শুধু মৃদু হাসবো অথবা কিছুই হয়নি এরকম ভান করবো? ভাবতে ভাবতে ওকে নমস্কার জানালাম। ও আমার কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করছে আন্দাজ করতে না পেরে প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি উল্টোপাল্টা অসংলগ্ন কথা বলছিলাম। মৈত্রেয়ী ছিল শান্ত, স্থির, সমাহিত। ওর চোখের নিচে কালি, অনুমান করতে পারছি, আগের রাতটা ওর কেটেছে পুজো আর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। আমি ভুল করছি না ঠিকই শুনেছিলাম মনে নেই, ও একটা প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইছিল গুন গুন করে। তারপর হঠাৎই গান থামিয়ে দিয়েছিল।

আমি ওর সামনের চেয়ারে বসে যন্ত্রচালিতের মতো বইয়ের তালিকা প্রস্তুতির কাজে লেগে গেলাম। কয়েক মিনিট পরে ওই জমাট বরফের মতো শীতল স্তব্ধতা কাটানোর জন্য আমি প্রশ্ন করলাম, কাল রাতে ঘুম হয়েছিল?

—না। একদম ঘুমুতে পারিনি।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে আবার বললো, আমি ভেবে দেখলাম এখন আপনার এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। এই জন্যই আপনাকে আমি ডেকেছি।

আমি ওর কথায় বাধা দেবার প্রয়াস করলাম। কিন্তু অনুনয়ের ভঙ্গি করে আমায় থামিয়ে দিয়ে ওর কথা বলে যেতে লাগলো। কথাও বলছে, আবার একটা কাগজ টেনে নিয়ে তাতে পেনসিল দিয়ে একবার কিছু লিখছে, আবার তারপরে তা কেটে দিয়ে হিজিবিজি ছবিও আঁকছে, যার কিছুই

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওর এই খেলা সেই প্রথম দিককার ও ফরাসী শেখার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। দুঃখে, অনুতাপে আমার মন ভেঙে যাচ্ছিল। ওর এই ধরনের মানসিক ক্ষুদ্রতা আমাকে হতবাক্ করে দিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমার যা স্থির বিশ্বাস, আমার যা স্থির ধারণা তা সব যেন ভেঙেচুরে খসে খসে পড়ছে। বাস্তবিক প্রসঙ্গান্তরে না গিয়ে একটা বিষয় নিয়ে একটানা এতক্ষণ ধরে কথা বলতে আমি কখনই ওকে দেখিনি। আমার যে কিছু বলার থাকতে পারে, এ ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই ওর কাছে যেন ছিল না। মনে হচ্ছিল, যেন ও একাই এই ঘরে বসে রয়েছে।

সুতরাং এটাই ধরে নিতে হচ্ছিল, আমার যা ধারণা ছিল যে, আমি ওকে যেভাবে ভালোবাসতাম, ও-ও আমাকে সেই একইরকম ভালোবাসে, তা সম্পূর্ণ ভুল! তেরো বছর বয়স থেকেই ওর মন-প্রাণ বাঁধা পড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের কাছে—যেদিন থেকে ওঁর সাহিত্যের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে। গতবছর ছাড়া প্রতিটি গ্রীষ্মই ও কাটিয়েছে শান্তিনিকেতনে তাঁর সমগ্র পরিবারবর্গের সঙ্গে। অনেক সন্ধ্যা-রাত্রি ও বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনে কাটিয়েছে। তিনি ওর চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। তাঁর কথা, তাঁর স্পর্শ ওকে নিয়ে যেতো এই পার্থিব জীবনের ঊর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় জগতে। প্রেম, ভক্তি নিয়ে এক আধ্যাত্মিক-উপলব্ধিতে ও মগ্ন ছিল। একদিন রবীন্দ্রনাথ ওর সঙ্গে জাগতিক প্রেম নিয়ে আলোচনা করলেন। শুনতে শুনতে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। যখন ওর জ্ঞান ফিরেছিল তখন ও নিজেকে আবিষ্কার করেছিল রবীন্দ্রনাথের পালঙ্কে। ঘরের মধ্যে ভাসছিল জুঁই ফুলের সুবাস। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ওকে দিলেন সেই মন্ত্র যা ওকে রক্ষা করবে পাপ থেকে। মনকে করবে পবিত্র, সুন্দর। তিনি ওকে বললেন সারা জীবন পবিত্র থাকতে, কবিতা লিখতে, ভালোবাসতে এবং তাঁকে ভুলে না যেতে। মৈত্রেয়ীও তাঁকে কখনো ভোলেনি, ভুলবেও না। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর লেখা ওঁর সব চিঠি একটা চন্দন কাঠের বাক্সে ও সযত্নে রেখে দিয়েছে। বাক্সটায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের একগুছ কেশও। বাক্সটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই উপহার দেওয়া।

শুনে আমার সেদিন মনে হচ্ছিল মানুষটি কী নিখুঁত অভিনেতা! তখন আমার তরুণ বয়স, সবকিছু বোঝবার বয়স আমার নয়, তাই আমি তখন হিংসা, ক্রোধ আর অক্ষম বিদ্রোহে জ্বলছিলাম। এই কি মানুষ? অতীন্দ্রিয়বাদের

মোড়কে ভোগ-বাসনা, অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে প্রতারণা! এই যুবতীর শুচিতা সম্পর্কে আমি কি আর বিশ্বাস করতে পারি? কী করে আমি বিশ্বাস করবো আমিই ওর কাছে প্রথম 'পুরুষ'? আমার প্রতীচ্য মন নিয়ে আমি সেদিন রোষে ফুলতে ফুলতে ভাবছিলাম ওর গুরু ওকে কখনও আলিঙ্গন পর্যন্ত করেননি, শুধুমাত্র চুলে হাত বুলিয়ে আদর করেই ছেড়ে দেন? অবশ্য বহুদিন ওদের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। রবীন্দ্রনাথ সারা বছরই প্রায় বাইরে ঘুরে বেড়ান। তাহলে....তাহলে? হায় আমি কী করবো? মিসেস সেন বোধহয় ওঁর মেয়ের ব্যবহারে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি আর ওকে ওর গুরুর কাছে যেতে দেননি। কিন্তু মৈত্রেয়ী ওর গুরুকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেনি। সে চাইছিল আমরা এমনই বন্ধু হই, যাতে দুজনেই অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী হয়ে একযোগে রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসতে পারি। ও বন্ধুত্বের কথা ভেবেছিল, প্রেম নয়। ভালোবাসা, কিন্তু শরীর বাদ দিয়ে। ও এই কথাগুলো বলেছিল লজ্জায় লাল হয়ে, নিচু গলায়, আর ইংরেজীতে অনেক ব্যাকরণ-ভুল করে। আমার প্রতি ওর ব্যবহারে কিন্তু আন্তরিকতা, সহানুভূতির কোনো অভাব ছিল না। আমাকে যথেষ্টই সময় দিতো। খুশি হতো, যখন চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে আমরা বসে থাকতাম। ও বলতো আমি ওকে অন্যভাবে নেওয়ার জন্য ওর নিজের ব্যবহারই দায়ী। ওরই সব কথা খুলে বলা উচিত ছিল আর এমন কিছু করা ঠিক হয়নি, যাতে আমার ভাবনা-চিন্তা অন্য দিকে বয়ে যেতে পারে।

সেদিন কথা বলতে বলতে ও ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ওর কথা শেষ হতেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমার মাথা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আমি সোজা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর মুখ আমার দিকে তুলে ধরলাম। আমি জানতাম ও চিৎকার করতে পারবে না, কোনো সাহায্যও চাইতে পারবে না কারো কাছে। দুহাতে ওর মুখ ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। জানতাম, যে-কোনো মুহূর্তে যে-কেউই দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে পারে এবং লাইব্রেরির দিকে চোখ পড়তেই পারে। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা যেন আমাকে আরও বেপরোয়া করে তুললো। গভীর চুম্বনে আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

—কেন আপনি এরকম করছেন? আপনি জানেন আমি দুর্বল, আমার প্রতিরোধ শক্তি নেই। আপনি আমায় জড়িয়ে ধরলে বা চুমু খেলে আমার কিছুমাত্র উত্তেজনা হয় না। আপনার ঠোঁটের সঙ্গে ছবুর বা কোনো শিশুর

ঠোঁটের কোনো তফাৎ আমি করতে পারি না। আমি আপনাকে ভালোবাসি না।.....

সেদিন কিছুই না খেয়ে অফিসে চলে গেলাম। মৈত্রেয়ীর স্বীকারোক্তি আমার মনে হিংসা, ঈর্ষা ও রাগের কিছুটা উপশম করলো। বুঝতে পারছিলাম এই নারী এমন যে নিজের প্রকৃতিকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবে বলে মনে হয় না।

সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হয়নি। রাত্রে খাবার টেবিলে ও ওর নির্দিষ্ট আসনে অর্থাৎ আমার ডানদিকের চেয়ারে এসে বসলো। টেবিলে আমি ছাড়া ছিল মন্টু, লীলু আর মৈত্রেয়ী। আমরা রাজনীতি আলোচনা করছিলাম ; মেয়রের গ্রেপ্তার, সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা ইত্যাদি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি মৈত্রেয়ীর দিকে তাকাবো না, স্পর্শও করবো না ওকে যদি না কোনো দুর্ঘটনাক্রমে তা ঘটে যায়। কিন্তু হঠাৎই অনুভব করলাম ওর উষ্ণ, নগ্ন পা আমার পায়ের ওপর। আমার সারা শরীরে যে শিহরণ দেখা দিলো, তা আমাকে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়ে দিল। ওর মুখ ছিল ফ্যাকাশে, কিন্তু ঠোঁট দুটি লাল। নিদারুণ ভয়ের চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল ও। সে চোখে ছিল গভীর আমন্ত্রণও বটে । নিজেকে সংযত রাখার জন্য আমি আমার বুকে নখ বসিয়ে ছিলাম। কিন্তু এর পর থেকে টেবিলের নিচে পায়ে পা জড়িয়ে আদর করা আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম হয়ে দাঁড়ালো। খাওয়ার পর সেই রাত্রে ও আমায় দরজায় আটকালো, বললো—আমার কাজ কতদূর এগুলো দেখবেন না?

ও লাইব্রেরির আলো জ্বালালো, কিন্তু কাগজপত্রের টেবিলের দিকে না গিয়ে অন্য একটা অন্ধকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। এই ঘরটার কাছে এসে ও ঘুরে দাঁড়ালো। ওর ব্লাউজ ছিল কাঁধ অবধি, জামার হাতা স্বাভাবিক প্রচলিত মাপ অনুযায়ী, কনুই অবধি নয়। চারদিক ভালো করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ও ওর নগ্ন বাহু আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, আপনার যা ইচ্ছে আমার হাতে করতে পারেন। আদর করুন, চুমু খান, যা ইচ্ছে করুন, দেখবেন আমার কিছু হবে না। আমি স্থির থাকবো, আমার মধ্যে কোনো উত্তেজনা জাগবে না।

বহুদিন আগে আমাদের মধ্যে ভোগবিলাস নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, যদি কেউ প্রকৃত ভালোবাসতে পারে, তবে তার সামান্য স্পর্শেই তার প্রেমিক বা প্রেমিকা সুখ পাবেই। আরও বলেছিলাম মানুষের

পক্ষে কোনো মানুষকে তার শরীর-মনে সম্পূর্ণ অধিকার করার ব্যাপারটা আমরা যতটা সহজ ভাবে নিই, ব্যাপারটা ঠিক ততখানিই জটিল। যাকে মনে করি যে সে আমার সম্পূর্ণ অধিকারে আছে, আসলে হয়ত সে আদপেই তা নেই। ওই সব কথাগুলো দিয়ে আমি মৈত্রেয়ীর সূক্ষ্ম বিশ্বাসবোধ ভাঙার চেষ্টা করেছিলাম।

আমি ওর হাত ধরলাম এবং সম্মোহিতের মতো কিছুক্ষণ ধরে দেখলাম। মনে হচ্ছিল কোনো মানুষের হাত নয়। মনে হচ্ছিল ওর ওই অনুজ্জ্বল বাদামী ত্বকের নিচে ওর বিশ্বাস আর আবেগ সঞ্চরমাণ। ও যেন হাতটা বাড়িয়ে ধরেছিল জ্বলন্ত আগুনের ওপর। পরীক্ষা করে দেখছিল নিজের ইচ্ছা-শক্তি। আমি ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিলাম। ওর মধ্যে যে একটা শিহরণ উঠলো তা আমি পদে-পদে অনুভব করতে পারলাম। ও বুঝতে পারছিল না আমি কী করতে যাচ্ছি। আমি ওর হাত ডলে-পিষে দিচ্ছিলাম, আলতো করে হাত বুলোতে বুলোতে অসংখ্যবার চুমু খাচ্ছিলাম। ওটা শুধু একটা হাত নয়, ওটা সম্পূর্ণ মৈত্রেয়ীর শরীর! এই মনে করে সুতীব্র কামনায় হাতটা আমি জড়িয়ে ধরছিলাম, আদর করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম ও ক্রমশই ইন্দ্রিয় সুখের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। এবার ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর মুখ তখন ফ্যাকাশে, চোখ আধ-বোজা। আমার যে আঙুল, হাত ওর নগ্ন বাহুকে আদর করছিল, ক্রমশ তা ওর সমস্ত শরীরের দিকে ধাবমান হলো। অনুভব করতে পারছিলাম ওর পা থর-থর করে কাঁপছে, শরীরের ভার ক্রমশ আমার শরীরে এসে পড়ছে। ও ওর আরেকটি হাত দিয়ে আমাকে জোরে জড়িয়ে ধরলো। অব্যক্ত কান্নায় ওর শরীর ফুলে ফুলে উঠছিল। আমি ওর মুখে চুমু খেলাম। ওর ঠোঁট আপনিই খুলে গেল। দাঁত দিয়ে ও আমার ঠোঁট কামড়ে দিতে লাগলো। আমার কামনায় উদ্বুদ্ধ-হয়ে-ওঠা উত্তেজনারই বহিঃপ্রকাশ এটি। বুঝতে পারছিলাম ওর ভেতরে যে কামনা-বাসনা, পাপ-পুণ্যের বোধ এত দিন ধরে ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা সন্ধ্যাবেলার সূর্যের আলোর মতো ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে, আর নতুন ঊষার আলোর মতো তার মধ্যে জেগে উঠছে ওর নারীত্ব। মনে হচ্ছিল সেই ক্ষণকাল যেন কোনোদিন না শেষ হয়!

একটা সময় নিজেকে ফিরে পেলো ও। নিজেকে ছাড়িয়ে টেবিলের দিকে এগুলো। মাঝে মাঝে দু হাত দিয়ে চোখ ঢাকছিল। টেবিলের কাছে গিয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে বললো, আজকে এইটুকু কাজ করেছি দেখুন।

ঠিক এই সময়ে খোকা এসে হাজির হলো। এসে জানালো, মিসেস সেন

মৈত্রেয়ীকে তাঁর ঘরে ডাকছেন। আমি তাড়াতাড়ি লাইব্রেরির আলো নিভিয়ে দিলাম। সেই মুহূর্তে আমার সৌভাগ্যে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে খোকাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করে প্রায় সব খুলে বলতে যাচ্ছিলাম আর কী!

ঘরে ফিরে এসে কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। একবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিছানায় এসে শুলাম, আবার উঠে পড়ে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলাম। মৈত্রেয়ীকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। ওই ভাবে খোকার এসে পড়ায় ব্যাপারটা শেষ না হয়ে, একটা বিদায়ী চুম্বনে শেষ হলে হয়তো এরকম হতো না। মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ী নিশ্চয়ই একই কথা ভাবছে। আমি ছাদের ওপর ওর হাল্কা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

বারান্দায় ওর ছায়া দেখতে পেলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ও আলো নিভিয়ে দিলো, আর আমি প্রচণ্ড হতাশায় ভেঙে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পরে, হঠাৎই একটা শিস্ দেওয়ার মতো আওয়াজ পেলাম। অন্তত আমার তাই মনে হলো। আমিও জানালার কাছে গিয়ে শিস্ দিলাম। কোনো সাড়া নেই। মনে হলো মৈত্রেয়ী দোতলার বারান্দায় আছে। আমি খুব সাবধানে আমার দরজা খুললাম, তারপর আরো সাবধানে সদর দরজা খুলে ফেললাম। রাস্তায় নামতে আমার সাহস হচ্ছিল না, কারণ রাস্তায় যথেষ্ট আলো ছিল। আমি আবার শিস্ দিলাম।

—অ্যালেন—অ্যালেন....

চাপা আওয়াজের ডাকটা দোতলার বারান্দা থেকে এলো। এই প্রথমবার ও আমার নাম ধরে ডাকলো। বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে ও দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা শাল। গ্লিসিন ফুলের গুচ্ছের পাশে দঁড়িয়ে ও। কালো এলো চুলে কোনো চোরা-পথে-আসা টুকরো টুকরো বিন্দু বিন্দু আলো এসে পড়েছে। রূপকথার গল্পের চরিত্রের মতো মনে হচ্ছিল ওকে।

আমি চুপ করে ওকে দেখছিলাম। ওকে খুবই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত লাগছিল। হঠাৎই ও শালের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বুকের কাছ থেকে সাদা মতো জিনিস বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো। হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম, জুঁই ফুলের একটা মালা।

পর মুহূর্তেই মুখ তুলে দেখি ও আর ওখানে নেই। ভীষণ খুশি মনে ফিরে এলাম সাবধানে। বারান্দার শেষ দিকে আসতেই খোকার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। আমি ওকি কিছু বলার আগেই ও তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আমি একটু জল

খেতে এসেছিলাম।

সেই সময় আমার একবারও মনে হয়নি অত রাত্রে ও কী করছিল ওখানে বা একবারও সন্দেহ হয়নি ও আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করছে কি না। আসলে আমার মন তখন আনন্দে এতই অভিভূত ছিল যে মনে হয় আমার বুদ্ধি সঠিক কাজ করছিল না। জুঁই ফুলের মালা সম্পর্কে পরে জেনেছিলাম যে ওটা প্রায় বাগ্‌দানের সমান। সেই মুহূর্তে আমার ওসব কিছু জানার প্রয়োজনও হয়নি। মৈত্রেয়ী যখন ওটা আমাকে দিয়েছে, তখন ওটা আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, এই ভেবে নিয়েই বহুবার চুম্বন করেছিলাম ওই ফুলের মালাটিকে। আমি খাটের ওপর বসে ফুলগুলো দেখতে দেখতে ভাবছিলাম পুরনো দিনগুলোর কথা। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এরকম কোনো ঘটনা আমার জীবনে কোনোদিন ঘটতে পারে। বুঝতে পারছিলাম ও চায় ওর সচেষ্ট ভূমিকা থাকলেও, যাতে ওকে আমি প্রেমাস্পদ না ভাবি, কিন্তু ওকে ততদিনে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

রাতটা কাটলো স্বপ্ন আর স্মৃতির আনাগোনার মধ্য দিয়ে। ফুলের সুবাস আমার স্বপ্নে এসে আমাকে যেন শোনাচ্ছিল বাংলার সমভূমিতে মরালের ডাকের কথা। মনে হচ্ছিল সৌভাগ্যের দরজা আমার সামনে খুলে গেছে। অদূরে এক রূপকথার জীবন আমার জন্য অপেক্ষমাণ।

পরের দিন অফিসে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে আমার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হলো। মৈত্রেয়ী আমার জন্য খাবার ঘরে অপেক্ষা করছিল। ও বর্ণ অনুযায়ী বই-এর নামগুলো এক একটা কাঠের বাক্সে শ্রেণীবদ্ধ করে রাখছিল। আমাকে দেখা মাত্র ছুটে গিয়ে আমার খাবার নিয়ে এলো। তারপর আমার কাছে এসে বসলো চেয়ার টেনে। আমি বুঝতে পারছিলাম না কি দিয়ে কথা শুরু করবো। ও আমাকে এক দৃষ্টিতে দেখছিল। ভীষণ খিদে পেয়েছিল, তাই গোগ্রাসে গিলছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় খাওয়া থামিয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টিতে আমি ওকে বলতে চাইছিলাম, ও আমার ভীষণ, ভীষণ প্রিয়।

—আজ একবারও আমার কথা তোমার মনে পড়েছে?—হঠাৎ ও জিজ্ঞাসা করলো।

আমি জানতাম প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরকে এই ধরনের প্রশ্নই করে থাকে। কিন্তু আমি দেখলাম ওর চোখের কোণে জল।

—কাঁদছো কেন?

আমার কণ্ঠস্বরে হয়ত যথেষ্ট কোমলতা ছিল না। কিন্তু আমি তো ওকে সত্যিই ভীষণ ভালোবাসতাম। তবু কেন ওর কষ্ট আমার মধ্যে একইভাবে সঞ্চারিত হলো না? কেন তখনও আমার খিদে পাচ্ছিল?

ও কোনো উত্তর দিলো না। আমি হাত বাড়িয়ে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। তারপর আবার খেতে শুরু করলাম।

—অ্যালেন, তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

ও বাংলায় কথা বলছিল যাতে সম্বোধনটা 'তুমি' করে বোঝানো যায়। ওর গলার ওঠা নামা ছিল ভীষণ মিষ্টি।

ও আমায় রবীন্দ্রনাথের বাক্সটা দেখালো। বাক্সের মধ্যে সুবাসযুক্ত এক গাছা সাদা চুল ছিল।

—এটা নিয়ে তুমি যা খুশি করো। ছুঁড়ে ফেলে দাও। সব পুড়িয়ে ফেলো। আমি আর এটা আমার কাছে রাখতে পারছিনা। তোমরা 'ভালোবাসা' বলতে যা বোঝো আমি রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিন সেরকম ভালোবাসিনি। ওঁর প্রতি আমার ছিল অসীম শ্রদ্ধা, ছিল প্রবল আবেগ। বলতে পারো সেই হিসেবেই সারা জীবন ওঁকে ভালোবেসে যাবো। কিন্তু আজ, আজ....

ও আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন ও স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। ওর সামনে আমি যেন কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ নই। কী এক প্রবল প্রত্যাশা, নিবিড় আসক্তি যে ছিল সেই চোখে, তা বর্ণনা করা যায় না।

—আজ আমি কেবলমাত্র তোমাকেই ভালবাসতে চাই। আমি কাউকে এভাবে ভালোবাসিনি। আজ আমি সঠিকভাবে জেনেছি।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মন্টুকে দেখতে পেয়ে ওর সঙ্গে করমর্দনেই সন্তুষ্ট থাকলাম। আমি ওর বাক্স ওর হাতেই তুলে দিলাম। একগুচ্ছ নির্জীব সাদা চুলের ওপর হিংসা করা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছিল। জীবন জীবনই। অতীত স্মৃতিমাত্র। ওর বিগত জীবন নিয়ে যন্ত্রণা পাবার কোনো মানে হয় না। শুধু কষ্ট হতো, যখনই মনে হতো মৈত্রেয়ী আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, অথবা ওঁর সঙ্গে আমাকে তুলনা করছে। তখন ডুবে যেতে চাইতাম এমন কোনো সুদূর যুগের ভাবনায়, যখন আমার আবির্ভাবই হয়নি। নিশ্চয়ই ও আমার এই ধরনের অবস্থার অন্য মানে করতো। হয়তো ওর আত্মত্যাগ, আর ওর আমার ব্যাপারে ও যে ঝুঁকি নিচ্ছে, সেই ঝুঁকির পক্ষে অবমাননাকর মনে করতো। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে উদ্বেগের সঙ্গে বললো, তুমি এই চুলের সম্পর্কে কিছু বললে না তো?

—আমি কী করবো ওটা নিয়ে? তুমিই ওটা পুড়িয়ে ফেলো। সেটা আরও ভালো হবে।

—এখন আর ওটার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। চুলটা নিয়ে কোটের পকেটে ফেলে রাখলাম। ঘরে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে আমি স্নান করতে গেলাম স্নানের ঘরে। খোশমেজাজে আমি এত জোরে শিস্ দিচ্ছিলাম যে লীলু ওখান দিয়ে যাবার সময় দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে গেল, গত রাত্রে আমি কোনো সুখ-স্বপ্ন দেখেছি কি না!

তারপরে আমার ঘরে এসে আমি যখন জামা-কাপড় পরছি, তখন মৈত্রেয়ী এসে দরজায় টোকা দিলো। ও ঘরে ঢুকেই পর্দাটা টেনে দিলো, আর আমার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো, মৃদু, অস্ফুট স্বরে বললো, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না।

কিন্তু আমি ওকে জড়িয়ে ধরতেই ও ছাড়িয়ে নিলো নিজেকে।

শিহরণজড়িত গলায় বললো, আমি কি কোনো পাপ করছি? আমার ভয় করছে কেন?

—ভয় কেন? আমরা কি পরস্পরকে ভালোবাসি না?

—কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা যেন বাবা-মা কেউই জানতে না পারে।

—আমিই একদিন বলবো।

সভয়ে ও এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো, যেন আমি পাগলের প্রলাপ বকছি।

—এসব কথা বলা অসম্ভব।

—কিন্তু এটা তো করতেই হবে। আজ না হয় কাল। তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব তো আমাকেই করতে হবে। আমি বলবো আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। তোমার বাবা নিশ্চয়ই আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। তুমি তো জানো, উনি আমাকে কতখানি ভালোবাসেন।

—তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারছো না। আমাদের বাড়ির সবাই তোমাকে ভালোবাসেন। আমিও তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু তোমাকে আমায় ভালোবাসতে হবে ওঁদের মতো করে। অনেক আগে যেভাবে ভালোবাসতাম সে ভাবে.....ভাই-এর মতো।

ওর হাতে একটা চুমু দিয়ে বললাম, ধ্যুৎ! আমি তোমার ভাই বা দাদা! মোটেই নই। তা আমি ভাবতেও পারছি না। তোমার বাবা-মাও বোধ হয়

এরকম ভাবেন না।

—না গো, সত্যিই তাই। তুমি কিছু বোঝো না!—ও কাঁদতে শুরু করলো।

—হায়! ভগবান! এ আবার কী ? কান্না কেন?

—তোমার অনুশোচনা হচ্ছে আমায় ভালবেসে?

ও আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, তুমি বেশ জানো যে যাই ঘটুক না কেন আমি তোমাকে ভালোবাসবোই। আমি তোমার। একদিন তুমি আমায় তোমার দেশে নিয়ে যাবে। আমি আমার দেশকে ভুলে যাবো। আমি ভুলতেই চাই....

আমার শরীরের সঙ্গে মিশে ও কাঁদতে লাগলো। তীব্র আবেগ আর মনোযন্ত্রণায় ও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল।

—ওঁদের কিছু বোলো না লক্ষ্মীটি! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ওঁরা কখনই মেনে নেবেন না। ওঁরা তোমায় ভালোবাসেন—ওঁরা চান তুমি ওঁদেরই একজন হও—ওঁদের ছেলে।

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। মৈত্রেয়ী বলেই চললো, ওঁরা আমায় বলেছেন। অ্যালেন তোমার দাদা হবে। ওকে তোমায় ভালোবাসতে হবে নিজের ভাইয়ের মতো। তোমাকে ওঁরা দত্তক পুত্র নেবেন। যখন বাবার অবসর নেবার সময় হবে আমরা সবাই তোমার দেশে চলে যাবো। আমাদের প্রচুর টাকা, কাজেই ওখানে রাজার হালে থাকবো। ওখানে এত গরম নেই, দাঙ্গা, হাঙ্গামা নেই। তোমার দেশের লোকেরা এখানকার ইংরেজদের মতো নয়। অত্যাচার, শোষণ কিছুই আমাদের সহ্য করতে হবে না। আমি ওঁদের কোনো কথা না শুনে তোমায় কীভাবে ভালোবেসে ফেললাম...

মৈত্রেয়ী উত্তেজনায় টলমল করছিল। ওকে ধরে না ফেললে হয়তো পড়েই যেতো। আমি ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। আমি ওর কথাবার্তা শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম। বহুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

১০.

সেদিন থেকে এক নতুন জীবন শুরু হলো। তার স্মৃতি আমার কাছে আজও সজীব। প্রতিটি দিন নিয়েই এত কথা আমি লিখতে পারতাম যে হয়তো একটা গোটা খাতাই ভরে যেতো। আগস্ট মাসের প্রথম দিকটা ছিল যেন অবকাশ যাপনের সময়। জামা কাপড় পাল্টানো, ডায়েরি লেখা আর ঘুমানোর জন্য ছাড়া আমি আমার ঘরেই ঢুকতাম না। মৈত্রেয়ী বি. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি ওকে সাহায্য করতাম। যদিও সংস্কৃত আমি একটুকু বুঝতে পারতাম না, তবু যখন ওর বৃদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষক আসতেন, আমি শকুন্তলা নাটকের ব্যাখ্যা শোনার জন্য ওর পাশে কার্পেটে বসে পড়তাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত চোখে কম দেখতেন, আর সেই সুযোগে আমি মৈত্রেয়ীকে লুকিয়ে চুরিয়ে আদর করতাম, জ্বালাতন করতাম।

মৈত্রেয়ী আমাকে কালিদাসের রচনা বুঝিয়ে দিতো। কালিদাসের কাব্যে বিশেষ করে প্রেমের অংশগুলো ও ব্যাখ্যা করতো। যেন পরোক্ষভাবে নিজের কথা বলে যেতো ও। সঙ্গীত, সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা কবিতা যা যা ও ভালোবাসতো, ক্রমশ আমিও তা ভালোবাসতে শুরু করলাম। বৈষ্ণব কবিতার মানে বোঝার চেষ্টা করতাম। সবচেয়ে মোহিত হতাম শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ পড়ে। তাক ভর্তি পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের বইয়ের ওপর আকর্ষণ আমার ক্রমশ চলে যাচ্ছিল।

কয়েকদিন পরে ও আমাকে বললো, ওর আরও কিছু স্বীকারোক্তির নাকি বাকি আছে। আমার প্রতি ওর ভালোবাসায় আমার কোনোই সন্দেহ ছিল না। যে-কোনো সময়ই, ওর উপস্থিতি ছিল আমার কাছে দারুণ কিছু প্রাপ্তির মতো। তাই ও কিছু বলার আগেই ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলাম।

—না, আগে আমার কথা শুনতেই হবে। তোমার সমস্ত কথা জানা দরকার। আচ্ছা, তুমি কি আগে কখনও এরকম করে ভালোবেসেছো?

—না, কোনো দিনও না।

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম আমি। সত্য, মিথ্যা বিচার না করেই। অথবা হয়তো এরকমই ভেবেছিলাম, কী মূল্য আছে আমার কৈশোরের সেই ইন্দ্রিয়গত ক্ষণিকের ভালোলাগার। অন্তত এই সব-ভোলানো পাগল-করা ভালোবাসার কাছে! ও বললো, আমিও তাই ভাবি। কিন্তু একটা অন্যরকম ভালোবাসার কথা কি তোমায় বলবো?

—তোমার ইচ্ছে।

—আমি একটা গাছকে ভালোবাসতাম। আমাদের দেশে এই গাছের নাম সপ্তপর্ণী।

—ওটাকে ভালোবাসা বলে না।

—না, ওটা ভালোবাসাই। ছবুও ওর গাছকে ভালোবাসে। আমার গাছটা ছিল বড় গাছ। সেই সময় আমরা বালীগঞ্জে থাকতাম। ওখানে খুব বড় বড় গাছ ছিল। আমি প্রেমে পড়লাম বিশাল এক সপ্তপর্ণী গাছের সঙ্গে। আমি গাছটাকে রোজ না দেখে থাকতে পারতাম না। আমি রোজ ওকে আলিঙ্গন করতাম, কথা বলতাম ওর সঙ্গে। গাছটার গায়ে আমি চুম্বন করতাম, ওর কাছে গিয়ে আমি কাঁদতাম। মনে মনে কবিতা রচনা করে আমি ওকে আবৃত্তি করে শোনাতাম। ও ওর পাতা দিয়ে আমার গায়ে মাথায়, মুখে ঠাণ্ডা স্পর্শ দিতো। আমি একা ঘুমোতে পারতাম না। গাছটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার অসুখ করে গেলো। আমার বুকের অসুখের সূত্রপাতও সেই সময় থেকে। আমায় অনেক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। বিছানায় রোজ আমাকে ওই গাছের টাটকা ডাল-পাতা এনে দিতে হতো।

আমার মনে হচ্ছিল যেন কোনো রূপকথার গল্প শুনছি। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারছিলাম, ও যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এক জটিল মানসিক গঠন ছিল ওর। বুঝতে পারছিলাম একমাত্র শিক্ষিত সভ্য মানুষরাই স্বচ্ছ দৃষ্টি-সম্পন্ন হতে পারে। যে ভারতীয়দের আমি এত ভালোবাসি, ওদেরই একজন হয়ে উঠতে চাই, তাদেরই মন এত জটিল, দুর্ভেদ্য যে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারতাম না।

মৈত্রেয়ীর স্বীকারোক্তি আমায় কষ্ট দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ও একই সঙ্গে অনেক কিছুকেই ভালোবাসতে পারে। আমি হৃদয়ের অংশীদারী কারবারে বিশ্বাস করতাম না, চাইতাম ওর সমগ্র হৃদয় জুড়ে শুধু একজনেরই অস্তিত্ব থাকবে, আর সেটা হবো আমিই। তাই ওর কথাগুলো যে আমায় কতখানি কষ্ট দিচ্ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আমি ওর স্মৃতি থেকে কিছুই মুছে দিতে পারবো না। কী করে এক কিশোরী তার শরীর-মন নিবেদন করতে পারে একটা গাছকে, কী করে একটা গাছের সঙ্গে একজন মানুষের মানসিক আদান-প্রদান ঘটতে পারে, এসব কিছু আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। ও আমাকে সেই গাছের পাতা আর ডাল এনে দেখালো। সেগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এক মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আমি আমার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলাম না। ডাল, পাতা সব দুহাতে ছিন্ন ভিন্ন করে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিলাম। আমি

ভাবতে পারছিলাম না, ভালোবাসায় একটা গাছ আমার চেয়ে এগিয়ে আছে। কোথায় গেল আমার বিশ্বাস, যে ও আমাকেই শুধু ভালোবাসে, ওর জগৎ জুড়ে শুধু আমারই অস্তিত্ব!

ও আমার হাতে চুমু খেতে লাগলো। যেন নিশ্চিত করতে চাইলো যে ও নিজেও এই চেয়েছিল। ও সব ভুলে গেছে। ওর গুরু, ওর গাছ ওর এখনকার ভালোবাসার সঙ্গে ওইসব ভালোবাসার কোনো মিল ছিল না। আমি চুপ করে ছিলাম। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। মৈত্রেয়ী কাঁদতে কাঁদতে বললো, তোমাকেই যদি একমাত্র ভালো না বাসতাম, আমি কখনই এসব কথা স্বীকার করতে পারতাম না। তোমাকেও বলতে হবে সেই সব মেয়েদের কথা যাদের সঙ্গে তুমি আগে মিশেছো, ভালোবেসেছো।

—আমি কোনো দিনই কাউকে ভালোবাসিনি।

ও আশ্চর্য হয়ে গেল।

—তুমি এত দিন প্রেম ছাড়া বেঁচে আছো?

আমি ইতস্তত করছিলাম। মৈত্রেয়ী আমার মন পড়তে পারলো।

—না, আমি সেই সব মেয়েদের কথা জানতে চাই না যাদের সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। ওগুলো কলঙ্ক, পাপ, ভালোবাসা নয়।

ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সেই সময় ওদের গাড়ির ড্রাইভার বারান্দা ধরে এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে ও মৈত্রেয়ীকে দেখলো আর ভয় পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত চলে গেল। পরে জেনেছিলাম ড্রাইভারটা আমাদের ওপর নজর রাখতো। মৈত্রেয়ী মুখের ওপর শাল চাপা দিয়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎই বলে উঠলো, আমায় কষ্ট দিয়ে তোমার কী লাভ হচ্ছে? তোমার কি মনে হচ্ছে যে আমি দেহে এবং মনে শুদ্ধ নই?

আমি বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর কথাগুলোই আমার বুক ভেঙে দিচ্ছিল, আর উল্টে ওই বলছে যে আমি ওকে কষ্ট দিচ্ছি? আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসতাম। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম আমার মন থেকে ওর অতীতকে মুছে ফেলতে। অপরপক্ষে ও ক্রমাগতই সেগুলোকে আমার সামনে মেলে ধরছিল।

সেই দিনই বিকেলে ও আর একটা ঘটনার কথা বললো। ওর তখন বারো-তেরো বছর বয়স। ওর মা ওকে নিয়ে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গিয়েছিলেন। মন্দিরের অন্ধকার গলিপথগুলো দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কে

একজন ওর গলায় একটা মালা পরিয়ে দেয়। ও পরিষ্কার বুঝতে পারেন মানুষটাকে। আলোয় এসে মিসেস সেন মালাটি দেখলেন। দেখে ওর গলা থেকে সেটা খুলে নিয়ে নিজের হাতে রাখলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে যখন ওরা বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করছিল তখন প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের মধ্যেই কেউ ওকে একটা করে মালা পরিয়ে দিচ্ছিল। প্রদক্ষিণ শেষে দেখা গেল মিসেস সেনের হাতে ছখানা মালা জমা হয়েছে। উনি প্রচণ্ড রেগে চেঁচামেচি করে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। কারণ ওই মাল্য-প্রদানের অর্থ ছিল প্রায় বিবাহের সমান। ওঁর চেঁচামেচি শুনে একজন যুবক অন্ধকার থেকে সামনে এগিয়ে এলো। অসম্ভব রূপবান ছিল সেই যুবক। যুবকটি নিচু হয়ে মিসেস সেনের পায়ে হাত দিয়ে বললো, 'মা'। এইটুকু বলেই যুবক ভিড়ে আর অন্ধকারে মিশে গেল। যুবকটির রূপের বর্ণনা আমি শুনতে পারছিলাম না। আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল।

বহু বছর ধরে মৈত্রেয়ী সেই যুবকের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসার পরও। এই কথা শুনে আমার মনে হলো রবীন্দ্রনাথকে মৈত্রেয়ী বোধ হয় এখনও ভুলতে পারেনি। তাহলে...ভবিষ্যতে এমনও কি হতে পারে যে আরও একজন কেউ এলো এবং মৈত্রেয়ী তাকেও একই সঙ্গে ভালোবেসে চললো আমায় তুচ্ছ করে? ওই ঘটনাটা ও রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ওই যুবকটি ছিল ভালোবাসার দূত। আর মালাটা ছিল ভালোবাসার প্রতীক। এইসব কথা শোনবার পর মৈত্রেয়ীর মনের জগৎ সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা বদলে নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম। এই দেশের গভীর জঙ্গল, ধর্মীয়, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক, এসব কিছুর মতই দুর্বোধ্য এ দেশের মানসিক জগৎ। এই দুর্বোধ্যতার মিছিলের মধ্যে আমার জায়গাটা কোথায়? এই কিশোরী মেয়েটি, যে আমায় ভালোবাসে, তার মনের কোন জায়গায় আমার অবস্থান? আমায় জড়িয়ে ধরে মৈত্রেয়ী বললো, এখন আমি শুধু তোমার। সত্যিকারের, বাস্তব ভালোবাসা আমি তোমার কাছেই পেয়েছি। কী ভাবে ভালোবাসতে হয় তুমিই আমাকে শিখিয়েছো। আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। তুমি যখন রাগ করো, আমার মনে হয় এক বিশাল ঝড় বইছে। তুমি আমাকে পা দিয়ে ঠেলে ফেললেও আমার আনন্দ হবে। তোমার কিসের ভয়?

বাস্তবিকই চিন্তিত হবার মতো কোনো কারণ ছিল না। খাবার পর মৈত্রেয়ী আমার ঘরে এলো। সবাই তখন ওপরে ফ্যানের তলায় ঘুমুচ্ছে। বিরাট

আরাম কেদারায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বসলো। আমি ওকে চুম্বন করতে শুরু করলাম। সেই দিন আমি ওকে ভালো করে দেখলাম। ভারতের মন্দিরগাত্রে যেসব অপ্সরা মূর্তি আমি দেখেছিলাম, প্রায় তাদের মতো ও নিখুঁত। আনন্দ-মিশ্রিত নিদারুণ ভয়ে মৈত্রেয়ী চোখ বুজলো।

আরাম কেদারার একটা হাতল ও চেপে ধরে রেখেছিল, অন্য হাতে আমার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করছিল।

—এটা কি পাপ নয়?—ও হঠাৎ ফিস্‌ফিসিয়ে বললো।

ওর চোখের কোণে অশ্রু। কয়েক গুচ্ছ চুল ওর ঠোঁটের কোণে এবং চিবুকে আটকে ছিল। আমি উত্তর দিলাম, যখন আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, তখন আমাদের ভালোবাসার কোনো সীমানা থাকবে না।

—কিন্তু এখন? এখন এটুকুই কি পাপ নয়?

—না, এখন তো আমি তোমাকে সেভাবে আদর করছি না।

—তবু বলো আমি কি পাপ করছি না?

ওর তীব্র পাপবোধ ওকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ও চোখ বন্ধ করে ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

ও কী বলতে চেয়েছিল তা বুঝতেই আমার বেশ কয়েক দিন কেটে গেল। প্রাচ্য নৈতিকতার বোধে ও পীড়িত হচ্ছিল। আলিঙ্গন, চুম্বন অবধি ওর বোধে ছিল ভালোবাসার বন্ধনের প্রতীক। তার সামান্য অতিরিক্তই হচ্ছে নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করা। সংস্কার, কর্মফলের ভয়, ঈশ্বরের ভয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই এদেশের ভালোবাসার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়কে অবদমিত করে রেখেছে। সেদিন রাত্রে নিজেকে বহু প্রশ্ন করেছিলাম, কাকে বলে শুচিতা? শরীর ও মনের শুচিতা? এর অর্থ কী—এর ব্যাখ্যা কী, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের ধারণায়? প্রথম চুম্বনের পর মৈত্রেয়ীর বিবেকের প্রতিরূপই বা কী?

অনেক ভেবে আমি ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। মিসেস সেনকে আমি সত্যিই ভীষণ ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম ওঁর স্বামীকে, তাই ঠিক করলাম সুযোগ মতো আমি নিজেই মৈত্রেয়ীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব তুলবো।

তখনকার মতো সান্ত্বনা খুঁজে নিতে হলো আমাদের একসঙ্গে বাইরে বেড়ানোর মধ্যেই। মোটরে করে আমরা ঘুরে বেড়াতাম ব্যারাকপুর, হুগলী, চন্দননগর, প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

গাড়িতে নরেন্দ্র সেনের পরিবারের কেউ-না-কেউ থাকতেনই, কিন্তু

আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র পরস্পরের প্রতিই নিবদ্ধ থাকতো, তাই আমাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে অন্য কারো উপস্থিতি অনুভব করতাম না। গাড়িতে করে কত গ্রামের ভেতরই না চলে গেছি। তাল, সুপারি, নারকেল গাছের নিচে কত ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পেতাম। ছোট ছোট জঙ্গল দেখে মনে হতো কী সুন্দর লুকোনোর জায়গা। গ্রামের লোকেরা আমাদের শুভেচ্ছা জানাতো। বড় বড় গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন রাস্তাগুলোর ওপর আমরা কত স্মৃতির স্বাক্ষর রেখে এসেছিলাম। বড় বড় পুকুর, যার পাশে কখনো কখনো আমরা হাত ধরাধরি করে বসে থাকতাম। চন্দননগরের রাস্তা তখন ছিল নিস্তব্ধ, দু'পাশে বড় বড় গাছ, অন্ধকারে মুঠোমুঠো জোনাকির আলো, এসব কথা কি ভুলে যাবার?

একটি বিশেষ রাত্রির কথা বেশ মনে পড়ে। রাস্তার মাঝে গাড়িটা গেল খারাপ হয়ে। ড্রাইভার আর মন্টু যন্ত্রপাতি আর মিস্ত্রীর সন্ধানে বেরোলো। নরেন্দ্র সেন গাড়ির সিটে প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায়, আধ-শোওয়া। ছবু, মৈত্রেয়ী আর আমি তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশে চাঁদ ছিল না, এতো অগণ্য তারা আমি একসঙ্গে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জোনাকির দল নির্ভয়ে আমাদের মুখে, কাঁধে, হাতে এসে বসছিল। মনে হচ্ছিল ওরা যেন রূপকথার জীবন্ত মণিমুক্তো। আমরা কেউই কোনো কথা বলছিলাম না। যদিও ছবুর উপস্থিতির ভয় ছিল, তা সত্ত্বেও অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার সুযোগে মৈত্রেয়ী আর আমি প্রায়ই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছিলাম। জানি না কোন্ এক মনোজগতে আমি বিচরণ করছিলাম। মনে হচ্ছিল এই অবস্থার যেন কোনো আদি নেই, অন্তও নেই। একটা প্রাচীন ইউক্যালিপ্টাস্ গাছ যেন উঠে গেছে আকাশ স্পর্শ করতে। আমরা তিনজনে একটা নিস্তরঙ্গ পুকুরের ধারে বসলাম। নিকষ কালো জলে তারাদের প্রতিবিম্ব যেন সূক্ষ্ম জরির কাজের মতো লাগছিল। এক অদ্ভুত ভাবাবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। আমার আত্মা প্রবেশ করছিল এক অলৌকিক প্রশান্তির মধ্যে।

আর একবার ধানখেতের সীমানায় ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে আমি একটা জীর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ি আবিষ্কার করেছিলাম। ধানখেতে হাঁটার সময় আমার প্যান্ট হাঁটু অবধি ভিজে গিয়েছিল। প্যান্ট শুকোবার জন্য আমি সেই বাড়ির প্রাচীরে বসেছিলাম। বন্য গাছপালায় বাড়িটা প্রায় ঢেকে গিয়েছিল। তখনও সন্ধ্যা হয়নি, আকাশে হয়নি তারাদের আবির্ভাব। পড়ন্ত বিকেলের উষ্ণ হাওয়া

ইউক্যালিপ্টাসের সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। সমস্ত পরিবেশটাই যেন আমাদের প্ররোচনা দিচ্ছিল, জানাচ্ছিল আমন্ত্রণ। মৈত্রেয়ী আর আমি পরস্পরের দিকে গভীর দৃষ্টি নিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়েছিলাম,—ঠিক লাইব্রেরিতে যে ভাবে আমরা পরস্পরকে দেখতাম, তেমনি ভাবে। হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে আমি ওর মাথার চুলে চুম্বন করলাম।

সেই সব বেড়ানোর দিনগুলো আমার স্মৃতিতে আজও জীবন্ত হয়ে আছে। সেইসব দিনগুলোর মাধুর্য আজও আমায় বিচলিত করে। দৈহিক স্মৃতি চলে যায়, সম্পূর্ণ দৈহিক অন্তরঙ্গতার স্মৃতিও ম্লান হয়ে যায়, যেমন যায় আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার স্মৃতি। সেই সময় নির্বাক্ সম্মোহিত দৃষ্টিবিনিময়ের রহস্য আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম। একটা সময় গাড়ি এসে শহরে ঢুকতো। সেখানে পর্যাপ্ত আলোর মধ্যেও আমাদের চোখ পরস্পরকে খুঁজে বেড়াতো। দৃষ্টিতেই আমরা পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করতাম। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের ভ্রমণসঙ্গীরা কী করে সমস্ত ব্যাপারটার প্রতি উদাসীন থাকতো।

একদিন রাত্রিতে আমরা চন্দননগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত প্রশস্ত পথ উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত। কিন্তু আমার মনে ছিল ক্লান্তি আর অবসাদ। রাস্তার দুপাশে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম প্রাসাদ, অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ, পৃথিবীর আর এক প্রান্তে হারিয়ে যাওয়া লুপ্তপ্রায় ফরাসী ঔপনিবেশিকদের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিচিহ্ন। ফেরার পথে আমি ভারতবর্ষকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম,—এই দেশ কোন্ আত্মশক্তির জোরে কিভাবে কষ্ট সহ্য করে, আত্মস্থ করে, সেই সব যাযাবর জাতিদের যারা জোর করে তাকে দখল করে, শাসন করে, শোষণ করে। বিংশ শতাব্দীর একটি আধুনিক মোটর গাড়িতে ভ্রমণ করতে করতে আমি অনুভব করছিলাম, উপনিষদের ব্যাখ্যার মতো প্রায়-অপ্রবেশ্য ও প্রায়-দুর্বোধ্য এক নিঃসঙ্গ আত্মার উপস্থিতি, যা একই সঙ্গে অবাস্তব ও পবিত্র। আমি পার্থিব জগতে ফিরে আসার জন্য আমার ভালোবাসার একান্ত সম্পদ সেই কিশোরীটির বাহু স্পর্শ করলাম।

মনে আছে, প্রায়ই আমরা বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রমে যেতাম, বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোতে। মঠের সিঁড়িগুলো গঙ্গার জলধারা পর্যন্ত নেমে গেছে। সৌরভে আচ্ছন্ন মন্দির। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। নিঃশব্দে আমরা সেখানে বেড়াতাম। প্রেম-ভালোবাসার আকার-ইঙ্গিত সব ভুলে যেতাম। মনে হতো আমি সেখানে এমন এক শান্তি পাই, যা আমার

আত্মা আগে কোনোদিনও অনুভব করেনি।

একটা তীব্র আবেগ, একটা বদ্ধমূল দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমশ আমায় ঠেলে দিচ্ছিল ধর্মান্তরিত হতে, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে আমাদের বিবাহের সমস্ত বাধা দূর করতে।

বেলুড় মঠেই মৈত্রেয়ীর কাছে আমি প্রকাশ করেছিলাম আমার ধর্মান্তরিত হবার ইচ্ছা। ও ভীষণ অবাক্ হয়ে গেল, গভীর উল্লাসে ও জানালো, তাহলে কেউই আমাদের আর বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। সেদিন বিকেলেই ভবানীপুরের বাড়িতে এসে সে খবরটা তার মাকে জানালো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচে নেমে আমার ঘরে এসে জানালো মিসেস সেন এবং উপস্থিত সব মহিলারাই খুব খুশি হয়েছেন এই প্রস্তাবে। আমরা ভারমুক্ত হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম।

কিন্তু আমার ধর্মান্তরিত হবার অভিপ্রায় আমার কাছে শোনামাত্র নরেন্দ্র সেন বেশ খেপে গেলেন। শুধুমাত্র নতুনত্ব এবং কৌতূহলপূর্ণ উৎসবাদির আকর্ষণ ছেড়ে ধর্ম ও নীতির মূল ব্যাপারটা গভীরভাবে অনুধাবন করা আমার প্রাথমিক কর্ম কিনা এ প্রশ্ন করলেন আমাকে। তিনি নিজে হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত, এবং তিনি জানেন ধর্ম ত্যাগ করলে তাঁকে সামাজিক মর্যাদা হারাতে হবে। এবং তাঁর মতে, আমারও সেই রকম চিন্তা করা উচিত।

এরকম সোজাসুজি জোরালো বিরোধিতায় মৈত্রেয়ী আর আমি দুজনেই খুব ভেঙে পড়লাম। ঠিক করলাম যে অক্টোবর মাসটা পুরীতে কাটাবো। সেখান থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এলে আর কোনো বিতর্কের অবকাশ থাকবে না।

নরেন্দ্র সেন অনেক দিন ধরেই রক্তচাপে ভুগছিলেন, এবার হঠাৎই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাড়িশুদ্ধু লোক বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলো। গাড়িতে বেড়ানো আর বিশেষ একটা হতো না। আমার বেশির ভাগ সময়ই কাটতো রোগীর ঘরে। উপন্যাস, দর্শন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই পড়ে শোনাতাম তাঁকে। শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় তিনি ভীষণই আত্মা, পরলোক আর তাঁর রোগ নিয়ে চিন্তা করতেন, ওই সম্পর্কে পড়াশোনা করতে চাইতেন। আমি, মন্টু ও মৈত্রেয়ী পালা করে তাঁর দেখাশোনা করতাম। শারীরিক কষ্ট তাঁর বিশেষ ছিল না, তবে দিনের বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে চোখে কালো চশমা পরে শুয়ে থাকতে হতো।

আশেপাশে তখন অসংখ্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার জাতীয়তাবাদীকে জেলে পোরা হয়েছিল। যখন তখন অশ্বারোহী পুলিশদের

লাঠিচার্জ, ভবানীপুরে শিখদের ওপরে ব্রিটিশরাজের অত্যাচার, লুঠতরাজ। চোখের সামনে দেখেছি শিশুদের পর্যন্ত ধরে পেটাতে, স্ত্রীলোকদের আহত করতে। পুনরায় গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছিল। আমার মনেও বিদ্রোহ দেখা দিলো। যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে উঠে আমার মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করলো। প্রত্যহ নতুন নতুন বর্বরতা খবরের কাগজ মারফতে জেনে আমি রাগে ফেটে পড়তাম। রাস্তায় যে-কোনো শ্বেতাঙ্গকেই দেখলে আমি ঘৃণার চোখে তাকাতাম। ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি করা প্রত্যেকটি জিনিসই আমি বয়কট করলাম, এমনকি আমার প্রিয় তামাক পর্যন্ত। অবশ্য ভবানীপুরের বাড়িতে নিজের জন্য আমাকে সামান্য জিনিসই কেনাকাটা করতে হতো।

শিখপল্লী জালিয়ানওয়ালাবাগ আক্রমণের কয়েকদিন পরে হ্যারল্ড একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমার টাকাকড়ি থাকতো চার্টার্ড ব্যাঙ্কে। আমি ওকে একটা চেক লিখে দিলাম। এটুকু পরোপকার করতে পেরে আমার ভালোই লাগছিল। হতভাগ্য লোকটির তিনমাসের বোর্ডিং-এর ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিল এবং সামনের মাসে মাইনে পাওয়ার আগে খাবার কেনার টাকা পর্যন্ত ওর হাতে ছিল না। আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগছিল ভারতের একজন শত্রুকে সাহায্য করার জন্য। কারণ ততোদিনে আমি একজন প্রায় গোঁড়া দেশভক্ত বনে গিয়েছিলাম।

মৈত্রেয়ী আমাদের চা দিতে এসেছিল। আমি গান্ধী, বিপ্লব ইত্যাদি নিয়ে একটা বিতর্ক শুরু করার চেষ্টা করছিলাম। সমস্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতো হ্যারল্ডও ঐ বিষয়ে রূঢ়, নির্দয় মনোভাব পোষণ করতো। পুলিশ, সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস, অত্যাচার ইত্যাদিতে সে ক্ষুব্ধ ছিল না, ছিল মুগ্ধ। কিন্তু সদ্য সদ্য সে এক শ' টাকা ধার করেছে,—তাই এখুনি আমার বিপরীত মনোভাব সে ব্যক্ত করতে পারছে না। অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করলাম তার কাপুরুষতা।

হ্যারল্ড-এর টাকা ধার করা ছাড়া আরও একটা উদ্দেশ্যও ছিল। সেটা ছিল, আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা। আমার বাড়িটা চিনে রাখা, আমি কিরকম কালা আদমীদের সঙ্গে জীবন যাপন করছি এবং কতটা স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামে আছি, এটা জানা। মৈত্রেয়ীকে দেখাটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। সে যখন মৈত্রেয়ীকে আমাদের চা পরিবেশন করতে দেখলো এবং আমার দিকে গোপন দৃষ্টি দিতে ও হাসতে দেখলো তখন পুরো ব্যাপারটাই সে বুঝে ফেললো।

—অ্যালেন তোকে আমরা হারালাম। তোর আর কোনো আশা নেই।

আমি ওর দিকে সোজা চোখে চোখ রেখে রেগে গিয়ে বললাম,—এই সমাজে ঢুকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ জগৎ জীবন্ত, এখানে সত্তাবান মানুষ আছে, যারা কষ্ট পায় কিন্তু অভিযোগ করে না এবং যাদের এখনো কিছুটা অন্তত নীতিজ্ঞান আছে। এদের মেয়েরা পবিত্র, আমাদের মেয়েদের মতো প্রায়-বারবধূ নয়। আমি একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করবো ভেবেছিস! যারা কৌমার্য কী, তাই জানে না! ত্যাগ বলতে কী বোঝায় তার কোনো ধারণা যাদের নেই? আমাদের জগৎ, শ্বেতাঙ্গদের জগৎ, একটা মৃত ক্লেদাক্ত জগৎ। আমার ওখান থেকে কিচ্ছু নেবার নেই। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, এই সমাজে, এই জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে আমি যেন আমার পুরোনো অন্ধ স্বার্থ এবং অবাস্তব জীবনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি। গড়তে পারি একটা নিখুঁত, পরিপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ভালোবাসার জীবন,—আর এই শিক্ষা আমি পেয়েছি এদেরই সমাজে, এই বাড়িতে।

যদিও তখন যে-ধারণা আমি উদ্দীপনা ও সততার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলাম, তা আমার পরিষ্কার চেতনার নাগালে ছিল না। হ্যারল্ড কিন্তু ভীষণ অবাক্ হয়ে গেল। নিদারুণ অস্বস্তি নিয়ে কী উত্তর দেবে সে ভেবে পাচ্ছিল না! শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতির মৃত্যু, যা আমাকে বহুদিন বিচলিত করেছে, সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না। ওর বোধ হয় ইচ্ছে হচ্ছিল একগ্লাস হুইস্কি খেয়ে আমার বাড়ি থেকে প্রস্থান করা। কিছু না ভেবেই সে বললো,—কী তোর ধর্ম?

—যা তোর ধর্ম তাইই। কিন্তু আমার ধর্মকে আমি নতুন করে জেনেছি এখানে, এই ভারতে। এই মাটিতে, যে মাটির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যেখানকার মানুষ ক্ষুধার্ত, কিন্তু ভালোবাসার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জ্ঞানের জন্য, সত্তার মুক্তির জন্য সতত নিরত। এদের এই সান্নিধ্য ছাড়া খ্রীস্টানধর্মকেও আমি বুঝতে পারতাম না।

এ যাবৎ হ্যারল্ড আমার কাছে কেবল শুনেছে প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ইত্যাদি আমার পড়াশোনার কথা, আজ হিন্দুধর্ম, খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে আমার কথা শুনে সে অবাক্ হয়ে গেল। আমি অন্তরে অনুভব করতে পারছিলাম, আমার এই যাবতীয় উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রাণশক্তি ছিল আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা।

পরবর্তী কালে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার সমস্ত কাজ, ভাবনা, সবই কি আমার ভাবপ্রবণতার কাছে নিছক দাসত্বের দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল?

এই অনুভূতি হয়েছিল অনেক অনেক পরে, যখন আমি সত্য জানবার জন্য ঈশ্বরকে খুঁজেছিলাম ...হ্যাঁ!...সত্য! হ্যারল্ড বললো—আমি তোর সব কথা বুঝতে পারলাম না। ঈশ্বর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, আর অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করুন।

হ্যারল্ড চলে যাবার পর আমি খানিকটা বিচলিত হয়েই ঘরে পায়চারি করতে লাগলাম। ভাবছিলাম যা চিন্তা করি তাই কি প্রকাশ করতে পারলাম? এমন সময়ে মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো,—যাক, তোমার বন্ধু শেষ পর্যন্ত গেছে। উঃ! তোমাকে এখন ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল।

ওকে আমার দুবাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরেও এই প্রথমবার আমার ভয় হলো যে ওর ভালোবাসাও হয়তো একদিন আমাকে ক্লান্ত করতে পারে। হ্যারল্ড চলে যাবার পর, অন্তত একঘণ্টা আমি একা থাকতে চেয়েছিলাম। ওর উপস্থিতি আমায় বিচলিত করেছিল। চাইছিলাম আমার বোধশক্তি, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি এক পারম্পর্যে স্থাপন করতে।

কিন্তু বুঝতে পারলাম ও এতক্ষণ নজর রাখছিল কখন আমার বন্ধু চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে আমার বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মনে হচ্ছিল আমার নিজস্ব সত্তার একটা অংশ আমি যেন বিকিয়ে দিয়েছি। একথা ঠিক, মৈত্রেয়ীর কাছে নিজেকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছিলাম, তার থেকে কখনই দূরে থাকিনি। ওর স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করেছে আমার নিদ্রার প্রান্ত অবধি। কিন্তু আমার একটা নিজস্ব নির্জনতারও প্রয়োজন আছে, যা ও কখনোই অনুভব করতে পারতো না। কেন এক প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের মানসিক অবস্থা কল্পনা করতে অক্ষম হবে?

ওকে জড়িয়ে ধরে ওর সুগন্ধি চুলে আমি ধীরে ধীরে আমার ঠোঁট দুটি স্পর্শ করলাম। এমন সময় হঠাৎই খোকা এসে ঘরে ঢুকলো আর আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর যাবার সময় বলে গেল, —মাপ করবেন!

১১.

বাড়ি ফিরে এসে দেখি টেবিলের ওপর একটা চিরকুট। তাতে লেখা—লাইব্রেরিতে এসো।

মৈত্রেয়ী আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বেশ ভয়-মাখানো কণ্ঠস্বরে বললো,—খোকা বোধ হয় সব জেনে গেছে।

আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম। ওর হাতের মধ্যে আমার দুটো হাত চেপে ধরে ও এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার ওই শান্তভাবের মধ্যে ও যেন খুঁজছিল একান্ত নির্ভরতা।

—বাবাকে কিছু জানানোর আগে আমাদের দুজনের কাছে দুজনের একাত্ম হওয়াটা জরুরী। বাবা অসুস্থ। এসব কথা জানালে উনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

—একথা উঠছে কেন? আমরা কি অনেক আগে থেকেই পরস্পরের কাছে একাত্ম নই? তুমি আমাকে মালা দিয়েছো। আর আমি তোমাকে আবদ্ধ করেছি আমার বুকের মধ্যে।

—হ্যাঁ ঠিকই। কিন্তু কী জানো, আমাদের দুজনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস আর নির্ভরতা জোরদার না করলে যদি কিছু নিন্দা হয়, তার মুখোমুখি আমরা দাঁড়াতে পারবো না। আমাদের ছন্দপতন হবে।

ও ভয়ার্ত চোখে চারপাশ দেখছিল। মৈত্রেয়ীর ইচ্ছা, আসক্তি এবং কৌলীন্যের সংঘাতকে উপলব্ধি করছিলাম। আর কত ঈশ্বরকে ডাকবো, আমাদের ভাগ্য সুনিশ্চিত করার জন্য। মৈত্রেয়ী বললো,—তোমার আংটির পাথরটা আমি নিজে পছন্দ করেছি। মৈত্রেয়ী শাড়ির আঁচলের কোণে বাঁধা গিঁট খুলে একটা লম্বাটে বস্তু দেখালো। সেটা ছিল গাঢ় সবুজ আর লাল রঙ দিয়ে তৈরি একটা প্যাটার্ন। এটা ও আমাকে বোঝালো। হিন্দু বিবাহরীতি অনুযায়ী ওটা সোনা আর লোহা দিয়ে তৈরি। দুটো সাপ যেন পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। একটা লোহার রঙের, অপরটি সোনালী। প্রথমটা পৌরুষের, আর দ্বিতীয়টা নারীত্বের প্রতীক। মিসেস সেনের সিন্দুকের মধ্যে পারিবারিক গয়নার বাক্সে একগাদা গয়নার মধ্যে থেকে ও এটা বেছে নিয়েছে। মায়ের অজান্তে ও এটা নিয়ে এসেছিল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল কেন! পরে অবশ্য উত্তরটা পেয়ে গিয়েছিলাম। ও ভয় পাচ্ছিল, খ্রীস্টীয় অনুশাসন অর্থাৎ নৈতিকতার মাপকাঠিতে যেটা পাপ, সেই পাপের মধ্যে আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি না তো? সেজন্যেই, ওর মতে, একটা বন্ধন

দরকার। ঐ দিয়ে যে আংটি গড়া হবে, সেই আংটি সেই বন্ধনের প্রতীক হতে পারে। যদিও, আমি জানি পারস্পরিক বন্ধন বা চুক্তি কিছুই এর ওপর নির্ভর করে না। তবে সামাজিকতা অন্য জিনিস। সেদিক থেকে বিচার করে বিবাহিত মেয়েদের হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় একটা সোনা আর লোহায় জড়ানো বালা। যেহেতু কুমারী অবস্থায় মৈত্রেয়ীর তা পরার সাহস ছিল না, তাই আমার হাতেই..

ও অনেক ধর্মীয় অন্য ধরনের কথা বলছিল সেই সন্ধ্যায়। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। কিন্তু ওর ওই অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ এবং আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর একদিকে, আর অন্যদিকে আমার মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যে সহজ সরল সম্পর্কের যে ধারণা এ-দুয়ের মধ্যে দেখা দিলো বিরোধ। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ভালোবাসাকে একটা নিয়মাবদ্ধ প্রতীকের কাছে সমর্পণ করায় আমার মন সায় দিচ্ছিল না।

স্বর্ণকার যেদিন আংটিটা তৈরি করে নিয়ে এলো, আমি তা পরার আগে উল্টে পাল্টে দেখলাম ছেলেমানুষের মতো। বাড়ির কেউ ওয়াকিবহাল ছিল না, শুধু লীলু ও ঋতু আমার বিয়ে নিয়ে এ ব্যাপারে একজন ভারতীয়র সঙ্গে কথা বলেছিল। কিন্তু সবটাই ঘটেছিল সাধারণ হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে। ইঞ্জিনিয়ার তখনও অসুস্থ ছিলেন। উনি ছুটি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন এবং মিসেস সেনের ওঁকে শুশ্রূষা করা ছাড়া অন্য কোনও কাজ ছিল না।

পরের দিন মৈত্রেয়ী খুব ক্লান্তির ভান করছিল। ঘণ্টাখানেকের জন্য লেকের ধারে ঘুরে আসবার জন্য ও একটা গাড়ি চাইলো। গাড়ির কথা শুনে ছবু আমাদের সঙ্গে যেতে চাইলো। কিছুদিন ধরেই ছবুর শরীর মন ভালো যাচ্ছিল না, সারাক্ষণই চুপচাপ থাকতো। খুব কম কথা বলতো। আর একদৃষ্টিতে শূন্যে তাকিয়ে থাকতো, অথবা সঙ্গতিহীন গান গাইতো। মিসেস সেন ওকে ছাড়লেন না।—আমাদের সঙ্গে দিলেন খোকার এক বোনকে। মেয়েটি বিধবা, খুব শান্ত প্রকৃতির। কাজ করতো ক্রীতদাসীর মতো। কোনোদিন গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্য যে হবে তা বোধহয় সে ভাবতেই পারতো না। বেরোবার সময় আমি ড্রাইভারের পাশে বসলাম আর ওরা দুই তরুণী বসলো পিছনের সিটে। লেকে পৌঁছে বিধবা মেয়েটি গাড়িতেই বসে রইল। গাড়িটা রইলো রাস্তার কাছে, একটা বিরাট ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের তলায়। ড্রাইভার গেল লেমনেড খুঁজতে, আমি আর মৈত্রেয়ী গেলাম জলের ধারে।

কলকাতা বেড়াবার জায়গার আমার সব চেয়ে ভালো লাগতো লেকের

ধারটা। কারণ শহরটা ক্রমশ হয়ে উঠছিল একটা মানুষের জঙ্গল। শান্ত, বিশাল জলাশয়ের ওপর উড়ে আসতো ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। আমি জানতাম ওই লেকের ওপারেই আছে রেললাইন, অপর প্রান্তে রয়েছে শহরতলী। তবু আমার সদ্য গজিয়ে ওঠা গাছপালা দেখে মনে হতো, নিজের নিজের অস্তিত্ব আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ওরা বুঝি পাল্লা দিতে চাইছে পুরনো বড় বড় গাছের সঙ্গে। দু-একটা আলোর ব্যবস্থা তখন সবে মাত্র হয়েছে, তাই রাত্রি এখানে ছিল অনেক নিবিড়। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এই অঞ্চলটা আমায় ফিরিয়ে দিতো আমার প্রথম কর্মজীবনের স্মৃতির স্নিগ্ধতা।

আমরা একটা ঘন গাছের কাছে এসে থামলাম। মৈত্রেয়ী আমার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে রইলো, বললো, অ্যালেন, আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত।

মৈত্রেয়ীর দৃষ্টি ছিল দূরে, জলের দিকে। ঐ রকম নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রেক্ষাপট ছিল এমন যেন মধ্যযুগীয় কোনো প্রেমের দৃশ্য উন্মোচিত হচ্ছে। মৈত্রেয়ী যেন জল, তারা-ভরা আকাশ, অরণ্য আর মাটিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিল। ঘাসের ওপর ভর দিয়ে ও বসে ছিল। হাতে ধরা ছিল আংটিটা। সেই অবস্থায় মৈত্রেয়ী প্রতিজ্ঞার বাণী উচ্চারণ করলো ঃ

মা বসুমতী, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি অ্যালেনের হবো। আমি ওকে নির্ভর করেই বর্ধিত হবো, যেমন ঘাস তোমার ওপর নির্ভর করে বর্ধিত হয়। যেমন তুমি বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকো, তেমনি আমি ওর আসার অপেক্ষায় থাকবো। ওর দেহ সত্তা থাকবে আমার জন্য, যেমন তোমার জন্য থাকে সূর্যের আলো। আমি তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমাদের এই মিলন সমৃদ্ধ হবে, কারণ আমি নিজেই স্বাধীন ভাবে ওকে পছন্দ করি। যদি কোনো দুর্ভাগ্য আসে তবে তা যেন ওর ওপর বর্ষিত না হয়ে আমার ওপর বর্ষিত হয়। মা বসুমতী, তুমি শোনো, আমি যেন কোনো মিথ্যার ভাগী না হই। যদি তুমি আমায় ঘনিষ্ঠভাবে ভালোবাসো, যেমন আমি তোমায় বাসি তাহলে এই মুহূর্তে, আমায় এমন শক্তি দাও যেন আমি সব সময় ওকে ভালোবাসতে পারি। আমি ওকে এমন আনন্দ দিতে পারি যা অন্যরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। যেন দিতে পারি একটি সফল জীবন। আমাদের জীবন যেন ঘাসের মতন মসৃণ প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক হয়, যেমন করে তোমার স্নেহে ঘাসের গুচ্ছ বর্ধিত হয়। আমাদের চুম্বন যেন হয় প্রথম দিনের

বর্ষার মতো স্নিগ্ধ। আমার হৃদয় যেন কখনও অ্যালেনের প্রতি ভালোবাসায় ক্লান্ত না হয়, যেমন তুমি কখনও ক্লান্ত হও না। অ্যালেনকে ঈশ্বর জন্ম দিয়েছেন কত দূরে, কিন্তু, আমার আদরিণী মা তুমি, আমাকে নিয়ে এসেছো ওর কত কাছে...

আমি ওর কথা শুনছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত বোধগম্য হচ্ছিল। ও যেন ছোট্ট মেয়ের মতো আধো আধো বাংলা বলছিল। ও যে কী বলতে চায়, আমি সঠিক অনুধাবন করতে পারছিলাম না। যখন ও চুপ করলো, আমার ভয় হচ্ছিল ওকে স্পর্শ করতে, ও এতখানিই তন্ময় হয়ে বসে ছিল। আমি ওর কাছে হাঁটু গেড়ে বসলাম, একটা হাত মাটির ওপর রেখে। ও-ই প্রথম কথা বললো, আমাদের এখন থেকে আর কেউ আলাদা করতে পারবে না, অ্যালেন। এখন আমি তোমার, সম্পূর্ণ তোমার।

ওর প্রতি অনুরাগে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, মনে মনে খুঁজছিলাম এমন কথা, যা কোনো দিন বলা হয়নি। কিন্তু কিছুই নতুন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এমন কোনো শব্দই খুঁজে পাইনি, যা আমার অন্তরের উত্তেজনা প্রশমন করতে পারে। ওর আচরণে এমন একটা অদ্ভুত নিশ্চয়তা ছিল, যা আমার আজও মনে আছে।

একদিন তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীরূপে বরণ করবে, এবং তুমি আমাকে সেই মুক্তির জগৎ দেখাবে, তাই না?

ও ইংরেজীতে এই রকম কিছু কথা বলেছিল। আরো কিছু স্থূল জাতীয় কথা বলার জন্য ওকে খুব লজ্জিত দেখাচ্ছিল।

—আমি একদম বাজে ইংরেজী বলি, না অ্যালেন! কী জানি কী বাজে কথা ভাবছো আমার সম্বন্ধে। আমি বলতে চাই, এই জগৎ এই পৃথিবীকে আমি তোমার সঙ্গে দেখতে চাই, দেখতে চাই এমন ভাবে, ঠিক যে-ভাবে তুমি এই জগৎকে দেখো। পৃথিবীটা কত বড়, আর কত সুন্দর, তাই না? কেন আমাদের চারদিকে লোকেরা এত যুদ্ধ করে? এত দাঙ্গাহাঙ্গামা করে? আমি চাই অনুভব করতে। আমি চাই, সবাই আনন্দে থাকুক।... কিন্তু না, আমি বোধহয় অর্থহীন কথা বলছি। আমি জগৎটাকে যেমন ভাবি, সেটা কি তেমনই! যেমন করে ভাবি!.....

বলে ও হাসতে লাগলো। গত শীতে মৈত্রেয়ীকে যেমন দেখেছিলাম, এখনও সেই রকমই দেখলাম। নিষ্পাপ, চমকপ্রদ। অনর্গল কথা বলছে। আপাতবিরোধী, কিন্তু সত্য-বিরোধী নয়। এমন সব কথায় ও অপার আনন্দ

লাভ করছে। সেই সব অভিজ্ঞতার চিহ্ন, যা ওকে অযথা বিভ্রান্ত করেছে, মনে হচ্ছিল সে সব যেন মুছে গেছে!

বুঝতে পারছিলাম যে, আমাদের ভালোবাসার বন্ধনই ওকে শান্ত ও তৃপ্ত করেছে, অবাধ সুখানুভূতি দিয়েছে। যখন আমাদের মিলনবন্ধন ওর মনে স্বীকৃত এবং গৃহীত হলো, তখন যেন ওর সব ভয় চলে গেল।

রাত্রি হয়ে আসছিল, তাই আমরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে ফিরে এলাম। এইবার, এই প্রথমবার আমি মৈত্রেয়ীকে আলিঙ্গন বা চুম্বন কিছুই করিনি। অসামান্য এক পবিত্র অনুভূতি আমায় আচ্ছন্ন করেছিল। শালটাকে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে গাড়িতে বসে আমাদের সঙ্গিনী ঝিমোচ্ছিল। সে আমাদের দিকে দেখলো যেন আমাদের দুষ্কর্মে সহযোগিতার আনন্দ নিয়ে। আমরা এগোচ্ছিলাম ধীরে ধীরে। আমি মৈত্রেয়ীর থেকে কিছু বড়। ও কিছু ছোট, কিন্তু অসামান্য সুন্দরী। ওর মুখশ্রী সৌজন্যপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও জয়ের আনন্দের দৃপ্ত ছাপ ওর প্রত্যেকটা ভঙ্গিতে!

অনেক পরে আমি মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে জেনেছিলাম, খোকার এই বোনই প্রথম যাকে জানানো হয়েছিল আমাদের প্রেমের কথা এবং সে যতটা সম্ভব তা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিল। এই মেয়েটি একটি অপদার্থ ব্যক্তিকে বিয়ে করে দারুণ কষ্ট পেয়েছে। বিয়ে করেছিল দশ বছর বয়সে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে সে আগে কোনোদিন দেখেনি, তাকে সে দারুণ ভয় করতো। ঐ ব্যক্তিটি তাকে নৃশংসভাবে বলাৎকার করেছিল, এবং প্রতি রাত্রে তার কামোচ্ছ্বাসের আগে ও পরে মেয়েটিকে মারধোর করতো। এই মেয়েটি সব সময় মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়েছে জাত-ধর্মের নিয়মের প্রতি ভয় না পেতে এবং সব রকম প্রতিরোধের বিরুদ্ধেও আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। সে ছিল আমার পরম মিত্র এবং মৈত্রেয়ীর সব চাইতে বিশ্বস্ত ও ভালো বন্ধু। তবু ওকে আমি খুব কমই দেখেছি এবং দৈবাৎ ওর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি জানি না ওর নাম কী। আমি আমার ডায়েরি অনেকবার পড়েছি, ওর নামটা আবিষ্কার করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাইনি।

সেই রাত্রেই ছবু খবুই অসুস্থ হয়ে পড়লো। মিসেস সেন ওকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়ালেন। কেউ বুঝতে পারছিল না তার কি হচ্ছিল। লক্ষণগুলো ছিল অদ্ভুত; ও সব সময় চাইছিল জানলা বা বারান্দায় ঝুঁকে থাকতে। ওর বিশ্বাস ছিল ও নিচে কাউকে দেখতে পাবেই, রাস্তার ওপর, যে ওকে ইশারা করে ডাকছে।

সারা দিনের এইসব ঘটনার পর কিছুটা ক্লান্ত হয়েই আমি শুয়ে পড়েছিলাম। আমার নানান অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার কথা—জলের ধারে ঘুরে বেড়ানো, রাজহাঁস, জোনাকি...কারণ আমার মন ছিল খুব বিহ্বল। ঠিক সেই সময় আমার দরজায় করাঘাত শুনে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কে? কেউ উত্তর দিলো না। স্বীকার করছি, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এবং আলোও জ্বেলেছিলাম। দরজা খুলে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজায় মৈত্রেয়ী। ও দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। পা খালি, যাতে আওয়াজ না হয় এবং পরনে হালকা সবুজ রংয়ের শাড়ি। আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করবো।

—আলোটা নিভিয়ে দাও, আমার ঘরে ঢুকে খুব নিচু গলায় বললো। তারপর আমার আরামকেদারার পিছনে গিয়ে লুকোলো, মনে ভয়, যদি ওকে কেউ বাইরে থেকে দেখে ফেলে থাকে।

আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বোকার মত জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে মৈত্রেয়ী? এত রাত্রে?

ও কোনো উত্তর দিলো না। চোখ বন্ধ করে, ঠোঁট চেপে ধরে, ও খুব কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। আমার সামনেই মৈত্রেয়ী নিরাবরণ হলো। অল্প আলোর দীপ্তিতে স্নান করে আমার ঘর আলোকিত করছিল ওর শরীর। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। প্রায়ই আমি আমাদের প্রথম প্রেমের রাত্রির স্বপ্ন দেখতাম, দেখবো বলে বিশ্বাস করতাম সেই শয্যা, যেখানে আমি ওকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখবো, জানবো, কিন্তু কোনোদিনই মৈত্রেয়ীর যৌবনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাকৃত-নগ্ন দেহের কল্পনা করিনি। আমার সামনে সেই রাত্রি উপস্থিত। অন্য কোনো পরিবেশে হয়ত আমাদের মিলন হবে, এরকমই মনে হতো। কিন্তু ওর ঐ স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্ম আমার সব দুরাশাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। ওর চোখে আকুল আহ্বান। আমি খুব আলতো ভাবে ওকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলাম। ওর ঊর্ধ্বাংশ ছিল নগ্ন। ওর সারা শরীর ছুঁয়ে আমার হাত ওর নিতম্ব স্পর্শ করলো। কোমরে ওর শাড়িটা খসে পড়লো পায়ের কাছে। পবিত্রকে অপবিত্র করার জন্য প্রবল প্রক্ষোভে আমি কাঁপছিলাম। ওর সামনে আমি নতজানু হয়ে বসলাম। ওর মূর্তি আমার কাছে এক অকল্পনীয় সৌন্দর্য নিয়ে এসেছিল। ও দু হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। এক দিকে অজানাকে জানার অনির্বচনীয় আনন্দ, অপর দিকে সংস্কারাবদ্ধ মনের শুচিতাবোধ ও ভয়, এই দুই-এর দ্বন্দ্ব তখন ওর চোখে মুখে। অবশেষে ও ভয় ও অসহায়তাকে জয়

করতে সক্ষম হলো। ওর সমস্ত শরীরে তখন এক নতুন ছন্দ। আমার বিছানায় শোবার জন্যে ওকে আমি সাহায্য করতে গেলাম। ও প্রত্যাখ্যান করে নিজেই আমার বালিশে চুমু খেতে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই ওকে আমার সাদা সুজনীর ওপর ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম একটা প্রাণবন্ত ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন। ও কাঁপছিল, রুদ্ধশ্বাসে বার বার আমার নাম ধরে ডাকছিল। আমি জানলার খড়খড়িগুলো নামিয়ে দিলাম। রাত্রি নেমে এলো আমাদের ঘরে। ..... পরে আমার আর কিছুই মনে নেই। ভোরের দিকে ও উঠে পড়লো। বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলে দিলাম। ও সরলভাবে বললো—আমাদের এই মিলন ঈশ্বর-নির্দেশিত। তুমি দেখছো না, আজকে ছবু আমার সঙ্গে শোয়নি?

যে সিঁড়িটা ওর ঘরের দিকে গেছে, সেখানে আমি ওর পায়ের আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না।

সকালবেলা মৈত্রেয়ীই আমাকে চায়ের জন্য খুঁজতে এলো। ও বাগানের ফুল নিয়ে এসেছিল। ফুলগুলো ফুলদানিতে যখন ও সাজিয়ে দিচ্ছিল, ওর মুখের বিবর্ণতা আমাকে আঘাত করছিল। চুলগুলো অগোছালো হয়ে ওর ঘাড় ঢেকেছিল। পরে ও বলেছিল, আমি ওর চুলগুলো এমন বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিলাম যে ও আর গুছোতে পারেনি। ওর ঠোঁটে ছিল কামড়ানোর গাঢ় লাল দাগ। আমি চূড়ান্ত স্বর্গসুখ নিয়ে আমাদের প্রথম রাত্রির মিলন চিহ্নগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলাম। মৈত্রেয়ী ছিল উজ্জ্বল সুন্দরী। ও বলেছিল, ওর সমস্ত শরীর সেদিন পুরোপুরি জেগে উঠেছিল। বলেছিল যে ছবুর জন্য ও ভীষণই উদ্বিগ্ন ছিল, সেজন্য সারা রাত্রি ঘুমোতে পারেনি। একদিকে বাবার অসুখ, তার ওপর আবার ছবুর এই অবস্থা ওকে প্রচণ্ড মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছিল।

দিনটা যে কী ভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। নরেন্দ্র সেনের বদলী যিনি কাজ করছিলেন, তাঁর সঙ্গে সারা দিন ব্যস্ত রইলাম। ফিরে এসে দেখতে পেলাম মৈত্রেয়ী বারান্দার তলায় ডাকবাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে চুল আঁটবার বাঁকানো পিন দিয়ে তৈরি এবং পাথরের মতন বোতাম দেওয়া একটা আংটি দেখালো যা ওর আঙুলে পরা ছিল।

—রাত্রে তোমার দরজা বন্ধ রেখো না।—এ কথা বলেই মৈত্রেয়ী চলে গেল। প্রায় মধ্য রাত্রে ও এলো। কিন্তু এবার আর ও ভয় পাচ্ছিল না। ও আমাকে

জড়িয়ে ধরে হাসছিল। আমি আনন্দ পাচ্ছিলাম এই দেখে যে ভুল যা হয়েছে তার জন্য ও বিষণ্ন বা অনুতপ্ত ছিল না। আন্তরিক ছিল ওর আঁকড়ে ধরা, আকুলতা ছিল ওর আহ্বানে, এবং চমৎকার ছিল ওর সোহাগ। প্রথম থেকেই ওর মিলনের সহজ জ্ঞান দেখে আমি অবাক্ হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে কিছুই আর ওকে সঙ্কুচিত করছিল না, যদিও ও সব রকম অশালীনতা থেকে বিরত ছিল। এই অল্পবয়সী মেয়েটি ভালোবাসা সম্পর্কে কিছুই জানতো না আবার তাকে ভয়ও পেতো না। কোনও আশ্লেষ সোহাগই তাকে ক্লান্ত করছিল না, আমার পুরুষালী কোনো আচরণই ওকে নিরুৎসাহ করছিল না। বরং মিলনে ওর সবরকম সাহস ও সমর্পণ ছিল। প্রত্যেকটি উদ্যমের মধ্যেই ও পূর্ণ আনন্দ পেত এবং না জানাতো বিরক্তি, না শ্রান্তি। কাঁদতো দুঃখে ও মিলন মুহূর্তের চরম আনন্দে। গান গাইতো পরে, ঘর জুড়ে নাচতো ওর ঈশ্বরীয় হাল্কা ও নমনীয় পা দিয়ে! ও এমন ভালোবাসার প্রকাশ উদ্‌ঘাটন করতো যে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম। ওর আঁকড়ে ধরার সুনির্দিষ্টতা, ওর দেহে মরালীর মত ঘনঘন পরিবর্তনের ছন্দ আমাকে বিহ্বল করতো। ওকে প্রত্যেক মুহূর্তে দেখাতো আরও দুঃসাহসী। ওর আদরে আদরে আমি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। ও এমন নিখুঁতভাবে আমার শরীরের ইচ্ছাগুলোকে উপলব্ধি করতো, যা প্রথমদিকে আমাকে অস্থির করতো। ও জানতো, ঠিক কোন্ সময়ে আমি ওর কাছে থাকতে চাইবো। আমি একটা ছোট্ট বেড ল্যাম্প যোগাড় করেছিলাম। ওটাকে আরামকেদারার পেছনে রেখে মৈত্রেয়ীর শাল দিয়ে ঢেকে রাখতাম। ঐ অবনমিত আলোয় ব্রোঞ্জের দেহটা একটা বর্ণালী নকশার রূপ নিতো। ও বেশিক্ষণ অন্ধকার সহ্য করতে পারতো না।

আমি অবাক্ হয়ে ভাবতাম ও কখন ভালো করে ঘুমোতো! রোজ ভোর হলেই চলে যেতো। দু-তিন ঘণ্টা ধরে ধ্যান করতো। পরের দিন আমার অফিসে বসে পড়ার জন্য লিখতো কবিতা ও চিঠি আর তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতো আমাদের অকুণ্ঠ প্রণয়। সকালে চা ওই করতো। সকালবেলা আমার দরজায় ধাক্কা দিয়ে জাগাতো। যদি বাথরুমে আমার দেরি হতো, ও আমার উপর গজগজ করতো একটা বাচ্চার মতন। ভান করতো বয়স্কা মায়ের মতন। একটা পরম আত্মীয়সুলভ কণ্ঠস্বর যা প্রথম প্রথম আমার বিরক্তি উৎপাদন করতো। আমি চাইতাম ও প্রণয়পূর্ণ হোক—প্রিয়া হোক। কিন্তু পরে ও আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি ওর ভালোবাসার গভীরতা ও তার বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ আবিষ্কার করেছিলাম, যা আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। এই ভালোবাসার

সুখানুভূতি না জেনেই আমি সেই ভালোবাসাকে কত না অবহেলা ও অশ্রদ্ধা করেছি!

প্রত্যেকদিন দুপুরের পর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। আমার নতুন উপরওয়ালা আমাকে যখন তখন অপমান করতো। আর অশালীন ভাবে হুকুম দিতো। ভদ্রলোক একজন সদ্য আমেরিকা-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার—ভারতীয় ট্র্যাডিশনের এক বড় নিন্দুক ও শত্রু। বাঙালী অথচ ইওরোপীয়ান পোশাক পরা। এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ। খোকা নিঃসন্দেহে আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—তোমাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কেন তুমি জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে ঘুমোও?

খোকার এই প্রশ্ন আমাকে কতকগুলো জিনিস বুঝিয়ে দিয়েছিল। প্রথমত, খোকা অত্যন্ত বিদ্বেষ ও হিংসা নিয়ে আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতো। মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ী যে প্রায় রাত্রে আমার ঘরে আসে, সে ব্যাপারটা খোকা সন্দেহ ও লক্ষ্য করে। আমি ক্রমশ ভীত হয়ে পড়েছিলাম, সে যদি আমাদের বিরুদ্ধে সব জানিয়ে দেয়! তাই সিগারেট কিনে দিয়ে বা বই পড়তে দিয়ে ওর প্রতি আমি দারুণ সহানুভূতি দেখাতাম। ও ছিল বুদ্ধিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলে। ও ভারতীয় সিনেমা কোম্পানিদের জন্য চিত্রনাট্য লিখতো, অবশ্য তা নিত্যই প্রত্যাখ্যাত হতো।

ছবুর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। প্রথমে ভারতীয় ডাক্তাররা ও পরে নামী ইংরেজ ডাক্তাররাও কিছুই বলতে পারছিলেন না। কেউ কেউ ভাবছিলেন ও বোধ হয় উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। অন্যেরা ভাবছিলো ওর হিস্টিরিয়া হয়েছে। মিসেস সেনের পাশের একটা ছোট্ট ঘরে ছবু থাকতো। খুব কম কথা বলতো আর যেটুকু বলতো তা শুধু রবি ঠাকুর-সম্পর্কে, অথবা সেই রাস্তা সম্পর্কে যেটা মৈত্রেয়ীর ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যেতো। ওকে যদি একা থাকতে দেওয়া হতো তাহলে ও বারান্দায় চলে যেতো রাস্তা দেখতে। তখন ও গান গাইতো। অথবা হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করতো বা কাঁদতো। লীলু এবং খোকার বোন ওকে সব সময় পাহারা দিতো। খুব আশ্চর্য যে ও শুধু মৈত্রেয়ীকে এবং আমাকে চিনতে পারতো, আর কখনো কখনো নিজের মাকে। আমি ভাবতাম কী করে মিসেস সেন চুপচাপ আর হাসিমুখে থাকতেন!—ওঁর স্বামী চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, মেয়েটা পাগল হয়ে যাচ্ছিল অথচ কী করে উনি এই বড় বাড়িতে সব লক্ষ্য রাখতেন, আমাদের প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর দিতেন, আমাদের চা থেকে শুরু করে দুবেলা খাবারের বন্দোবস্ত

করতেন নির্দিষ্ট সময়েই! এইরকম একটা সময়ে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার রাত কাটানোর জন্য আমি নিজেকে দোষারোপ করতাম। আমি যেন অধৈর্যভাবে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যেদিন মিসেস সেন আমাদের এই পাগলামীর কথা জানতে পারবেন এবং আমাদের ক্ষমাও করবেন। একটা কারণে আমার পুরী যাওয়াটা পিছিয়ে গিয়েছিল। আমার উপরওয়ালা ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া মৈত্রেয়ী আমার যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিল আর সব থেকে বড়ো কথা, মিসেস সেন, আমার জন্য ভয় পেতেন। রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে রক্ত ঝরাচ্ছিল দক্ষিণ বঙ্গে।

ছবু একদিন আমার আংটিটা দেখতে চেয়ে ওটা চেয়ে বসলো। আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমি মৈত্রেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কখনই ওটা হাত থেকে খুলবো না। কাজেই এ ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর সম্মতির প্রয়োজন ছিল, আবার ওদিকে ছবুও আংটিটার জন্যে কাঁদছিল, একটানা বায়না করছিল ওটার জন্য। যখন আংটি ও পেল তখন সেটা একটা রুমাল দিয়ে বেঁধে গলায় জড়িয়ে রাখলো। আমি জানি না ওকে কী আকর্ষণ করেছিল। ও ওটাকে একভাবে আঙুলের মধ্যে ঘোরাচ্ছিল, উল্টে দেখবার চেষ্টা করছিল।

ডাক্তারী চিকিৎসায় ওর কিছুমাত্র পাগলামী সারলো না। তুকতাক জানে এমন এক লোককে একদিন ডাকা হলো। এক অল্পবয়সী মেয়ের এক বুড়ো কাকাকে ডাকা হলো। তিনি সারাদিন ধরে বিষ্ণুস্তোত্র পাঠ করে গেলেন এক অদ্ভুত সুরে যা শুনলে মনে হয় আমাদের সব উৎসাহ যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, মন ভরে যাচ্ছে বিষণ্ণতায়। বাড়ির সবাই এসেছিল শুনতে। নরেন্দ্র সেন একটা লম্বা চেয়ারের ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিলেন, মাথার তলায় একটা কুশন, চোখে কালো চশমা। মন্টু, খোকা আর আমি ছিলাম মাটিতে বসে মেয়েদের সঙ্গে। আমি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। মানসিক আবেগ আমাদের সবাইকেই পেয়ে বসেছিল। এমন কী ইঞ্জিনিয়ার নিজেও কাঁদছিলেন সেই বেদনায়। মৈত্রেয়ী ওর শালের মধ্যে মুখ লুকিয়ে চোখের জল ফেলছিল। যে সমবেত আবেগ মনকে অভিভূত করে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আমি কিছুক্ষণ পরে ঐ জায়গা ছেড়ে চলে গেলাম। একাই ঘরে রইলাম, কিন্তু কোনো কাজই করতে পারলাম না। কীর্তনের করুণ সুর সমস্ত বাড়ি পেরিয়ে এসে আমার কানে বাজছিল। একটানা সেই সুর তখনও আমার একাকিত্বের বেদনা যেন বাড়িয়ে দিচ্ছিলো।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্য আর এক ভাবেও ছবির মনকে শান্ত করার চেষ্টা

করেছিলেন। প্রচলিত এক টোটকা ওষুধ উনি সঙ্গে করে এনে ছিলেন। সেটা কোনো একজাতের লতা পাতা আর মধু দিয়ে তৈরি একধরনের লেই। ওটাকে মাথার একদম ওপরে চামড়ার ওপর লাগিয়ে দিতে হবে। আমার মনে হলো এরকম এক বিপর্যয়ের মুহূর্তে আমার এগিয়ে এসে সাহায্য করা উচিত। কারোরই সাহস হয়নি ছবুর চুল কেটে দেবার। আমার ওপরেই সেই দায়িত্ব এলো। ছবু এসব কিছুই বুঝতে পারছিল না। আমি ওর সামনের দিকে গিয়ে সোজা ওর দিকে তাকিয়ে চুলগুলো কাঁচি দিয়ে এলোপাথাড়ি কাটতে লাগলাম। অনর্গল ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম, যাতে কাঁচির আওয়াজ ও না শুনতে পায়। বিছানার মাথার কাছে পিছন দিকে মৈত্রেয়ী চুলের গুচ্ছগুলো হাতে ধরছিল, আর সেগুলো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখছিল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই মাথার তালুটা পরিষ্কার করে দিলাম, আর মিসেস সেন সেইখানে সেই গরম লেই ঢেলে দিলেন। ছবু আমাদের দেখলো। মাথার তালুটা অনুভব করার চেষ্টা করলো, তারপরে সেই আংটি বাঁধা রুমালটা গলা থেকে খুলে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। চোখের জল অঝোরে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ওর সুন্দর শ্যামবর্ণ মুখের ওপর দিয়ে। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল না বা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল না, যদিও ও বুঝতে পেরেছিল যে ও অর্ধেক ন্যাড়া হয়ে গিয়েছে। ওর হঠাৎ হঠাৎ এই ধরনের মানসিক আক্রমণ হতো বিশেষ করে যখন ও চাইতো উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে, আর তাতে কেউ বাধা দিলে।

যাই হোক, দিনগুলো অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে কাটছিল। অফিস থেকে ফিরে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতাম মিঃ সেন আর ছবুর খবর নেবার জন্যে। তারপরে স্নান করে, খেয়ে আবার ওপরে উঠে আসতাম ছোট্ট মেয়েটার বিছানার পাশে বসে থাকবার জন্য। ও প্রায়ই বিকারগ্রস্ত অবস্থায় আমায় ডাকতো। আর আমি কাছে এলেই কিছুটা শান্ত হতো।

এর মধ্যেও সব রাত্রি আমি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কাটাতাম। সে নিজেকে পাগলের মতো আমার কাছে সঁপে দিয়েছিল। বাড়ির এই সব ঘটনায় ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে এসে ও যেন কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেতো। সকাল বেলা যখন ঘুম থেকে উঠতাম, তখন শরীর শ্রান্ত ও মনে বর্ণনাতীত ভয়। নরেন্দ্র সেন দিন দিন চোখ অপারেশনের তারিখ পিছিয়ে দিচ্ছিলেন আর ডাক্তাররা ওঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যে দুঃখ ও ভীতির ঝড় বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তা তাঁর অবস্থার উন্নতির পক্ষে সহায়ক ছিল না। আমিও ভয় পাচ্ছিলাম, সামান্য একটু

অসতর্কতায় আমাদের সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। মৈত্রেয়ীও উদ্বিগ্ন হতো। ও রাতে যখন আমার ঘরে আসতো, সবাই তখনও ঘুমিয়ে পড়তো না। ছবুর ঘরের মধ্যেই ও আমার হাত জড়িয়ে ধরতো, আমার ঘাড়ে ওর দেহের সমস্ত ভা'র দিয়ে ভর দিতো। হাতে চুম্বন করতো। একটু খেয়াল করলে যে কেউই সব বুঝতে পারতো।

খোকার নজর আমরা এড়াতে পারিনি। লীলু এবং মন্টু অবশ্য সন্দেহ করতো যে আমাদের একটা যোগাযোগ আছে, কিন্তু কখনই ভাবতে পারেনি, আমরা প্রেমিক প্রেমিকা এবং এতখানি এগিয়ে গেছি।

মৈত্রেয়ী মাঝে মাঝে এমন একটা আচরণ করে ফেলতো যা আমাকে আতঙ্কজনক আবস্থায় ফেলতো। মৈত্রেয়ীর আগে বেরিবেরি হয়েছিল। তাই সন্ধের দিকে ওর পা ফুলতো, আর সেজন্য ডাক্তাররা ওকে মাঝে মাঝে ম্যাসাজ নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সকালবেলায় লীলু অথবা খোকার বোনেরা ওকে বিবস্ত্র করে, ওর সারা শরীরে একরকম দুর্গন্ধযুক্ত তেল মালিশ করতো। এই গন্ধ অনেক ধোওয়ার পরেও গা থেকে ওঠানো কঠিন হতো। মৈত্রেয়ী মাঝে মাঝে হঠাৎই যন্ত্রণা বোধ করতো। আর তখনই সঙ্গে সঙ্গে মালিশের প্রয়োজন হতো। তখন অবশ্য পায়ে মালিশ করলেই চলতো আর সে কাজটা খোকাই করতো। মৈত্রেয়ী ওকে ডেকে নিয়ে যেতো নিজের ঘরে। এটা আমি লক্ষ্য করতাম কিন্তু সহ্য করতে পারতাম না।

এই ব্যাপারে মৈত্রেয়ীকে একদিন আমি যা-তা বলেছিলাম। ও আমার দিকে হতবাক্ হয়ে তাকিয়েছিল, তারপর বলেছিল, আমার দ্বারা এই কাজ হবার নয়। নিঃসন্দেহে খোকা একজন পেশাদার অঙ্গ-সংবাহক ছিল না। ওর বয়স আর ওর অকারণ হাসিতে আমি রাগে কাঁপতাম এই ভেবে যে ওর ঐ কালো, লোভী বড় বড় হাতগুলো মৈত্রেয়ীর গা স্পর্শ করছে।

একবার এক সন্ধেবেলা ও খোকাকে ডেকেছিল ভেতরের বারান্দার ওপর থেকে। ও হঠাৎ একটা ছুরির খোঁচায় খুব ব্যথা পেয়েছিল। খোকা উপস্থিত ছিল না তাই ও ড্রাইভারকে ডেকেছিল। আমি প্রায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিলাম ওর এই ত্রুটির জন্য ওকে চাবুক মারবো বলে। কিন্তু আমার নিজের চিন্তায় নিজেই লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম—কিছুক্ষণ পরে অবশ্য বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে গোয়েন্দাগিরি করতে আমার লজ্জা হয়নি। মৈত্রেয়ী তখনও আলো জ্বালায়নি। আমি তিক্ততার সঙ্গে কল্পনা করছিলাম। সেইসব উপন্যাসের মনোরম কাহিনীর প্রসঙ্গে, যেখানে গাড়ির ড্রাইভাররা

তাদের মহিলা-মালিকদের প্রচ্ছন্ন প্রেমিক। চিন্তা করতে লাগলাম মেয়েদের অবিশ্বাসী চরিত্র আর অসততার কথা। হাজার রকমের হীন চিন্তা, যা এতদিন উপেক্ষা করে এসেছি, তা আমার মনকে আক্রমণ করলো। একদিন মৈত্রেয়ীর ঘরে মন্টু ঢুকে চাবি দিয়ে ঘর বন্ধ করে দিলো। তারপর নিচ থেকে আমি ঝগড়া শুনতে পেলাম, সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর চিৎকার। যেন শরীরে শরীরে লড়াই। যখন ওরা বেরিয়ে এলো, তখন মন্টুর মুখ লাল, বন্যতায় ভরা, আর মৈত্রেয়ী মলিন। ওর চুলগুলো অগোছালো হয়ে পাক খেয়ে পিঠের ওপর পড়ে। এটা অবশ্য সত্যি এর অল্প আগেই মৈত্রেয়ী আমায় জানিয়েছিল যে মন্টু একটা ইতর। ও খুব অন্তরঙ্গভাবে মৈত্রেয়ীকে কাছে পেতে চেয়েছিল, আর সেজন্য মৈত্রেয়ী ওকে একটা চড় কষিয়েছিল এবং বাবার কাছে নালিশ করেছিল। কিন্তু নরেন্দ্র সেন তখন অসুস্থ ছিলেন। তাই মন্টু ছিল তখন অপরিহার্য, তাই ওকে বার করে দেওয়া অসম্ভব ছিল।

মনে আছে মৈত্রেয়ী একদিন ওর অন্য আর এক কাকার কথা বলেছিল। সে চেষ্টা করেছিল মৈত্রেয়ীকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করতে। কিন্তু সেইবার হঠাৎ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসে পড়েছিলেন। কাকাকে ওর হঠকারিতার জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছিল এবং চাকরিও খোয়াতে হয়েছিল।

মৈত্রেয়ী প্রায়ই আমার কাছে সেই ইন্দ্রিয়গত উত্তেজনাকে দোষারোপ করতো যা অন্যদের হৃদয়ে ও জাগিয়েছিল। এমনকি যাদের সঙ্গে ওর রক্তের সম্পর্ক আছে তাদেরও। ও চাইছিল ওর চারপাশে অন্য অনুভূতিকে সক্রিয় করতে যা ইন্দ্রিয়গত ইচ্ছার প্রকোপ বৃদ্ধির থেকে অনেক ভালো, পবিত্র।

আমি অন্য আর একটা দৃশ্যও দেখেছিলাম। এক সন্ধেবেলা খোকা অনেকক্ষণ মৈত্রেয়ীকে আটকে রেখেছিল বারান্দার তলায়। মৈত্রেয়ী মানসিক বিপর্যয়ের সঙ্গে টেবিলে একা। খোকার সাহস হয়নি টেবিলে আসার। ... এইসব যা দেখতাম বা শুনতাম, তা আমাকে ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা দিতো। আমার মনে হয়েছিল সবাই মৈত্রেয়ীর দেহকে চায়। আর সেও সবাইকেই প্রশ্রয় দেয়। এই নিয়ে আমি নানা অসম্ভব ব্যাপারের কল্পনা করছিলাম এবং নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছিলাম। আমার হিংসা আমাকে একটুও স্বস্তি দিচ্ছিল না। আমি নিজেকে কিছুতেই এই অসুস্থ ভাবনা থেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না যে মৈত্রেয়ী আরেকজনের বাহুর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে।

সেদিন মৃত্যুবৎ হতাশার মধ্যে বাগান থেকে ফিরে এলাম। রাতের খাবারের সময় চেয়ারের তলায় আমার পা দুটোকে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলাম।

শোবার সময় একটা বড় কাঠের হুড়কো দিয়ে দরজা আটকে রেখেছিলাম ঠিক করে রেখেছিলাম, মৈত্রেয়ীকে কিছুতেই আসতেই দেবো না। ও দরজায় টোকা দিতেই আমি জেগে উঠলাম, কিন্তু এমন ভাব দেখালাম যেন ঘুমিয়েই আছি, এবং কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। ও আরও জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো, আমাকে আরও একটু জোরে ডাকতে লাগলো। আমার ভয় করছিল পাছে কেউ শুনতে পায়, তাই খুলে দিলাম।

—কেন তুমি আমায় ঢুকতে বাধা দিচ্ছো? তুমি আর আমাকে চাও না? —কথাটা বলতে বলতে মৈত্রেয়ীর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, চোখে জল নিয়ে ও কাঁপছিল। ও ঢুকলে আমি আবার দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং দুজনে বিছানায় এসে বসলাম। ওকে জড়িয়ে ধরলাম না, বরং আমার অন্তর্বেদনার কথা ওর কাছে খুলে বললাম। দুহাত দিয়ে ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে আকুল চুম্বনে ঢেকে দিলো, নখ ফুটিয়ে দিলো আমার বুকে, তবু আমি কথা বলেই চলেছিলাম। সেদিন আমি আমার নিদারুণ কষ্টের কথা, যন্ত্রণার কথা চেপে রাখতে পারিনি। আমার সব সন্দেহের কথা আমি বিষের মতো উগ্‌রে দিয়েছিলাম।

—উঃ আমার দুঃখ হচ্ছে যে কেন ও আমাকে বলাৎকার করেনি! সেটাই ভালো ছিলো।—এই বলে সহসা মৈত্রেয়ী কাঁদতে লাগলো।

—তোমার সম্পর্কে, তোমাকে যতখানি জানি—ইন্দ্রিয়গত ও বেপরোয়া —তোমার ড্রাইভারের কাছে ব্যাপারটা খুবই সোজা ছিল।—ঘৃণার চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আমি উত্তর দিলাম।

—তুমি কি সব সময় এই সব অসম্ভব ব্যাপার কল্পনা করে আনন্দ পাও তোমার অতি সাধারণ আর অদ্ভুত নোংরা মন নিয়ে? এই বিকৃতভাব কি অনেক দিন ধরে তোমার মস্তিষ্ক পূর্ণ করে রেখেছে?

আমি উত্তরে উঠে দাঁড়ালাম, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে লাগলাম। ওকে নিষ্ঠুর অপমানে বিদ্ধ করলাম। আমি ওকে দারুণভাবে ঘৃণা করছিলাম, এই কারণে নয় যে ও আমাকে প্রতারণা করেছে। কারণ হলো ও আমাকে ওর ভালোবাসার প্রতি, ওর পবিত্রতার প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়েছে এবং সব কিছু ওকে দিয়ে, ওর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়ে, ওর সব ইচ্ছা আমাতে পরিণত করিয়ে, ফিরিয়ে দিয়েছে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। আমি এই ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম যে নিজেকে সমর্পণ করেছি এমন একজনের কাছে যে আমাকে প্রতারণা করেছে প্রথম থেকেই। সত্যি বলতে কি, আমি

বিশ্বাস করছিলাম না যে ও আমার সঙ্গে সত্যি সত্যি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আমি মৈত্রেয়ীর ভাবগতিক যেন একটা সাধারণ প্রহসন হিসাবেই বিচার করছিলাম। আমাদের বাড়ির মেয়েদের পরিবর্তনশীলতা ও খেয়াল সম্পর্কে ভালোই জানতাম। কিন্তু এও জানতাম যে আত্মসম্মানবোধ ও পরিমিতিবোধ তাদেরকে যে-কোনো কারোর কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধা দিয়েছে। মৈত্রেয়ীর ব্যবহার আমার কাছে হেঁয়ালিপূর্ণ ছিল, এবং আমি আগে থেকে ওর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না। আমার মনে হয়েছিল ও যেমন আদিম এবং বেপরোয়া, তাতে ও অন্য যে-কোনো কারোর কাছেই নিজেকে উৎসর্গ করতে পারতো দায়িত্বহীনতার সঙ্গে। আমার হিংসা ক্রমে ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল এবং গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম মৈত্রেয়ীর স্নিগ্ধতা, এবং পবিত্রতা। সব কিছু একটি বিরাট প্রতারণার থেকে বেশি আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম মানুষের অনুভূতির ভঙ্গুরতা। খুব নিশ্চিত বিশ্বাসও হয়তো সাধারণ একটা কাজের জন্য ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু অধিকার, যা ঠিক ঠিক আন্তরিকতার সঙ্গে পাওয়া গেছে, তা ভঙ্গুর হয় না। কিছুই আমার অসৎ চিন্তাকে ঠেকাতে পারছিল না, এত সুখ, নিশ্চয়তা, নির্ভরতা , যা জমা হয়েছিল ভালোবাসা চলাকালীন, দুজনের একত্রে রাত্রিযাপনের সময়, সব যেন হারিয়ে যাচ্ছিল জাদুর মতন। আমার মধ্যে শুধু অতি-উত্তেজিত পুরুষোচিত অহংকার বড় হয়ে উঠেছিল আর একটা ভয়ঙ্কর ক্রোধ জেগে উঠেছিল আমার নিজেরই বিরুদ্ধে।

মৈত্রেয়ী আমার কথা শুনছিল এবং দেখাচ্ছিল সে খুব কষ্ট পাচ্ছে, সেটা আমাকে আরও উত্যক্ত করছিল। ও ঠোঁট কামড়ে রক্ত বার করে ফেলেছিল। বড় বড় সজল চোখ নিয়ে আমার দিকে দেখছিল যেন ও বুঝতে পারছিল না যে এমন দৃশ্য সত্যই ঘটছে।

পরে ও ফেটে পড়লো,—তুমি আমাকে বলাৎকারের কথা বলছো? তুমি আমাকে কেন বুঝতে চাইছো না? তুমি আমার জন্য একদম চিন্তা করো না। তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে যে যদি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় লুণ্ঠিত হবার জন্য, তাহলেও তুমি আমাকে ভালোবাসবে। আমি নিজেকেও বলতাম যে এইরকম কিছু হলে ভালোই হবে। তাহলে আমাদের মিলনে আর কোনও বাধা থাকবে না। অ্যালেন, আমাকে বোঝো, আমরা মিলিত হতেও পারছি না আবার নিজেদের ভুলেই নিজেরা মরতে চলেছি। এমনকি তুমি

যদি নিজেকে ধর্মান্তরিত করো, তাহলেও ওঁরা বিশ্বাস করবেন না যে তুমি আমাকে বিয়ে করছো। ওঁরা যে তোমার থেকে অন্য জিনিসের প্রতীক্ষায় আছেন তা' তুমি বুঝতে পারো না? বরং যদি কেউ আমার শ্লীলতাহানি করে, তাহলে ওঁরা আমাকেই রাস্তায় ফেলে দিতে বাধ্য হবেন, নয়তো সেই পাপ গোটা বাড়ির ওপরেই পড়বে। আর ওঁদের থেকে বিতাড়িত হলে আমি তোমার স্ত্রী হতে পারবো, আমি খ্রীস্টান হয়ে যাবো। একটা খ্রীস্টানের পক্ষে লুণ্ঠিত হওয়া পাপ নয় এবং তুমি আমাকে তখনও ভালোবাসবে। তাই না? তুমি আমায় সব সময়ের জন্য ভালোবাসবে। অ্যালেন, আমাকে অন্তত এটা বলো, তুমি আমাকে ভুলে যাবে না। তুমি জানো, আমার জন্য কী অপেক্ষা করবে আজ যদি তুমি আমায় ভুলে যাও।

আমি স্বীকার করছি যে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। মনে হলো যেন বিরাট দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। আমার রাগ দূর হয়ে গেল এবং যা বলেছি তার জন্য খুবই অনুতপ্ত হলাম। আমি মৈত্রেয়ীর কাছে হয়তো ক্ষমা চাইতাম, কিন্তু কী ভাষায়, কী ভঙ্গিতে চাইলে তা ঠিক এই সময় যথাযথ হবে তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। যে-সবগুলো মনে আসছিল, তার প্রত্যেকটা আমার মনে হচ্ছিল ভুল, হাস্যকর এবং কুৎসিত।

জানতাম না কী করতে হবে। চোখে অনুশোচনা এবং ভালোবাসার ভাব দেখানোর চেষ্টা করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও খুব কাঁদতে লাগলো। আমার ত্রুটি উপলব্ধি করে ও খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো। অনুরোধ করতে লাগলো আমাদের প্রেম যেন অক্ষয় থাকে, যেন আমাদের ভুল আমাকে ভয় না পাইয়ে দেয়। আজ আমার মনে হয় ওর সব কথাগুলো ছিল অন্তরের আকুতি। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওগুলো আমাকে আগুনের মত জ্বালাচ্ছিল ও যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমি মৈত্রেয়ীকে দু বাহুর মধ্যে টেনে নিলাম এবং চুপ করে জড়িয়ে থেকে স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাইলাম, যে আমি যা উচ্চারণ করেছি, তার পিছনে ছিল আন্তরিক ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। যা বলেছি তা দুরন্ত অভিমান থেকেই বলেছি। ও আন্দাজ করতে পেরেছিল আমি কতটা কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমার নিজের মানসিক দুর্বলতায় আমরা দুজনেই নতুন করে আমাদের বিয়ের কথা এড়িয়ে গেলাম। ব্যাপারগুলো আমার কাছে অত সোজা মনে হচ্ছিল না যতটা প্রথমে হয়েছিল। চরম বিচ্ছেদের ধারণা করার চেয়ে বরং বেশি পছন্দ করছিলাম আমাদের মিলনের স্বপ্ন থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

জানলার পাশে যেন কার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম বলে মনে হলো। আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর পায়ের শব্দ বারান্দার দিকে চলে গেল এবং কে একজন যেন করিডরের দরজায় ধাক্কা দিলো। ভয় আমাদের হিম করে দিলো। আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এবার আমার জানলার খড়খড়ির কাছে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা খোকা ছাড়া আর কেউ নয়। নিঃসন্দেহে খোকা সিনেমা দেখে ফিরেছে। দরজাটার খিল খুলতে আমি দেরির ভান করলাম যাতে মৈত্রেয়ী নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় পায়।

—তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো?—ও জিজ্ঞাসা করলো।

—কারুর সঙ্গেই না! রূঢ়ভাবে বললাম এবং দরজাটা দড়াম করে ওর মুখের ওপর বন্ধ করে দিলাম।

তখনই ওপর থেকে মিসেস সেনের কণ্ঠস্বর শুনলাম মৈত্রেয়ীর ঘরের সামনে।

১২.

আমার মনে হচ্ছিল, সব কিছুই জানাজানি হয়ে গেছে। বিছানায় পড়ে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলাম, কিন্তু কিছুতেই চোখ বন্ধ করতে পারছিলাম না। দুপুরের দিকে মৈত্রেয়ী এলো। আমাকে না ডেকেই দরজার তলা দিয়ে একটুকরো কাগজ ঢুকিয়ে দিলো ঃ 'মা কিচ্ছু জানে না। কষ্ট পেয়ো না। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।' আমার মনে হয়েছিল ও আমাকে ক্ষমা করেছে অথবা আমার শাস্তিটা স্থগিত রেখেছে। আমি মৈত্রেয়ীকে একটা লম্বা চিঠি লিখেছিলাম ঃ 'রাত্রে আমাদের সাক্ষাৎ বন্ধ করা উচিত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এবং ছবুর অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে।' সত্যি বলতে কি, আমি জানতাম না কী করে আমাদের এই যোগাযোগের ইতি টানবো।

একদিন মৈত্রেয়ী ওর মাকে বলেছিল যে আমি ওর এক বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করছি এবং তাকে বিয়ে করার কথা বলতে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। মিসেস সেন উত্তর দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের সঙ্গের ফল হলো শুধু মানসিক উত্তেজনা আর দুঃখেই এর সমাপ্তি। ট্রাডিশন অনুযায়ী বা সংসারের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যা হয় না, সেই কামনার মধ্যে কোনোদিন স্থায়িত্ব এবং আনন্দ জন্ম নেয় না। যারা ভালোবাসা এবং বিবাহের গভীরতা বোঝে না, তাদের পক্ষে এগুলো হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা অল্পবয়স্করা যা কল্পনা করি, বাস্তব তার চাইতে অনেক বেশি রূঢ়। বিয়ের অর্থ এই নয় যে সেটা "একত্রে ফুল তোলা"। এবং বিয়ের ব্যাপারে কখনোই ক্ষণস্থায়ী ও প্রতারণাপূর্ণ আবেগের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

স্বীকার করছি, এই সমালোচনা থেকে মেনে নিয়েছিলাম যে আমাদের ভালোবাসা ছিল শুধু আবেগ-তাড়িত এবং আমরা কখনই পরস্পরের স্বপ্ন ছাড়া অন্য কারো কথাই ভাবিনি। মিসেস সেন আরও যোগ করেছিলেন যে বিবাহের ভিত্তি কখনই শুধু ভালোবাসা নয়। তার ভিত্তি হলো স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ, আর ভাগ্যের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসলেও, ওঁকে শ্রদ্ধা করলেও, এই ধারণা আমি গ্রহণ করতে পারিনি।

বুঝতে পারছিলাম যেদিন আমি মৈত্রেয়ীকে বিয়ে করতে চাইবো, সেদিন কোন্ অনতিক্রম্য বাধা জেগে উঠবেই আমার সামনে। চিন্তা করলাম, মৈত্রেয়ী যে সমাধান পছন্দ করেছে অর্থাৎ ওকে নিয়ে চলে যাওয়া, তা আদৌ ফলপ্রসূ হবে কিনা। ওর মা-বাবা দেখবেন চোখের সামনে ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপার। সুতরাং তখন আমাকে মেনে নিতে বাধ্য হবেন জামাই হিসেবে, যদিও অন্যরা

কখনই মানতে পারবেন না। আজ আমি খুব অল্পই বুঝি এর জন্য কতখানি দরকার ছিল মৈত্রেয়ীর সক্রিয় ভূমিকা।

দিন চলে যাচ্ছিল একইভাবে, ভয় আর বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে। আমি আমার পারিপার্শ্বিক সব ব্যাপারেই কখনই অবসর পেতাম না চিন্তা করার বা দৃশ্যগুলোকে খুঁটিয়ে মনে রাখার। আমার সেই সময়ের লেখাগুলো এতই এলোমেলো খাপছাড়া ভাসাভাসা যে পড়লে মনে হয় তা যেন অন্য কোনো লোকের জীবন-কাহিনী।

সেই যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলোর মধ্যেই একদিন এলো মৈত্রেয়ীর জন্মদিন, ১৫ই অক্টোবর। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চাইছিলেন যতটা সম্ভব জমকালো করে এই জন্মদিনটি পালন করতে যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং ছবু চিন্তাশক্তিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। মৈত্রেয়ী ওর ১৭ বছর পূর্ণ করলো। আমি জানি না কী অর্থ লুকিয়ে থাকে ভারতীয়দের কাছে, এই বয়সটার। ওর লেখা বই 'উদ্ধিতা' ছাপানো হয়েছিল কয়েকদিন আগে। সমালোচকরা বইটাকে সহানুভূতির সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং নরেন্দ্র সেন নিমন্ত্রণ করেছিলেন কথাশিল্প এবং অন্যান্য চারুশিল্পের সব নামজাদা লোকেদের। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, যত লোককে বাংলাদেশ চেনে এবং ইওরোপে যারা পরিচিত তাঁরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন শ্রীকান্ত-এর লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর। ওঁর মুগ্ধকর ছন্দ, ঈশ্বরীয় সৌন্দর্য আমাকে অনেকদিন ধরে আবেগ-মথিত করে রেখে ছিল। আগস্ট মাসের এক অনুষ্ঠানে ওঁকে দেখে মৈত্রেয়ী আমার কথা একদম ভুলে গিয়েছিল কয়েকদিন ধরে। অনেকদিন ধরে শুধু ওঁর কথাই বলেছিল মৈত্রেয়ী। ও চাইতো ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, শিখতে 'নৃত্যের গোপন কথা'। ও অপেক্ষা করতো 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ম্যাগাজিনের সব রচনাগুলোর জন্য। তাতে ছাপা হতো অনেক শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির রচনা, যেমন অচিন্ত্যবাবু, এক মৌলিক ও বহু আলোচিত কবি।

উৎসবের প্রস্তুতি দেখে আমি একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি জানতাম যে ঐ দিন মৈত্রেয়ীকে একটুও কাছে পাবো না। ও আমার অধিকারে থাকবে না এবং ওর অহংকার ও প্রভাব দেখিয়ে ও সব অতিথিদের মুগ্ধ করার চেষ্টা করবে। আমি কিছু বই কিনেছিলাম ওকে সকালেই দেবো বলে। প্রস্তুতি পর্বের দরুন ও খুব কমই বিশ্রাম নিতে পেরেছিল আগের দিন রাত্রে। সিঁড়ির ধাপগুলো ও দেওয়ালগুলো পুরনো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া

লুকোনোর চেষ্টা করলাম। এই নৃত্যশিল্পীর মধ্যে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থেকেও বেশি ছিল বিশালতা। আমি অনুভব করেছিলাম যে ওঁর মধ্যে এমন একটা জাদুশক্তি আছে যা সবারই মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং শুধু অনুরাগী মৈত্রেয়ীই নয় যে সহজেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আমার ওঁকে অপছন্দ হয়নি। আমার ইচ্ছা করছিল ওঁর প্রতি মৈত্রেয়ীর গুরুত্ব দেওয়াটাকে বোঝার চেষ্টা করা। তাহলে এক লহমায় আমি আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে নেবো। আমার সমস্ত আসক্তি সেই মুহূর্তে লোপ পাবে যখন আমি দেখবো আমার জায়গা অধিকার করেছে আর এক ব্যক্তি। যদি মৈত্রেয়ী উদয়শঙ্করের ঐ জাদুশক্তির বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে পরিত্যাজ্য হওয়াই ওর প্রাপ্য।

আমি মরমে মরে গেলাম যখন এক ঝলকে দেখলাম মৈত্রেয়ী করিডরে উদয়শঙ্করের কাছে বসে ভয়ে ভয়ে কিছু প্রশ্ন করছে, যেটা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম কী শান্ত হয়ে আমি ঐ দৃশ্যটা সহ্য করছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে আমি মৈত্রেয়ীর সামনাসামনি হলাম। ও লুকিয়ে আমার বাহু ধরে বললো; নাচের গোপন কথা আমি উদয়শঙ্করের কাছ থেকে শেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু উনি আমাকে কিছুই ব্যক্ত করতে পারলেন না। এটা একটা বিরাট বোকামি। উনি নাকি ছন্দ বোঝেন না। যখন উনি কথা বলেন তখন মনে হয় উনি যেন বই থেকে পড়ে যাচ্ছেন। ভালো করতাম যদি ওঁকে নিমন্ত্রণ না করতাম। অনুষ্ঠানে উনি নেচে ছিলেন ঈশ্বরীয় ঢঙে। পরে যখন আমি ওঁকে প্রশ্ন করলাম উনি শুধু অস্পষ্টভাবেই কী সব বললেন, যেন একটা স্থূল কারিগর, মেক্যানিক্যাল। এটা কি সম্ভব যে নৃত্য ওঁকে বোধ বা উপলব্ধি দেয়নি?

আমি জানতাম না মৈত্রেয়ীর এই কথাগুলোর জন্য আমি ওকে কিভাবে ধন্যবাদ দেবো। ও আমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল এবং আমার হাত ধরে আকুল হয়ে বললো,—আমি তোমায় পছন্দ করি অ্যালেন, আমি তোমায় সবার চাইতে বেশি পছন্দ করি।

আমার ইচ্ছে করছিল ওকে সজোরে জড়িয়ে ধরি কিন্তু হঠাৎই এক চিৎকার শুনতে পেলাম। আমরা দৌড়ে ওপরে গেলাম। মিসেস সেন ওঁর মেয়েকে ডাকছিলেন এবং অন্য মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করছিল। ভয়ংকর ভয়ে আমরা দুজনে দৌড়ে গেলাম যেন একটা সর্বনাশ অনুভব করছিলাম। আমরা দেখলাম ছবু বারান্দা থেকে রাস্তায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। মেয়েরা চেষ্টা করছিল ওকে ধরে রাখবার। এই উৎসবের দিনে বলতে গেলে ছবু একাই ছিল ওর ঘরে।

ও ওর সুন্দর একটা শাড়ি পরে ছিল—সাধারণত ও ছোট স্কার্ট পরতো। শাড়ি পরে ওকে আরও বয়স্কা দেখাচ্ছিল। ওকে সামনে রাখা হয়েছিল অনুষ্ঠান দেখবার জন্য। কিন্তু করিডরে প্রথম পদক্ষেপেই ও অত লোকজন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং বারান্দায় চলে গিয়েছিল, যেখানে উদয়শঙ্কর কয়েক মিনিট আগেই উপস্থিত ছিলেন। বারান্দায় গিয়ে ওর অভ্যাসমত গান গাইতে গাইতে হঠাৎ ও রাস্তার দিকে ঝুঁকে ছিল। দুজন মহিলা ওকে দেখতে পেয়েছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে যখন ও রেলিংএর ওপর উঠে পড়েছিল এবং লাফ দিতে যাচ্ছিল। ও ভীষণভাবে হাত-পা ছুঁড়ছিল। করিডরে লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁর শান্ত ভাব হারিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ভীষণভাবে ঝগড়া করছিলেন। আমি ছবুকে কোলে করে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিনতে পারলো এবং আমার বুকের উপর জড়িয়ে রইল। কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো—অ্যালেন, অ্যালেন। আমি ওকে বিছানার ওপর বসিয়ে দিলাম। মলিন মুখে ও হঠাৎ আমাকে বললো—মৈত্রেয়ী কোথায়? ওরা ওকে বেচতে চায়?

উৎসবের পরের দিন প্রচুর কথাবার্তা আর প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার পর সবাইই ক্লান্ত। মৈত্রেয়ী অনেক উপহার পেয়েছিল, বিশেষ করে বই। উৎসবের দিনই সকালে কেউ একজন একটা বিরাট ফুলের তোড়ার সঙ্গে একটা খাম পাঠিয়েছিল। ও হাতের লেখাটা দেখে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে ফেললো, ও অবাক হয়ে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল। তখনই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি আমার ঘরে এসে ঢুকলো। খামটা আমাকে দিয়ে লাল হয়ে গিয়ে বললো—এটা তোমার অফিসে লুকিয়ে রেখো, লক্ষ্য রেখো যেন কেউ এটা না দেখে ফেলে।—তোমার কাছ থেকে পরে চেয়ে নেবো।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। উদ্বিগ্ন হবার মতো কোনো কারণও খুঁজে পেলাম না। আমার কাছে একটা বাংলা চিঠি রেখে গেল যা আমি পারতাম শুধু ছিঁড়ে ফেলতে অথবা কোনো বন্ধুকে অনুবাদ করার কথা বলতে। এখনও আমার কাছে চিঠিটা আছে। আমার কখনই ওটা পড়বার সাহস হয়নি। প্রায়ই আমি ভাবি নিশ্চয়ই ওর কোনো ভক্ত ওকে পাঠিয়েছিল ঐ ফুলের তোড়া, কিন্তু কেন মৈত্রেয়ী মিথ্যে করে ওর মাকে বলেছিল যে ওটা এসেছিল ওর স্কুলের এক বন্ধুর কাছ থেকে, যে এই উৎসবে যোগ দিতে পারেনি...!

দিন এবং রাত্রিগুলো একঘেয়ে ভাবে কেটে যেতে লাগল। উৎসবের প্রায়

এক সপ্তাহ পরে এক ঝড় উঠলো। সেই শেষের সময়টার খুঁটিনাটি সব কিছু আমার মনে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আমার ডায়েরির পাতায় আমি শুধু আমার জীবনের সারসংক্ষেপটুকুই খুঁজে পাচ্ছি। অবশ্য সেই সারাংশে কিছু কম ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হয়নি। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আমি তখন, কখনোই আমার অদূর-ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি।

রোজ সন্ধ্যায় আমরা লেকে যেতাম এবং প্রায়ই ছবুকে নিয়ে যেতাম সঙ্গে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই আমাদের উৎসাহ দিতেন আমাদের বিনোদনের জন্য। আমাদের শেষের এই সপ্তাহগুলো কাটাচ্ছিলাম এক অসুস্থ ব্যক্তির বিছানার পাশে, মানসিক আলোড়নের মধ্যে। এটা সত্যিই যে মৈত্রেয়ী দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সেই ১৫ই অক্টোবরের চিৎকারের ঘটনার পর ছবু শান্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবু অতদিন ঘরের মধ্যে কাটানোর পর ওরও দরকার ছিল বাইরে বেরোবার। প্রত্যেকদিন গোধূলি লগ্নে আমরা যেতাম আর ফিরতাম রাত্রি নটা-দশটায়। ছবু প্রায় কথাই বলতো না এবং সাধারণত জলের একেবারে ধারে বসে থাকতো, হয় গান গাইতো, অথবা কাঁদতো,—দৃষ্টি থাকতো স্থির। আমরা ওর কাছাকাছিই থাকতাম। আর নিজেরা বক্‌বক্ করতাম। লুকিয়ে দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করতাম। যেন আচ্ছন্ন হয়ে মৈত্রেয়ী তখন বলতো, একদিন তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে দেখাবে।

ও আন্তরিকভাবে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতো, বিশেষ করে ওকে যখন শোনালাম যে ব্যাঙ্কে আমার যথেষ্ট টাকা গচ্ছিত আছে। আমার মাসিক চারশো টাকা মাইনের প্রায় কিছুই খরচ হতো না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সেদিন ছিল ২৫শে অক্টোবর, লেকেই ছবু খুব অসুস্থ বোধ করতে লাগলো। ওকে ধরে পাড়ের ওপর শুইয়ে দিলাম। আমরা ওর কাছেই বসে রইলাম এবং ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকলাম হালকাভাবে, চেষ্টা করতে থাকলাম ওকে হাসাতে। কিছুদিন ধরেই ও অকারণে হাসছিল এবং ডাক্তারদের মতে ওর ঐ হাসিখুশিভাব ছিল ভালো লক্ষণ।

হঠাৎ ছবু ওর দিদিকে প্রশ্ন করলো—কেন তুমি অ্যালেনকে ভালোবাসো না?

আমাদের হাসি পেলো। ছবু প্রায়ই এরকম অর্থহীন কথা বলতো এবং আমরা ওকে ভয় পেতাম না।

—ওকে তো আমি দারুণ পছন্দ করি! —হাসতে হাসতে বললো মৈত্রেয়ী।

—যদি তুমি পছন্দ করো তাহলে ওকে আদর করো।

মৈত্রেয়ী আরো জোরে হাসতে লাগলো এবং বললো যে ওর মতন একটা বুদ্ধিমতী মেয়ের কখনই এমন বোকার মতন কথা বলা উচিত নয়।

—ভালোবাসা বোকামি নয়।—ছবু আন্তরিকভাবে কথাটা বললো।—যাও ওকে আদর করো। ঠিক আছে, দেখো আমি কেমন করে আদর করছি।

ছবু উঠে এসে আমাকে এক গালে চুমু খেয়ে আদর করলো। হাসতে হাসতে মৈত্রেয়ীও আমাকে আদর করলো আর এক গালে।

—এখন তুই খুশি তো?—জিজ্ঞাসা করলো মৈত্রেয়ী।

—তোর তো আদর করা উচিত ঠোঁটে।

—বুঝে সুঝে কথা বল।—জোরেই বলে উঠলো লাল হয়ে যাওয়া মৈত্রেয়ী।

আমি খুশি হয়েছিলাম এই দেখে যে আমার ছোট্ট বোন ছবু, যাকে এত পছন্দ করতাম, সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল আমাদের ভালোবাসা। আমি মৈত্রেয়ীকে অনুরোধ করলাম আমার ঠোঁটের উপর চুমু খেতে। ও চাইলো না। তখন যথেষ্ট ঠাণ্ডা। মৈত্রেয়ীর গায়ে শাল ছিল। আমি জানতাম কী ভাবে ওকে উত্তেজিত করে বাধ্য করা যায়। শালের তলা দিয়ে আমার হাত ওর বাঁ দিকের বুক স্পর্শ করলো। আমার দুঃসাহসী আঙুলের তলায় ওর হৃদস্পন্দন অনুভব করতে পারছিলাম। মৈত্রেয়ী এই সোহাগের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে আমার বুকের উপর তক্ষুণি আছড়ে পড়লো। ছবু এলোমেলোভাবে দিদিকে জড়িয়ে ধরতে গেল। ছবুর হাত আমার হাতে ঠেকে গেল। আমি চেয়েছিলাম ওর অজান্তেই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে আনবো। ও হাসতে আরম্ভ করলো এবং জোরে চেঁচিয়ে উঠলো উল্লসিত হয়ে।

—দেখলি, অ্যালেনের হাত কোথায় ছিল?

—বোকার মতন কথা বলিস না। ওটা আমার হাত। শুকনো গলায় বললো মৈত্রেয়ী।

—আমি যেন জানতাম না। আমি যেন বুঝতে পারিনি অ্যালেনের আংটিটা...

ছবুর মুখে রূঢ় সত্য আমাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুললেও, যেহেতু ছবু প্রায়ই এরকম উল্টোপাল্টা বলতো, আমি ভাবতে পারিনি যে এই ঘটনা পরে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে।

মৈত্রেয়ী আমার ঠোঁটে চুমু খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিল। তখন রাত্রি হয়ে গেছে, আমরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বাড়ি পৌঁছনোর

আগেই আমরা সবকিছু ভুলে গেলাম।

সেই রাত্রে মৈত্রেয়ী আমার ঘরে আসেনি। আমি জানি না পরের সারাটা দিন কিভাবে কেটে গিয়েছিল। সন্ধে ছটায় আমি বাঙালী পোশাক পরে লেকে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু কেউ আমায় খুঁজতে এলো না। একটু সাহস নিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম আমরা আজকে সন্ধ্যায় বার হবো কিনা। ও উত্তর দিলো এমন একটা কণ্ঠস্বরে যা আমার কাছে মনে হলো উদ্ধত। এই ধরনের কণ্ঠস্বর হয়ত ওর ছিল না। ওকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে গাড়ি যেন গ্যারাজ করে দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খোকার সঙ্গে দেখা হলো করিডরে। ও আমাকে বললো যে মিসেস সেন মৈত্রেয়ী, ছবু কাউকেই অনুমতি দেননি লেকে যাবার। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এক রহস্য আমাকে ঘিরে ধরছে। এই রহস্য ভেদ করা দরকার। আমি মৈত্রেয়ীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম কিন্তু সফল হলাম না। উদ্বেগ এবং যন্ত্রণা নিয়ে ঘরেই বসে রইলাম।

রাতের খাবারের জন্য বাড়ির লোকরা ডাকতে আসতেন। আজ আর কেউ এলেন না। ডাকতে এলো বাড়ির চাকর। টেবিলে দেখলাম শুধু মিসেস সেন আর মৈত্রেয়ী। তাঁরা কেউ কোনো কথা বললেন না। আমি শান্ত থাকতেই চেয়েছিলাম এবং মনে হয় তাতে দারুণভাবে সফলও হয়েছিলাম। মিসেস সেন আমাকে সোজাসুজি দেখার চেষ্টা করছিলেন। আমি ওঁর স্থির এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারছিলাম না। সে দৃষ্টি আমার হৃদয় ভেদ করে যাচ্ছিল। ওঁর মুখে লেগেছিল একধরনের আশ্চর্যজনক একাগ্রতা এবং ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। ঠোঁট দুটো পান খেয়ে লাল; যেমন সাধারণত থাকতো। উনি খুব নম্র এবং চুপচাপ ভাবেই আমাকে দেখছিলেন। তারপর একবার ঘুরে এসে নতুন করে বসে, কনুই দুটো টেবিলের উপর ভর দিয়ে আমায় পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। হয়তো উনি মনে মনে ভাবছিলেন, সম্মান এবং সচ্চরিত্রতার ভানের তলায় তলায় কেমন করে ওঁকে আমি এতদিন ধরে ঠকিয়ে আসছিলাম। ওঁর উগ্র ও শ্লেষপূর্ণ ভাবগতিকের মধ্যে আমি ভাবছিলাম উনি মনে মনে বোধ হয় প্রশ্ন করছিলেন কেমন করে আমি 'এমন কাজ' করলাম? আমি জানতাম না 'এমন কাজ' বলতে মিসেস সেনের মতে কী বোঝায়। কিন্তু উনি যে এই প্রশ্নই করতে চাইছেন সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এবং ভাব দেখাচ্ছিলাম যে আমি মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তাকিয়েছিলাম সোজাসুজি, জিজ্ঞাসা করেছিলাম

কেমন আছেন উনি, কেন আর কেউ রাতের খাবার খেতে আসেননি, ইত্যাদি।

মৈত্রেয়ী টেবিলের তলায় নিজের পা দিয়ে আমার পা জোরে চেপে রেখে ওর আবেগ ও ভয়কে প্রকাশ করছিল। তারপর অনুভব করলাম ওর নরম ত্বক আলতো করে আমার ত্বকে ঘসে যাচ্ছে। এই ভাবে ও আমাকে ওর আসক্তি ও উষ্ণতায় ভরিয়ে দিতে চাইলো, যা আমি কোনোদিনই ভুলবো না। এমনকি যদি ওর থেকে আলাদা হয়ে যাই, দূরে চলে যাই, তবুও...

মিসেস সেনকে কেউ ডাকলো। আমরা একা হলাম। মৈত্রেয়ী তার আবেগ চাপতে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে বললো—ছবু মাকে সব বলে দিয়েছে। কিন্তু আমি অস্বীকার করেছি। ভয় পেয়ো না। আমি তোমারই আছি। যদি তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে কিছু স্বীকার করো না। নইলে...

ওর চোখে জল এলো এবং অভ্যাসমতো আমার হাত ধরতে গেল। তখনই মিসেস সেন আসছিলেন। নিচু গলায় ও আমাকে শুধু বলার সময় পেলো —কাল এসো, সকালে, লাইব্রেরিতে।

মৈত্রেয়ীর মুখ থেকে সেই ছিল আমার শোনা শেষ কথা।

ওর মা ওকে নিয়ে গেলেন, আর আমি চলে গেলাম আমার ঘরে,—আত্ম-বিশ্বাসহীন, দিশাহারা। ভাবতে পারছিলাম না পরের দিন কী ঘটবে।

সেরাত্রে ঘুমোতে পারিনি। আমার ঘরে আরামকেদারায় বসে পাইপের পর পাইপ টেনে গেলাম। ক্রমশ সকাল হয়ে এলো। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ও এলো। ও এসে ভুলিয়ে দেবে সব দুশ্চিন্তা, সব উদ্বেগ। ভুলে যাবো সব প্রতিযোগিতার কথা, যার সম্মুখীন আমি হয়েছিলাম ওর জন্য, সেই সব সন্দেহ, যার জন্য আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম প্রকাশ করতে পারবো, আমার ভেতর যে ভালোবাসা বেড়ে উঠছে তার কোনো সীমা নেই যা মৈত্রেয়ী কোনো দিন চিন্তাই করতে পারেনি। অধৈর্যভাবে সকালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কখন ওকে বলবো যে এক রাত্রি আলাদা থাকা আর এই ভীতি আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসা শিখিয়েছে এবং আমি জেনেছি ও আমার কতখানি প্রিয়, যখন আমি ওকে হারানোর ভয় পাচ্ছি।

আমি কাঁদছিলাম একা একাই, ওকে হারানোর ভয় নিয়ে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমরা আলাদা হয়ে গেলেও আমি বেঁচে থাকতে পারবো। ওকে ভালোবেসেছিলাম সেই সময় থেকে যখন থেকে ওকে জেনেছি যে ও আমার, এবং কেউ আমাকে বাধা দেয়নি ওর সঙ্গে কথা বলতে, ওর দিকে এগিয়ে যেতে। আর আজ একটা

বাধা, একটা বিপদ হঠাৎ এলো আমাদের দুজনের মাঝখানে। মনে হচ্ছিল অপেক্ষা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যাবো। কখন আমি ওকে দেখতে পাবো?

রাত্রিবেলায় অনেকবার বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ঘরে সর্বদাই আলো জ্বলছিল। ওপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল আর মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, বিলাপ আর কান্না। কার গোঙানি? মৈত্রেয়ী, ছবু, খোকার বোন, কে? ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারছিলাম না। চূড়ান্ত অসহায় হয়ে পড়লাম। ঘরে এসে আরামকেদারায় বসে খুঁজতে লাগলাম মৈত্রেয়ীর সেই কথাগুলোর যথার্থ অর্থ—ছবু সব বলে দিয়েছে। ওর মানসিক ভারসাম্যহীনতার মধ্যে ও কী বলতে পারে? ও কী দেখে এবং বুঝে থাকতে পারে? হয়ত রাত্রে কোনো দিন দিদিকে লক্ষ্য করেছিল।

পরে জেনেছিলাম যে ছবুর বিশ্বাস এবং বক্তব্য ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত। সেদিন যখন মিসেস সেন ছবুর মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, তখন ছবু একটানা কেঁদেই চলছিল। মিসেস সেন ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ও কেন কাঁদছে। ও উত্তর দিলো, কেউ ওকে পছন্দ করে না, কিন্তু মৈত্রেয়ীকে সবাই পছন্দ করে। সবাই মৈত্রেয়ীর জন্মদিনে এসেছিলেন এবং উপহার দিয়েছিলেন।—বিশেষ করে অ্যালেন পছন্দ করে মৈত্রেয়ীকে—ও যোগ করলো। মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কেমন করে জানলি?

—অ্যালেন ওকে আদর করে। আমাকে কেউ আদর করে না .....।

ছবু এমন ভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো যে মিসেস সেন ওকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন। সব কথা—ছবু যা দেখেছিল, তা সব বলে দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলো এইভাবে ঃ লেকে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, হাসছিলাম, চুম্বন বিনিময় হচ্ছিল, বাহুর মধ্যে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ছিল.....।

আমি ভেবেছিলাম যে ছবু কিছুই খেয়াল করেনি।

মিসেস সেন তৎক্ষণাৎ মৈত্রেয়ীকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, ছবু যা বলেছে তা সব সঠিক কিনা। তারপর উনি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন গাড়ি গ্যারাজ করার জন্য, আর মেয়েকে নিয়ে ছাদের ওপর উঠে গেলেন। উনি মৈত্রেয়ীকে শপথ করালেন তাঁদের পূর্বপুরুষ ও ঈশ্বরের নামে। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে গেলেন। মৈত্রেয়ী সব অস্বীকার করলো। ও শুধু স্বীকার করলো যে ও আমাকে মাঝে মাঝে মজা করে চুমু খেয়েছে এবং

আমি তার বদলে ওকে চুমু খেয়েছি ওর কপালে। মৈত্রেয়ী ওঁর হাঁটু ছুঁয়ে মিনতি করলো যে তিনি যেন তার বাবাকে কিছু না বলেন।—আমি কোনো ক্ষতিই সহ্য করবো না, যেহেতু আমি দোষী নই। সবাই যদি বলে তাহলে ও আমার সঙ্গে আর দেখা না করাটা নিশ্চয়ই মেনে নেবে এবং যে অন্যায় ও করেছে বলা হচ্ছে তার শাস্তি ও মাথা পেতে নেবে।

পরে শুনেছিলাম, ও ভেবেছিল যে আমার সঙ্গে ও সময়মত পালিয়ে যাবে। মৈত্রেয়ী বাবাকে খুব ভয় পেতো। উনি ওঁর ঘরে মৈত্রেয়ীকে আটকে রাখতে পারতেন অথবা কয়েকদিনের মধ্যেই ওর বিয়ে দিয়ে দিতে পারতেন, আমার সঙ্গে দেখা করা বা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করার আগেই। সেই রাত্রে ওকে মায়ের ঘরে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হলো। মিসেস সেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে সব কিছুই খুলে বললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, এই প্রেমের ঘটনাটা কিভাবে লুকনো যায়...। এই অভিশাপ সমস্ত বাড়ির ওপর এসে পড়বে; এই কলঙ্ক ওঁদের সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এইসব খুঁটিনাটি আমি জেনেছিলাম পরের দিন অথবা তারপরের দিন খোকার কাছ থেকে। কিন্তু সেই রাত্রে আমি আরও খারাপ কিছুর কল্পনা করলাম। আমার মনে হয়েছিল যে ছবু বোধ হয় ওর দিদিকে দেখেছে আমার ঘরে আসতে। আর সেই সব কথাই ওর মাকে বলে দিয়েছে।

সকাল হবার আগেই আমি লাইব্রেরিতে মৈত্রেয়ীর জন্য অপেক্ষা করে রইলাম সব খবর জানবো বলে। দিন হওয়া পর্যন্ত তাকের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। না এলো মৈত্রেয়ী, না খোকার বোন, না লীলু, যাদের দিয়ে একটা খবর অন্তত ও পৌঁছে দিতে পারে। সাতটা নাগাদ মিসেস সেন নিচে নামলেন চা তৈরির উদ্দেশ্যে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ঘরে ফিরে এলাম।

অপেক্ষা করছিলাম জলখাবারের জন্য যদি কেউ ডাকে। কেউ এলো না। খানিক পরে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার ঘরে এলেন—কালো চশমায় চোখ ঢাকা, বেতালা হাঁটা এবং হাতদুটো কাঁপছে দুর্বলতায়।

—প্রিয় অ্যালেন, আমি ঠিক করেছি এবার অপারেশনটা করিয়েই নেব। ডাক্তাররা অনেকদিন থেকে বলে আসছেন।

ওঁকে মনে হলো খুব আবেগতাড়িত, কিন্তু কণ্ঠস্বরে একটা বন্ধুবৎ আন্তরিকতা বজায় ছিল। বললেন,

—অন্তত দুতিন মাস আমার ক্লিনিকে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। আমি ভেবেছি আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি মেদিনীপুর পাঠিয়ে দেবো। তুমিও

শ্রান্ত, কিছু দিন পাহাড়ে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে এসো।

—কখন যাবো আমি? এমন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম যে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সত্যি বলতে কি, আমি ঠিক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছিলাম না, যে কী ঘটতে যাচ্ছে।

—আজকেই।—উত্তর দিলেন ইঞ্জিনিয়ার। আমি দুপুরের খাওয়া সেরেই ক্লিনিকে চলে যাচ্ছি।

চশমার কাচের আড়াল থেকে তিনি আমায় পর্যবেক্ষণ করলেন। এ কথা সহ্য করার মতো শক্তি কী করে পেলাম জানি না, যদিও মনে হচ্ছিল আমার শরীরের সমস্ত রক্ত শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, আমি উত্তর দিলাম,—কিন্তু জানি না কোথায় যাবো। আমাকে একটা আস্তানা খুঁজতে হবে, এই সব জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। এই বলে আমি আমার দুটো ট্রাঙ্ক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দেখালাম।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সৌজন্যপূর্ণ হাসি হাসলেন ; বললেন,— তোমার মত একটা উদ্যমী ছেলে সব সময়েই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারবে। তুমি যদি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো তো দুপুরের খাবার আগেই একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে পারবে। খোকা ট্রাকে করে তোমার সব জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে আসবে। পাহাড়ে যাবার আগে তোমার কোনো বন্ধুর বাড়িতেই থাকতে পারো। ফিরে এসে আরো ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে পারবে।...

উনি উঠে পড়লেন। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছিল। আমি চাইলাম তক্ষুণি চলে যেতে, কিন্তু মিসেস সেন করিডর থেকে সব কিছু শুনেছিলেন, তিনি আমার ঘরে ঢুকে স্মিতহাস্যে বললেন, তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না।

—আমি কিছু খেতে পারবো না।—নিস্তেজ গলায় বললাম।

—আমি তোমায় খাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।—উনি বলে চললেন একই নরম গলায়,— চা তৈরি হয়ে গেছে।

মনে হচ্ছিল, যে-কোনো সময় আমি জ্ঞান হারাতে পারি।

আমি চলে গেলাম।

আমি মৈত্রেয়ীকে আর দেখিনি। জানতে পারিনি ওপরে ওর ঘরে ও কী করছিল তখন.....।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চলে গেলেন এবং আমি চুল টেনে, হাত কামড়ে পাগলের মতো কান্নায় ফোঁপাতে লাগলাম। ইজিচেয়ারে নিজেকে সমর্পণ

করলাম। শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল যন্ত্রণায়। জানি না, সেই যন্ত্রণাকে কি বলা যেতে পারে। সেটা প্রেমের জন্য খুন হবার যন্ত্রণা নয় বা কষ্ট নয়, কিন্তু একটা সমগ্র অনুভূতির ক্রিয়াশক্তি যেন হারিয়ে যাওয়া। আমি যেন হঠাৎ এসে পড়লাম একা একটা কবরখানার ভেতর, আমার কাছে কেউ নেই যে আমার গোঙানির আওয়াজটুকুও শুনবে বা সান্ত্বনা দেবে। আমি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছিলাম।

লীলু চোখে জল নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে ঝটপট্ একটুকরো কাগজ দিলো। তাতে লেখা, ওরা কেউ চায় না আমি তোমার দেখা পাই। নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না। নিজেকে ভেঙে পড়তে দিও না। সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। সবাইকে দেখাও তোমার শুদ্ধতা। একটা মানুষের মতন মানুষ হও। তুমি শীগ্‌গীরই আমার কাছ থেকে একটা খবর পাবে—মৈত্রেয়ী।

হাতের লেখাটা বিশৃঙ্খল। লেখাটা অগোছালো ইংরেজীতে। কাগজে কালির দাগ। তাড়াতাড়ি কাগজটা হাতে ফাঁকের মধ্যে লুকোলাম। মিসেস সেন ঘরে ঢুকলেন, পিছনে একজন চাকর।

—আমি তোমাকে অনুরোধ করবো এখনি চলে যেতে। নরম সুরে বললেন উনি। হয়ত সেই কণ্ঠস্বরে তখনও ছিল সমবেদনার সুর। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন, ছেলে বলে ডাকতেন। ওঁর দুই মেয়ের পরে একটা ছেলের কামনা বোধহয় ছিল।

আমি পারলাম না ওঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, ক্ষমা চাইতে, ওঁর বাড়িতে আমাকে থাকতে দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে। দরজার কাছে উনি স্থির দাঁড়িয়েছিলেন, সোজা এবং চুপচাপ। ঠোঁটে লেগেছিল অল্প বিদ্রূপ মেশানো ঠাণ্ডা হাসি।

—যাবার আগে বাচ্চাদের কি একটু দেখতে পারি?—ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে নরেন্দ্র সেন ঘরে ঢুকলেন।

—মৈত্রেয়ী কষ্ট পাচ্ছে—বললেন উনি,—ও এখন ঘর থেকে নেমে আসতে পারবে না।

তারপর স্ত্রীকে বললেন,—ছবুকে একবার ডাকো।

মিসেস সেন চলে গেলেন। যখন মিঃ সেন আর আমি একা, তখন তিনি আমায় একটা বন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। বললেন, আমি তোমায় অনুরোধ করবো এটা এই বাড়ি থেকে চলে যাবার পর পড়তে। যতটুকু যা আমি করতে পেরেছি তোমার জন্য এখানে, এই ভারতে, পারলে তার সম্মান দিও ; যতটুকু

আমার প্রাপ্য ততটুকুই...

উনি আমাকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই চলে গেলেন। যন্ত্রচালিতের মতো আমি চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম।

ছবুকে দেখামাত্র তুলে নিলাম কোলের মধ্যে আর কাঁদতে কাঁদতে ওকে দোলাতে লাগলাম।—কী করলে ছবু? কী করলে তুমি? বেচারি বাচ্চাটা কিছুই বুঝলো না, কিন্তু আমাকে কাঁদতে দেখে নিজেও কাঁদতে লাগলো এবং আমার মুখে চুমু খেলো। ওর শরীরের ওপর আমি মাথাটা নুইয়ে দিলাম এবং যন্ত্রের মতন দোলাতে থাকলাম, যেন আমি সংজ্ঞাহীন, অন্য কোনো কিছু বলার শক্তি নেই, শুধু বলছি—কী করলে ছবু? কী করলে?

ওকে মনে হলো যেন জ্ঞান ফিরে পেল এবং আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো —কিন্তু আমি কী করলাম! কেন তুমি কাঁদছো অ্যালেন? তুমি কেন কাঁদছো?

মুখটা মুছবো বলে ওকে নামিয়ে দিলাম মাটিতে। মিসেস সেন এবং ওঁর স্বামী দরজার কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুজনেই বরফের মত ঠাণ্ডা, মনে হলো ওঁরা যেন আমায় বলছেন,—এবার যাবার সময় হলো। চলে যাও।

আর একবার ছোট্ট মেয়েটাকে দুগালে আদর করলাম এবং মন ঠিক করে ওঁদের আমার শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানালাম।

—গুড্ বাই অ্যালেন।—বলেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

করিডরের দিকে এগিয়ে গেলাম, ভাব দেখালাম যেন কিছুই দেখছি না। ছবু কাঁদতে কাঁদতে আমার পিছনে পিছনে দৌড়তে লাগলো,—কোথায় যাচ্ছো তুমি অ্যালেন? ওর মাকে জিজ্ঞাসা করলো, ও কোথায় যাচ্ছে?

—অ্যালেন অসুস্থ। ও চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে। ওকে ধরে জবাব দিলেন মিসেস সেন, নিচু গলায়।

বারান্দা পেরিয়ে নেমে গেলাম, চোখ আমার ছিল বারান্দার দিকে। দেখতে পেলাম মৈত্রেয়ীকে। আমার নাম ধরে কাঁদছিল। বড় শ্বাস নিচ্ছিল। আতঙ্কে ওর মুখ নীল। দেখলাম উল্টে পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে, আমি ওপরে উঠতে গেলাম। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।— তুমি কি কিছু ভুলে গেছো?

—না, কিচ্ছু না।

ঝড়ের মতো রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম, লাফ দিয়ে প্রথম গাড়িটায় উঠলাম। আর একবার বাড়িটার দিকে তাকাতে চাইলাম কিন্তু তখন চোখভর্তি জল।

কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। গাড়ি স্টার্ট দিয়েই বাঁক নিলো। আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

যখন সম্বিৎ ফিরে এলো, দেখলাম গাড়িটা পার্ক স্ট্রীটে। খামটা ছিঁড়ে ফেললাম, মিঃ সেনের চিঠিটা পড়লাম শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। কোনো ভূমিকা না করেই উনি লিখেছেন ইংরেজীতে। পাতার এক কোণে উনি লিখে রেখেছেন "একান্ত গোপনীয়"।

"তুমি একজন বিদেশী। আমি তোমায় জানি না। যদি তোমার জীবনে পবিত্র কিছু থাকে এবং তা বিবেচনা করতে সক্ষম হও, আমি তোমায় অনুরোধ করবো আমার বাড়িতে আর কখনও না আসতে, আমার বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা না করতে এবং কাউকে কিছু না লিখতে। যদি তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও, আমাকে অফিসে পাবে। যদি কোনও দিন আমায় লিখতে চাও তাহলে এমন কিছু লিখবে না যা এক অজানা ব্যক্তি আর একজন অজানা ব্যক্তিকে লিখতে পারে, অথবা একজন অধস্তন তার উপরওয়ালাকে লিখতে পারে। আমি তোমায় অনুরোধ করবো এই চিঠির কথা কারও কাছে প্রকাশ না করতে এবং পড়ার পরে ছিঁড়ে ফেলতে। আমার এই ব্যবহারের কারণ তোমার কাছে মনে হয় পরিষ্কার, যদি তোমার স্থূল রুচির মধ্যে অতি সামান্যও বিচক্ষণতা বর্তমান থাকে। তুমি নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছো তোমার নিজের অকৃতজ্ঞতা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষতি, যা তুমি আমার ওপর চাপিয়ে দিলে।

নরেন্দ্র সেন।

বিঃ দ্রঃ—তোমাকে অনুরোধ করবো যে, অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টায় বিরক্তিকর কিছু দেখিয়ো না। তাতে তুমি কেবল নতুন কিছু মিথ্যা যোগ করতে পারবে যা তোমার নোংরা চরিত্র তোমায় এতদিন করিয়েছে।"

১৩.

হ্যারল্ড বাড়ি ছিল না। কিন্তু ওর বাড়ির মালিকানী ওর শোবার ঘরের দরজা খুলে দিলেন। পাখাটা সম্পূর্ণ জোরে চালিয়ে দিয়ে, আমি ওর বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথাটা ঠাণ্ডা করার দরকার ছিল। মালিকানী মিসেস রিবেইরো খুবই বিচলিত বোধ করছিলেন, আমাকে কী প্রশ্ন করবেন তাও বুঝতে পারছিলেন না।

ওঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বললাম, আমার কোনো বিপদ হয়নি, উদ্বিগ্ন হবেন না। মিঃ সেনের আজ অপারেশন হবে, তার জন্যই চিন্তিত আছি।

নিজের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। হ্যারল্ড বা এই মহিলা কাউকেই আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল না। পরবর্তীকালে হ্যারল্ডের এই নিয়ে কচকচানি আমার অসহ্য লাগবে। ও ওর সমস্ত ইয়ার-বন্ধুদের কাছে আমার কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলার জন্য ছুটবে। মেয়েরা আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ছুটে আসবে, ওদের সঙ্গে মদ খেতে আর রাত কাটাতে অনুরোধ করবে। আমি কারো কাছ থেকে কোনো সান্ত্বনা সহ্য করতে পারবো না। এই সমস্ত লোকেদের কাছে মৈত্রেয়ীর নাম উচ্চারণ করতেই আমার ইচ্ছে করছিল না। আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। আমি সম্পূর্ণভাবেই আমার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। কোনো কিছুই স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারছিলাম না। শুধু পুরনো বোধবুদ্ধি দিয়ে এইটুকু বুঝতে পারছিলাম যে আমি আর মৈত্রেয়ী আজ বিচ্ছিন্ন। অসম্ভব! অসম্ভব! যখনই তার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো—মৈত্রেয়ীর দেহ বারান্দায় শায়িত, আমি আতঙ্কে কেঁপে উঠতাম। অন্য চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করার চেষ্টা করতাম, অন্য স্মৃতি আনার চেষ্টা করতাম,—জুঁই ফুলের মালা, লাইব্রেরি, চন্দননগর ... মনটা একটু শান্ত হতেই সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠলো, শেষ দৃশ্য ঃ খাবার টেবিলে মিসেস সেনের বিদ্বেষভরা দৃষ্টি, মিঃ সেনের কথা—যদি কিছু ভালো করে থাকি তোমার, তার জন্য যদি আমায় সামান্য কৃতজ্ঞতাও জানাতে চাও...।

ঘণ্টা খানেক বাদে মিসেস রিবেইরো এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কী খেতে চাই—চা, হুইস্কি, বিয়ার...। আমি সব কিছু প্রত্যাখ্যান করলাম এমন এক ভঙ্গীতে অথবা হয়ত আমার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে বৃদ্ধা মহিলা গুরুতর চিন্তিতভাবে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—অ্যালেন তুমি কি অসুস্থ?

জানি না কী উত্তর দিয়েছিলাম। বোধ হয় বলেছিলাম, গত কয়েক মাস

খুব কাজের চাপের মধ্যে ছিলাম ... এই গ্রীষ্মে কোথাও বেড়াতে যাইনি ... মিঃ সেনের জন্য আমি খুবই বিচলিত, এই রকম কিছু উত্তর হয়ত দিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোনো ঘর খালি আছে কি না। আমি কিছু দিন বাইরে ঘুরে এসে ভাড়া নেবো। খালি ঘরের কথা শুনে ভদ্রমহিলা খুব খুশি হলেন এবং তক্ষুণি আমায় পাশের ঘরটা দেখালেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেন ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। ওঁর কৌতূহল আমায় ক্লান্ত করছে দেখে উনি প্রসঙ্গ পাল্টে আমার জ্বর সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এবং আমায় পাহাড়ে কোথাও বেড়াতে যাবার পরামর্শ দিলেন—দার্জিলিং, শিলং অথবা সমুদ্রের ধার—পুরী বা গোপালপুর, যেখানে গিয়ে ফাদার জুসতুস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে ছিলেন। ওঁর সব কথা শুনলাম এবং সব কিছুতেই সায় দিলাম যাতে কথা না বাড়ে। তিনি বারান্দা থেকে স্টেটস্‌ম্যান কাগজ নিয়ে এসে হোটেলের ঠিকানা দেখতে শুরু করলেন আর আমায় জানাতে থাকলেন। হ্যারল্ডের বিছানায় শায়িত আমার দেহ, যে সিগারেটগুলো আমি খাচ্ছিলাম সেগুলো থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে যাওয়া ধোঁয়া, এই অনর্গল বকে যাওয়া ভদ্রমহিলা, সবই অবাস্তব মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। মৃত্যুই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমাকে মরতেই হবে।

মনে হচ্ছিল এই রকম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমি কয়েক দিন থাকলেই পাগল হয়ে যাবো। আমাকে পালাতে হবে। আমাকে পালাতে হবে এক প্রগাঢ় নির্জনতার মধ্যে। সব ভুলতে হবে, সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন নিজেকে ভোলার। ঠিক করলাম পরের দিনই আমি চলে যাবো।

মিসেস রিবেইরোকে বললাম—অনুগ্রহ করে একবার মিঃ সেনকে ফোন করবেন—south 1147, বলুন উনি যেন এখানে আমার জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

অন্য সময় হলে হয়ত রিবেইরো একজন 'কালা আদমি'কে ফোন করতে চাইতেন না কিন্তু যেহেতু ওঁর বাড়িতে ভাড়া থাকবো, তাই উনি তাড়াতাড়ি ছুটলেন ফোন করতে। সম্ভবত মন্টুই ফোন ধরেছিল।

—আমি আপনার ঘরটা পরিষ্কার করে দিই,—বলে চলে গেলেন রিবেইরো। ওঁকে যেতে দেখে আমি বাস্তবিকই খুশি হলাম। আমি আর কান্না চেপে রাখতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। একটা আর্শির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি নিজেকে চিনতে পারছিলাম না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার চেহারায় আশ্চর্য পরিবর্তন

এসেছিল। বোধ হয় সেই দিন থেকেই আমি বুঝেছিলাম মানুষের বাহ্যিক রূপের কোনোই মূল্য নেই। মানুষের মুখে তার চরিত্রের কিছুই লেখা থাকে না। হয়ত শুধু চোখ দুটোই একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করলেও করতে পারে।

তারপর অসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে আমি আমার ঘরে–আমার বিছানায় আশ্রয় নিলাম। শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ছাদের দিকে শূন্যে দৃষ্টি মেলে রইলাম। এমন সময় দারুণ আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে হ্যারল্ড এসে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই সমস্ত ঘটনা জানতে চাইলো। আমি প্রচণ্ড মাথা ধরেছে বলে ওকে সামান্য দু-একটা কথায় ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা করলো এবং দৃঢ়ভাবে জানালো হুইস্কি খেলে সব যন্ত্রণারই উপশম হয়। ও নিজের ঘর থেকে হুইস্কির বোতল নিয়ে এলো। আমি এক বার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড দুঃখ বোধে পুনরায় আক্রান্ত হলাম। ঠিক এই সময় খোকা এসে ঘরে ঢুকলো। প্রচণ্ড আবেগে আমি ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম। ওকে আমার প্রেমের দূত বলে মনে হচ্ছিল। খোকার ধুতি ছিল ময়লা, খালি পা। আমার ঘরের অন্যান্যরা ওর দিকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল। ও কিন্তু সহজভাবেই কুলিদের পরিচালনা করছিল। আমি অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন শেষ হবে ওর কাজ, আর আমি জানতে পারবো মৈত্রেয়ীর অবস্থা,—ওখানে কী ঘটেছে। আমি কুলির পয়সা মিটিয়ে ওকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গেলাম। যাবার আগে মিসেস রিবেইরোকে আমাদের দুজনের জন্য চা পাঠাতে বলে দিলাম। হ্যারল্ড রাগে ফেটে পড়ছিল। ও চাইছিল একা আমার সঙ্গে তখন কথা বলবে। ও বুঝতেই পারছিল ভবানীপুর থেকে আমার চলে আসার ব্যাপারটা অত সোজা ছিল না। ও অবশ্য আমাদের বিরক্ত করতে আসেনি।

খোকা আমার জন্য এক কপি 'উদ্ধিতা' নিয়ে এসেছিল। বইটায় মৈত্রেয়ীর শেষ কথা "আমার ভালবাসাকে, আমার ভালাবাসাকে—মৈত্রেয়ী", লেখা ছিল। আমি বিষণ্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—শুধু এই? খোকা আমাকে বইএর শেষ পাতাটা দেখতে বললো। লেখা ছিল 'চিরবিদায় প্রিয়তম। আমি এমন কিছু বলিনি যাতে তুমি দোষী হও। শুধু এইটুকুই বলেছি যে তুমি আমার কপালে চুমু খেয়েছিলে। এটুকু আমায় স্বীকার করতেই হয়েছিল কারণ উনি আমার মা। অ্যালেন, আমার বন্ধু, আমার প্রেম, বিদায়—মৈত্রেয়ী'।

দুঃখে যন্ত্রণায় আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। হাতের লেখাটাই বার বার দেখছিলাম। খোকা চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎই সে

বলতে শুরু করলো—সবই জানাজানি হয়ে গেল। অবস্থা চরমে উঠলো। সত্যি কথা বলতে কি আপনারা ভীষণই অসাবধানী ছিলেন। ড্রাইভারও আপনাদের একাধিকবার দেখেছে, আপনার ঘরেই। ও মন্টু আর লীলুকেই বলেছিল। কেউই সাহস পায়নি আপনাদের সাবধান করে দিতে।

আমি নিজের মনেই প্রশ্ন করছিলাম, খোকা কি শুধু ওইটুকুই বুঝতো, জানতো? সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছিলাম এসব নিয়ে এখন আর চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। খোকা আবার বলতে শুরু করলো,—ছবু যেন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলো যখন দেখলো মৈত্রেয়ী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ও বার বার জিজ্ঞাসা করছিল অ্যালেন কোথায় গেল, অ্যালেন কোথায় গেল। মার শাড়ি ধরে টানছিল আর বার বার এক প্রশ্ন করে চলেছিল। আমি যখন ওকে বললাম যে আমি আপনার কাছে যাচ্ছি, তখন ও আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিল।

স্কুলের খাতার পাতা ছিঁড়ে ছবু যত্ন করে ওর সবচেয়ে সুন্দর হাতের লেখায় বাংলায় লিখেছিল, 'প্রিয় অ্যালেন, তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে? জানি না কেন আমি ওসব কথা বলে ফেলেছিলাম। মনে হয়নি যে কোনো অন্যায় করছি, যেহেতু আমি মনে করি না তুমিও ভালোবেসে কোনো অন্যায় করেছো। মৈত্রেয়ীর কষ্ট চোখে দেখা যাচ্ছে না। তুমি একটা কিছু করো যাতে ও এত কষ্ট না পায়। তোমার ভালোবাসা এখন কোথায় গেল? কেন আমি মরছি না? আমি মরে যেতে চাই।'

—ও লেখার সময় প্রচণ্ড কাঁদছিল আর আমি যেন অতি অবশ্যই আপনাকে চিঠিটা দিই, এই কথা বার বার বলছিল। ও চায় আপনি ওকে টেলিফোন করুন। ও এখন সুস্থ হয়ে গেছে,—এই কথা বলে খোকা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—কী হলো খোকা?

—আপনাকে দেখে আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে, আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না।

খোকা যথেষ্ট করুণ মুখ করে কথাগুলো বলছিল কিন্তু ওকে আমার একজন অপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। ও প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো —আমি যখন জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম তখন মৈত্রেয়ী নিচে নেমে এসে আপনার জিনিসপত্র স্পর্শ করে করে দেখছিল। ওকে সবাই মিলে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল। ও চিৎকার করে কাঁদছিলো আর

জবরদস্তি করছিল দেখে ওকে মিঃ সেন এমন মারলেন যে ওর মুখ ফেটে রক্ত পড়তে শুরু করলো। টেনে-হিঁচড়ে ওকে দোতালার ঘরে নিয়ে যেতেই ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমি মানসচক্ষে মৈত্রেয়ীকে দেখতে পাচ্ছিলাম—রক্তাক্ত মুখ, পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করছে আর মার খাচ্ছে। কিন্তু ওর ক্ষত, কষ্ট আমাকে যত না যন্ত্রণা দিচ্ছিল, ওর উপস্থিতি ওর সান্নিধ্য যে ক্রমশ বহু দূরে চলে যাচ্ছে এই ভাবনাই আমায় ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছিল।

—ওরা ওকে ওর শোবার ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল, যাতে ও আপনার সঙ্গে শেষ দেখাও না করতে পারে। আপনি যে সমস্ত বই উপহার দিয়েছিলেন, সব কেড়ে নিয়েছিল। যতক্ষণ ও অজ্ঞান হয়ে ছিল ততক্ষণ ওর মাথায় জল ঢালছিল আর যেই জ্ঞান ফিরে আসছিল সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হচ্ছিল মার। কারণ জ্ঞান ফিরলেই ও বলে উঠছিলো 'আমি ওকে ভালোবাসি, আমি ওকে ভালোবাসি'। আমি নিচ থেকে এইটুকুই শুনতে পাচ্ছিলাম। ছবু এসে আমায় আরও বলেছিল যে ও নাকি বলছিল, 'ও দোষী নয়, ওর কোনো দোষ নেই, তোমরা ওকে কেন শাস্তি দিচ্ছো?'

মৈত্রেয়ী এই রকম কেন ভাবছিল কে জানে। কারণ ওর বাবা, মা এযাবৎ আমার প্রতি কোনো কিছুই করেননি। মিঃ সেন আমায় মারধোর করতে পারতেন। উল্টে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'Good bye Allen'!

—মৈত্রেয়ীকে ঘরে নিয়ে যাবার আগে ও আমায় চুপি চুপি বলেছিল আজ আপনাকে ও টেলিফোন করবে। নিশ্চয় করতে পারেনি? ওকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আমি ওর মাকে বলতে শুনছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁরা ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন।

খোকার কথাগুলো শুনে আমি আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলাম। খোকা আমার অবস্থা লক্ষ্য করে নতুন উদ্যমে বলতে শুরু করলো,—হ্যাঁ, ওঁরা মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এক অধ্যাপকের বিয়ে ঠিক করছেন। মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসেই ওদের বিয়ে হবে। আপনি জানেন ওঁরা মেদিনীপুর যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ জানি।

—ওরা পশু। সবাই পশু। আপনার ঘেন্না হয় না?

—কেন ওদের ঘেন্না করবো? আমিই তো অন্যায় করেছি। ওঁদের দোষ কোথায়? দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তা হলো আমায় আশ্রয় দেওয়া।

—ওঁরা আপনাকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। আপনি জানেন?

আমি মৃদু হেসেছিলাম। আমার কাছে এগুলো বৃথা, অপ্রয়োজনীয় আলোচনা মনে হচ্ছিল। আজ আমি যে-পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে গেছি তা যদি না হতো, তাহলে আমার সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি নিয়ে ওঁরা বোধ হয় আমার চেয়েও বেশি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হতেন।

খোকা আমার চোখে জল দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

—আমার মা অত্যন্ত অসুস্থ—আমার কাছে একটা পয়সা নেই—আমি ভাবছিলাম আপনার কাছ থেকে ধার চাইবো। বেঙ্গল ফিল্ম কোম্পানির কাছ থেকে পাওনা টাকা পেয়ে গেলেই ...

—আমি জানতাম খোকার মার কোনো অসুখ হয়নি এবং তিনি তাঁদের আত্মীয়, কালীঘাটের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে যত্নেই আছেন।

—তিরিশ টাকায় তোমার চলবে?

আমি ওর উত্তরের অপেক্ষা না করে একটা চেক লিখে দিলাম। ও ক্ষীণকণ্ঠে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আবার মৈত্রেয়ী প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। আমি ওকে নিরুত্তাপ গলায় বললাম—খোকা আমার প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

বিকেলে হ্যারল্ডের কাছে খবর পেয়ে মেয়ের দঙ্গল এসে হাজির হলো। ঘেরা বারান্দায় গ্রামোফোন বাজিয়ে গান শুরু হলো, হুইস্কি, সোডার অর্ডার গেল। আমাকে সান্ত্বনা দেবার পর্বটা বেশ বাড়াবাড়ি রকমের শুরু হলো। হ্যারল্ড ওদের বলেছিল যে আমি স্নায়বিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং কলকাতা ছাড়ার আগে আমায় সব ভোলাতে হবে। গারতি আমায় বললো, তারপর অ্যালেন, এখানে একা একা মদ খাচ্ছিস? তোর প্রেমিকাকে কাছে পাচ্ছিস না বলে দুঃখ হচ্ছে?

ও আমার কোলের ওপর বসে পড়লো। ওর দেহের স্পর্শ আমার এত খারাপ লাগছিল যে, আমি উঠে যেতে অনুরোধ করলাম।

—আমি ক্লান্ত আর অসুস্থ গারতি।

—দেখিস বাবা কোনো বাঙালী মেয়ের প্রেমে পড়িসনি তো? জানিস, ওরা খারাপ কাজ করলে কী দিয়ে গা ধোয়? জানিস? জানিস না তো, তবে শোন, ওরা গোবর দিয়ে গা ধোয়। গোবর মেখে গঙ্গায় স্নান করে।

সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো। মিসেস রিবেইরো পাশের ঘর থেকে বারান্দায় এসে বললেন—ছেলেটাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও তো...অ্যালেন আর একটা হুইস্কি নাও। দেখবে তোমার ভালো লাগবে।...চোখের অপারেশন

এমন কিছু ব্যাপার নয়।

—মিসেস রিবেইরো, আপনি ভাবছেন অ্যালেন চোখে অপারেশনের চিন্তায় কাঁদছে? খুব ভুল করেছেন....ওর সুন্দরী প্রেমিকা আর একজনের সঙ্গে কেটে পড়েছে।

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে আমি চিৎকার করে বললাম, —চুপ কর।

দয়া করে আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলো অ্যালেন, তুমি এখন তোমার ভবানীপুরের বাড়িতে নেই। ঐ নিগারদের বাড়িতে....

ক্লারা গারতির হাত ধরে ওকে চুপ করানোর জন্য বললো—ছেড়ে দে, গারতি। অ্যালেনকে একটু শান্তিতে থাকতে দে।

—সব জায়গায় আহারে, বাছারে বলে তোরা সবাই ওকে মাথায় তুলেছিস। মেয়েদের মতো কাঁদছে। ও সান্ত্বনা খুঁজুক বাঙালী মেয়েদের আঁচলের তলায়। আমি খ্রীস্টান...ও কোন্ সাহসে আমাকে অপমান করে?

—কিন্তু অ্যালেনও তো খ্রীস্টান।

—তোরা বিশ্বাস করিস ও এখনও খ্রীস্টান আছে?—গারতি হাসিতে ফেটে পড়লো। হাসতে হাসতে হ্যারল্ডের কাছে গিয়ে বসলো।

—তুই কি বলিস হ্যারল্ড? মনে পড়ছে ও যখন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য নিয়ে, গুরুর মাহাত্ম্য নিয়ে লেকচার মারতো? এসব মনে পড়ছে না তোদের—আর এখন আমি চুপ করবো, না?

হ্যারল্ড ভীষণ দোটানায় পড়ে গেল। মিসেস রিবেইরো সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি উঠে পড়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম—চল্লাম। গারতি অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে বললো—কোথায়? মন্দিরে পুজো করতে?

একটা জঘন্য রাত কাটালাম। শুতে যাবার আগে অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। অজস্র সিগারেট খেলাম। বাঙালী মানুষদের চলাফেরা, কথাবার্তা, দেশী চলতি ভাষায় চিৎকার সবকিছু আমায় মৈত্রেয়ীর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। ভেবেছিলাম ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বিছানায় পড়লেই ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু কোথায় ঘুম! বিছানা, বালিশ যন্ত্রণায়, কষ্টে দলে-মুচড়ে ফেললাম। একটার পর একটা ঘটনা, একটার পর একটা স্মৃতি আমায় পাগল করে দিচ্ছিল। তমলুক, নদিয়া, হাসপাতাল, ভবানীপুর, লেক, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মৈত্রেয়ীর চেহারা, মিঃ সেনের কণ্ঠস্বর 'Good bye Allen'; মিসেস

সেন—'চা খেয়ে নাও অ্যালেন'...আমি কি পাগল হয়ে যাবো!

রাতে অন্ধকারে গীর্জার ঘণ্টার শব্দ রাত্রির বয়স জানিয়ে দিচ্ছিল। পাশের ঘর থেকে হ্যারল্ডের নিরবচ্ছিন্ন নাক ডাকার আওয়াজ। আমি মৃত্যুর কথাও ভাবলাম। আমি যদি গঙ্গায় ডুবে মরি, তাহলে হয়ত মিঃ সেন বুঝতে পারবেন ওঁর মেয়েকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম কি না। পরের দিন কাগজে এই খবর দেখে হয়ত মৈত্রেয়ী অজ্ঞান হয়ে যেতো। মিসেস সেনের অনুশোচনা আসতো। মিঃ সেনও হয়ত বুঝতেন আমি মনে-প্রাণে মৈত্রেয়ীকে ভালোবাসতাম। মৃত্যু এবং মৃত্যুর পূর্ববর্তী প্রস্তুতিপর্বের চিন্তা করতে করতে আমি ভোরের দিকে একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় হ্যারল্ড এসে বললো আমার ফোন এসেছে।

আমি পাগলের মতো দৌড়লাম। টেলিফোন তুলেই আমি মৈত্রেয়ীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ওর গলার আওয়াজ আমার কাছে ছিল তৃষ্ণায় কাতর চাতক পাখির কাছে বৃষ্টির জলের মতো। ওর কথার জবাব দিতে পারছিলাম না পাছে হ্যারল্ড শুনতে পায় এই ভেবে। খাপছাড়া ভাবে ও কথা বলছিল। এত আস্তে কথা বলছিল আমি সব কথা স্পষ্ট শুনতেও পাচ্ছিলাম না। নিশ্চয়ই বাড়ির অন্য কেউ যাতে না শুনতে পায় সেই জন্য ও অত নিচু গলায় কথা বলছিল। ওর কণ্ঠস্বরে এক আকুতি ছিল যার সঙ্গে খাঁচায় বন্ধ পাখির আর্তরবেরই তুলনা করা চলে।

—অ্যালেন, তুমি আমায় চিনতে পারছো? আমি, আমিই বলছি। আমি একই রকম আছি অ্যালেন। যাই ঘটুক...মানুষের মতো মানুষ হও অ্যালেন। কাজ করে যাও। হতাশ হয়ো না। আমি আর পারছি না ...অ্যালেন আমায় ক্ষমা কোরো। আমি আর পারছি না...। শোনো, তোমায় একটা কথা বলি...

হঠাৎ ও চুপ করে গেল। কেউ নিশ্চয়ই ওকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে। আমি বৃথাই চেঁচাচ্ছিলাম—মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী। হ্যালো, হ্যালো। কেউ আর সাড়া দিলো না।

ঘরে ফিরে আছড়ে পড়লাম বিছানায়। দেওয়ালগুলো যেন ক্রমশ সরে এসে আমায় চেপ্টে দিচ্ছিল। আমার ঘরের এক কোণে পড়ে থাকা ভবানীপুরের বাড়ির আরাম কেদারা আমায় ব্যঙ্গ করছিল। ওই চেয়ারে কতবার মৈত্রেয়ী বসেছে। প্রত্যেকটা আসবাব আমাকে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। কিছুতেই সেই সব ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম না, যেগুলো রাতারাতি আমায় মানুষ থেকে ছেঁড়া কাগজে পরিণত করেছিল।

হ্যারল্ড এসে জিজ্ঞাসা করলো—মিঃ সেন কেমন আছেন? অপারেশন হয়ে গেছে?

আমি কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম—না হয়নি। আজই বোধ হয় হবে।

বিছানায় বসে বসে আবার সিগারেট ধরালাম। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে শুধু হাত দুটো ছাড়া। সে দুটো ক্রমাগত কেঁপেই চলেছিল। বেলা দশটা বেজে গেল এইভাবে। এমন সময় একটা লোক সাইকেলে করে এসে আমায় একটা চিঠি দিলো। লোকটি আমার কোনো কথার জন্য অপেক্ষা না করেই সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। চিঠি খুললাম, নরেন্দ্র সেনের চিঠি।

মহাশয়,

আমি বুঝতে পারছি আপনার আত্মসম্মানবোধ বলতে কিছু নেই। আপনার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঘাসের মধ্যে চরে বেড়ান সাপের মতো। ঠিক সময় যার মাথাটা থেঁতলে না দিলেই যে প্রথম সুযোগেই ছোবল মারবে। এখনও চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আপনি ভদ্রলোকের মতো কথা দিয়েছিলেন যে আমার বাড়ির কারো সঙ্গে, কোনোরকম যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং অকারণ একটি শিশুকে কষ্ট দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ইতিমধ্যেই আপনি তার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন। পুনরায় যদি আপনি এই রকম প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে যথাশীঘ্র সম্ভব দেশে পাঠানোর চেষ্টা করবো। আমি ভেবেছিলাম আপনার যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে এবং আপনি এই শহর ত্যাগ করেছেন। আমি টেলিফোনেই আদেশ দিয়েছি যাতে আপনার আজ থেকেই চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটে। সুতরাং আপনার পক্ষে যেটুকু করণীয় পড়ে আছে তা হলো আপনার প্রাপ্য মাইনে বুঝে নেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে শহর ছেড়ে যাত্রা শুরু করা। আপনার অকৃতজ্ঞতার একটা সীমা থাকা উচিত।

নরেন্দ্র সেন

এই চিঠি পড়ার পর আমার বোধশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেল। চাকরির কথা নয় ; আমি নিজেই ঠিক করেছিলাম পদত্যাগ করবো। নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে কথা বলা, অফিসে দেখা হওয়া ইত্যাদি আর সম্ভব ছিল না। বুঝতে পারছিলাম মৈত্রেয়ী এই ধরনের অসাবধানী কাজ করতেই থাকবে এবং তার ওপর অত্যাচার চলতে থাকবে ক্রমশ বেশি মাত্রায়। আর আমি কোনোভাবেই ওকে সাহায্য করতে পারবো না। আমি খামটা মুড়ে পকেটে নিয়ে শুধু আমার হ্যাটটা

হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস রিবেইরো জিজ্ঞাসা করলেন—লাঞ্চে আসবেন তো?

—নিশ্চয়ই!

—আপনার প্রিয় খাবার বানাচ্ছি। হ্যারল্ডই বললো আপনি কী কী খেতে ভালোবাসেন। দেখবেন ভালো লাগবেই...

মৃদু হেসে আমি বেরিয়ে এলাম। কোথায় যাবো, কী করবো কিছুই ঠিক নেই। সত্যই যদি কলকাতা ছাড়তে হয় তার জন্য কিছু টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলার দরকার। আমি নিশ্চয়ই মিঃ সেনের হুকুম মতো চলবো না। আমি চলে যাবো তার একটাই কারণ, এছাড়া মৈত্রেয়ীকে বাঁচাবার আর কোনো রাস্তা আমার জানা ছিল না। রয়েড স্ট্রীট থেকে ক্লাইভ স্ট্রীটের দূরত্ব যথেষ্টই ছিল, তবুও আমি হেঁটেই ব্যাঙ্কে এলাম।

টাকার নোটগুলো সব একটা প্যাকেটে করে ফোলিও ব্যাগে নিলাম আর খুচরো পয়সাগুলো পকেটে রাখলাম। হাওড়া স্টেশনের দিকে এগোলাম। হাওড়া ব্রীজের ওপর থেকে দেখলাম অসংখ্য নৌকা, গঙ্গার নোংরা জল। হঠাৎই মনে হলো আত্মহত্যা কাপুরুষতা। স্টেশনের স্টল থেকে একটা লেমনেড খেলাম। তখন ভরদুপুর। স্টেশনের ডান দিকের রাস্তা ধরলাম। এই রাস্তা আমি জানতাম বেলুড়ের দিকে গেছে। রাস্তায় গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে আমার নিজেকে অনেকখানি ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল। স্টেশন থেকে হুগলী অবধি যে মোটরগুলো ভাড়া খাটতো তারা আমাকে পেছনে ফেলে হুস হুস করে চলে যাচ্ছিল। কখনো কখনো কোনো গাড়ি আমার কাছে এসে থেমেও পড়ছিল। ড্রাইভাররা বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছিল শহরের বাইরে কোনো ইওরোপীয়ানকে পায়ে হেঁটে একা একা যেতে দেখে। একটা ঝুপড়ি মতো দোকানে একবার থামলাম। এক বৃদ্ধা লেমনেড, পাঁউরুটি ইত্যাদি বিক্রি করছিল। আমি একটা ঠাণ্ডা পানীয় খেতে খেতে দরিদ্র বৃদ্ধার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলাম। আমি মৈত্রেয়ীর প্রিয় শব্দগুলো ব্যবহার করছিলাম। আর সেগুলো উচ্চারণের সময় আমার এক অদ্ভুত তৃপ্তি হচ্ছিল।

প্রায় আড়াইটায় আমি বেলুড়ে পৌঁছলাম। পথে বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিলাম। জামা-কাপড়ে কাদা লেগে বীভৎস মূর্তি হয়েছিল। স্বামী মাধবানন্দ আমার উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেহারা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় সেই যখন মৈত্রেয়ীদের গাড়িতে করে এখানে প্রথমে এসেছিলাম তখন থেকে। গঙ্গার ধারে গিয়ে জামা-কাপড় শুকিয়ে নিলাম।

ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখে সোজা রৌদ্র নিয়ে আমার মনে পড়তে লাগলো মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এখানে বেড়াবার নানান স্মৃতি। পকেট থেকে ডায়েরি বের করে লিখতে শুরু করলাম শুধু নিজেরই জন্য। আবার সেই পুরনো টিকাগুলো পড়লাম যেগুলোকে মনে হচ্ছিল আপন রক্তে লেখা। এক জায়গায় লেখা ছিল 'সব শেষ হলো। কেন? আমার মনের মধ্যে বিশাল মরুভূমি'। মঠ থেকে ভেসে আসছিল প্রার্থনা-সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের সুরে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।....মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, তোমায় আর কোনো দিন আমি দেখতে পাবো না!

আমার কী হয়েছে স্বামীজী জানতে চাইলেন। তিনি যখন শুনলেন যে আমি কলকাতা থেকে হেঁটে এসেছি এবং সারাদিন কিছুই খাইনি তিনি তখনই আমায় ফিরে যেতে আদেশ করলেন। তিনি বললেন আমার আবার ম্যালেরিয়া হতে পারে। তিনি জানতেন আগের বছর আমার ম্যালেরিয়ায় কী অবস্থা হয়ে ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা ছিল। তিনি কি আমার এই অন্ধ আবেগের কাছে আত্মসমর্পণকে ঘৃণা করছিলেন? জাগতিক যন্ত্রণার যারা দাস তারা এই হিন্দু সাধুদের সহানুভূতি পাবার অনুপযুক্ত। ওঁদের জাগতিক মোহমুক্তির আদর্শ ওঁদের বাস্তবের রূঢ়তার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে। অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিকতা ওঁদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে জগৎ ও জীবন থেকে। আমি বেলুড় মঠে কোনো সান্ত্বনা খুঁজতে যাইনি, গিয়েছিলাম আমার স্মৃতির মৈত্রেয়ীকে, প্রকৃত মৈত্রেয়ীর অস্তিত্ব অনুভব করতে।

স্বামীজীর কথায় আমি একটুও ক্ষুব্ধ হইনি বরং আমি আরও সত্যি করে জানতে পারলাম আমার নিঃসঙ্গতাকে। যেসব ফল, মিষ্টান্ন উনি আমার জন্য আনিয়ে ছিলেন সেগুলোর জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি আবার যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু আমি কলকাতার রাস্তা ধরলাম না। এগিয়ে চললাম। সন্ধ্যা হয়ে এলো। গঙ্গার ধারে একটা পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গঙ্গার জল দেখতে লাগলাম। নিস্তরঙ্গ সেই জল অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে কলকাতার দিকে। কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে ততক্ষণে আমাকে ঘিরে ধরেছে। প্রথমে তারা আমাকে দেখে কুকুরের ডাক ডাকছিল, তারপর অশুদ্ধ ইংরেজীতে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করছিল, 'White monkey', 'White monkey', কিন্তু যখন ওরা দেখলো যে আমি রাগ করছি না, তারা আমার দিকে এগিয়ে এলো। ওরা হয়তো লক্ষ্য করেছিল আমার চোখের জল, আমার চিন্তান্বিত বিষণ্ণ মুখ। ওরা একটু ইতস্ততঃ করে আমার

দিকে এগিয়ে এলো। আমি ওদের সঙ্গে বাংলায় কথা বললাম, ওদের মধ্যে কিছু খুচরো পয়সা বিতরণ করলাম। ওরা আনন্দে হই-হই করে প্রায় একটা শোভাযাত্রা করে আমায় গ্রামের প্রান্ত অবধি পৌঁছে দিলো। দুপুরে বৃষ্টির ফলে সন্ধ্যা ছিল নির্মল, কিন্তু ভারী আর বিষণ্ণ। আমার হাঁটতে ভালো লাগছিল। বড় রাস্তায় আমি একা। মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। গাড়িগুলো যাচ্ছিল কলকাতার দিকে। কদাচিৎ দু একজন পথচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছিল। ভাবছিলাম ভারতের লোকেরা কী তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে! সেই নির্জন রাস্তায়, সন্ধ্যা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভবানীপুরের সন্ধ্যাগুলোর কথা মনে পড়ছিল। গলার কাছে ব্যথা করে উঠলো। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হচ্ছিল। দূরে একটা দোকানের আলো দেখা যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি পা চালালাম। দোকান থেকে এক প্যাকেট সিজারস্ সিগারেট কিনলাম, কারণ একমাত্র সিজারস্ই সেখানে পাওয়া যায়। দোকানের ভেতরে একটা গ্যাসের আলো জ্বলছিল আর কয়েকজন পথিক হুঁকো খেতে খেতে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

জানি না রাত কটা অবধি আমি হেঁটেছিলাম আর যে গ্রামগুলো পার হয়েছিলাম তাদের নামই বা কি ছিল। অন্ধকারে আমি হেঁটে চলেছিলাম এক অন্ধ মোহের বশে। এইভাবে আমি আমার চিন্তাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছিলাম। মনে হচ্ছিল মৈত্রেয়ীর প্রতি ভালোবাসাই ওই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যোগাচ্ছিল। রাস্তার ধারে মাথায় ছাউনিওয়ালা একটা জলের কল ছিল। আমি একটু জল খাবার জন্য সেখানে থেমেছিলাম, কিন্তু চওড়া বাঁধানো বেদীতে বসা মাত্রই জগতের সমস্ত ক্লান্তি আমাকে আক্রমণ করলো। নিজের অজান্তেই আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম মাথার তলায় টুপিটাকে বালিশ করে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। মৈত্রেয়ীর স্বপ্নে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে বসলাম। লোকালয় থেকে বহু দূরে নির্জন জায়গা ; প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমি কাঁপছিলাম। আবার কখন যে আমি শুয়ে পড়েছি জানি না, কয়েকজন লোকের জল তোলার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। আমাকে অবাক্ দৃষ্টিতে সবাই দেখছিল, কিন্তু কেউই আমায় কিছু প্রশ্ন করতে সাহস করলো না। যদিও আমার জামাকাপড় ছিল কর্দমাক্ত, জুতো ছিল ছেঁড়া তবু তো আমি 'সাহেব'।

জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম। একটু ভালো লাগছিল। আবার চলা শুরু করলাম। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোকচলাচল শুরু করলো। আমি মাথা নিচু করে হাঁটছিলাম। তালগাছের শ্রেণীর মধ্য দিয়ে গঙ্গা দেখা যাচ্ছিল। শুধু

ওই নদীটিকে দেখার জন্যই আমি মাঝে মাঝে থামছিলাম। বহমান নদীর দৃশ্যে আমাকে এক অবর্ণনীয় সান্ত্বনা দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই জল চলেছে মৈত্রেয়ীর শহরে, মৈত্রেয়ীর কাছে। আমার নিজের শারীরিক কষ্ট সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না। এতটুকু দুর্ভাবনা ছিল না মিসেস রিবেইরো বা হ্যারল্ড কী ভাববে, চিন্তা করবে সে সম্পর্কে। শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল খোকা নিশ্চয়ই আমার খোঁজ নিতে এসে জানবে যে আমি সকালে বেরিয়ে আর ফিরিনি, একটা দিন পার হয়ে গেছে। ও নিশ্চয়ই মিঃ সেনকে জানাবে। মিঃ সেন আমার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার অন্তত ভাববেন আমার সঙ্গে কী ব্যবহার উনি করেছেন।

একটা ছোটখাটো শহরের কাছে রাস্তার ধারে একটা পান্থশালায় আমি কিছু খেয়ে নিলাম। খাদ্যের মধ্যে ছিল ভাত, তরকারি, মাছের ঝোল। উপস্থিত ক্রেতাদের অবাক্ করে দিয়ে আমি মাটিতে বসে হাত দিয়ে ভাত মেখে খেলাম। ইতিমধ্যে তারা আমায় বাংলায় কথা বলতেও দেখেছে। আমার পোশাক নোংরা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চুলে চিরুনি পড়েনি তবুও আমি তো শ্বেতকায়! খাওয়া সেরে আমি আবার পথে নামলাম। সন্ধ্যা অবধি হেঁটে চললাম। দিনটা ছিল সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত। প্রতিটি জলের কলের কাছে আমাকে থামতে হচ্ছিল জল খাবার জন্য আর মুখে-চোখে জল দেবার জন্য। আকাশে তারা ফুটতে শুরু করলো। হাঁটতে হাঁটতে আমি একটা এঁদো পুকুরের ধারে প্রকাণ্ড আম গাছের বাগানের ধারে এসে পড়লাম। আর পারছিলাম না। আম গাছের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড মশার কামড় উপেক্ষা করার শক্তি দিলো আমার শ্রান্তি।

পরদিন বেশ বেলায় আমার ঘুম ভাঙলো। হাত পা সব মনে হলো অবশ হয়ে গেছে। তবু আবার রাস্তায় নামলাম। সারাদিন ধরে আবার হাঁটা শুরু হলো। ক্রমশ মস্তিষ্ক জড় হয়ে গেল। বিশেষ কিছু আর মনে করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ছে যে আমি একটা গরুর গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি কোথায় এসে পড়েছি, জায়গাটার কি নাম আর কী করে রেল স্টেশনের দিকে যেতে পারবো। লোকটা আমায় বর্ধমানের কাছে একটা হল্ট স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল। তখন বেশ রাত। কলকাতা যাবার প্রথম ট্রেন আসে ভোরবেলা এবং এখানে থামেও না। প্রায় মাঝরাত্রে একটা লোকাল ট্রেন বর্ধমান যায়। আমি একটা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটলাম।

বর্ধমান স্টেশনের তীব্র আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বহুক্ষণ

অন্ধকারে থাকার ফলে হয়ত ওইরকম হয়ে ছিল। বহুকাল রোগে ভোগা রুগীর মতো আমি জেগে উঠলাম দারুণ কোলাহলের মধ্যে। এইবার আমি একটা ইণ্টার ক্লাসের কাউণ্টার খুঁজছিলাম। আসলে আমার লজ্জা করছিল কয়েকজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইংরেজদের দেখে যারা লক্ষ্ণৌ মেল ধরবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

শীতে জড়সড় হয়ে আমি স্টলে চায়ের পর চা খেয়ে যাচ্ছিলাম এবং চেষ্টা করছিলাম গত বাহাত্তর ঘণ্টার ঘটনাগুলোকে পর পর মনে করতে। কিছুতেই সব পর পর সাজাতে পারছিলাম না, বড় বড় ফাঁক দেখা দিচ্ছিল। আমার স্মৃতি ঠিক কাজ করছিল না। ওই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! ঠিক করলাম আর কিছু ভাববো না। সব কিছুই চলে যাবে, যেমনটি চলার। এই সান্ত্বনা-বাক্যটা পরবর্তীকালে সারা জীবন মনে রেখেছিলাম।

হাওড়া স্টেশনে নেমে প্রচণ্ড ভয় হতে লাগলো। ভয় হচ্ছিল ভবানীপুরের কারোর সঙ্গে না দেখা হয়ে যায়। হঠাৎই মনে পড়ে গেল মিঃ সেনের পরিবারের সবারই এখন মেদিনীপুরে থাকার কথা। অন্য সময় হলে এই ঘটনা, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আমার দূরত্ব বাড়ার জন্য হয়ত যন্ত্রণা দিতো কিন্তু আজ আশীর্বাদ বলে মনে হলো।

আমি আমার গাড়ি থেকে বাড়ির সামনে নেমেই শুনলাম পার্ক স্ট্রীটের পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যে আমার নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমার এই প্রায়-পাগলের মতো মূর্তি দেখে মিসেস রিবেইরো অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন,—হায় ভগবান! কোথা থেকে আসছেন? এ কি চেহারা আপনার! south 1147 আপনাকে অনবরত টেলিফোনে ডাকছে, আর সেই ছেলেটি, যাকে আপনি খোকা বলে ডাকেন, সে কতবার আপনার খোঁজ করতে এলো!

মিসেস রিবেইরোকে ছেড়ে আমি মুখ-হাত-পা ধুতে চলে গেলাম। একটু স্নান, সেই সময় আমার একান্ত দরকার ছিল। হ্যারল্ড অফিস থেকে টেলিফোন করে মিসেস রিবেইরোর কাছে আমার খোঁজ নিচ্ছিল। আমি ফিরেছি শুনে সে তৎক্ষণাৎ একটি ট্যাক্সি নিয়ে আমাদের বোর্ডিং হাউসে এসে উপস্থিত হলো।

—কোথায় ছিলি? কী করছিলি? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার নয়। এত

চিন্তা করছিস কেন তোরা?—মৃদু হেসে আমি জবাব দিয়েছিলাম।

—তুই? তুই কেমন আছিস?

—গতকাল মেয়েরা সবাই এসেছিল। সবাই দারুণ চিন্তিত। আমাদের ইচ্ছে ছিল, পৌত্তলিকদের হাত থেকে তোকে মুক্ত করা উপলক্ষে চায়না টাউনে একটা পার্টির ব্যবস্থা করবো—কিন্তু কী হলো? ও হ্যাঁ, ওই 'নিগার' ছেলেটি আবার এসেছিলো তোর খোঁজ নিতে। মনে হলো একটু রেগে গেছে...আমায় বিরক্ত করছিল। আমি দূর করে দিয়েছি।

ঠিক দুপুরের খাওয়ার পর আশুতোষ মুখার্জী রোডের একটা লাইব্রেরি থেকে খোকা আমায় ফোন করলো। জানলাম ইতিমধ্যে অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে। অতি অবশ্যই সে আমার সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করতে চায়। আমি ওকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসতে বলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

—আপনি কোথায় ছিলেন?

—পরে সব বলবো। আগে বলো ওখানে কি হয়েছে?

বাস্তবিকই অনেক কিছু ঘটে গেছে। মৈত্রেয়ীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সে নাকি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, সে ফুলশয্যার রাত্তিরে তার স্বামীর কাছে স্বীকার করবে আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের সমস্ত কথা। সমগ্র পরিবারের সম্মানে এটা যথেষ্টই আঘাত দেবে। তার স্বামীও নিশ্চয়ই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং গোটা শহরে কেচ্ছা রটবে। এই কথা শোনামাত্র মিঃ সেন সজোরে ওকে একটি ঘুষি মারেন আর ও মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর একটানা লাথি মেরে যেতে থাকেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর স্ট্রোক হয় এবং মিঃ সেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। যদি রক্তচাপ দু একদিনের মধ্যে কমে, তাহলে তাঁর চোখে অপারেশন হবে। কিন্তু তাঁর অবস্থা নিয়ে চিকিৎসকগণ দুশ্চিন্তিত। এদিকে মৈত্রেয়ীকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। ঘরে বন্ধ করার আগে মিসেস সেন ড্রাইভারকে ডেকে এনে, ড্রাইভারকে দিয়ে তাঁর সামনে মেয়েকে বেত মারার আদেশ দেন। ড্রাইভার একটানা বেত মেরে গিয়েছিলো যতক্ষণ না মৈত্রেয়ী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। মিসেস সেন খোকাকেও বলেছিলেন মৈত্রেয়ীকে চাবুক মারতে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে এবং সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ছবু ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, ফলে সেও এখন হাসপাতালে।

মৈত্রেয়ী খোকার হাতে আমাকে একটা খাম পাঠিয়েছিলো। গোলাপী খামটার ভেতরে জলপাই গাছের একটা মুকুল সমেত দুটো পাতা পুরে দেওয়ার সুযোগটুকু কেবল তার হয়েছিল। আর একটি ছোট্ট কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখা ছিল, 'অ্যালেন, এই আমার শেষ উপহার।'

আমি একটা ঘোরের মধ্যে খোকার কথাগুলো শুনে গেলাম। পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। খোকা কিছু লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। আমার নরেন্দ্র সেনের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়লো। আমি বললাম—কী প্রয়োজন? আর কী তার দরকার আছে? আরও কী কী যেন সব বলেছিলাম....

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে আমি ভুল বকছি। আমার চারদিকে সব কিছু ঘুরছে।

আমি যদি পারতাম! যদি আমি পারতাম! আমি, আমি কি ওকে ভালোবাসি? খোকা বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি চিৎকার করে বললাম,—আমি ভালোবাসতে চাই। তার আগে ওকে ভালোবাসার উপযুক্ত হতে চাই আমি। মিসেস রিবেইরো দৌড়ে এলেন। হতভম্ব হয়ে আমার কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

—আমি মৈত্রেয়ীকে ভালোবাসতে চাই। আমি ওদের কী করেছি? আমার বিরুদ্ধে ওদের কী বলার আছে? আমার বিরুদ্ধে আপনাদের সকলের কী বলার আছে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিন সকালে টেলিফোনে মৈত্রেয়ীর কথাগুলো —'চিরবিদায় অ্যালেন, চিরবিদায় প্রিয়তম। অন্য জীবনে আমরা নিশ্চয়ই ফিরে পাবো আমাদের ভালোবাসা। দুজনে দুজনকে নিজের করে পাবো। তখন তুমি আমায় চিনতে পারবে তো? আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো? আমায় ভুলো না অ্যালেন। আমি কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

আমি ওকে কিছুই উত্তর দিতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম—মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, আমার মৈত্রেয়ী....

আমাদের বিচ্ছেদের সপ্তম দিনে আমি চলে গেলাম। চলে যাবার আগের দুই রাত্রি আমি কাটিয়েছিলাম মিঃ সেনের বাড়ির সামনের রাস্তায়। সারাক্ষণ আমি চেয়েছিলাম মৈত্রেয়ীর শোবার ঘরের জানালার দিকে। জানালা অন্ধকার। একবারের জন্যেও আলো জ্বলেনি।

আমার যাত্রার দিন ছবু মারা গেল।

১৪.

কয়েক মাস হিমালয়ের কোলে, রাণীক্ষেত আর আলমোড়ার মাঝামাঝি এক বাংলোয় কাটালাম। হতাশা, উৎসাহহীনতা আর বুক-চাপা স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সময়।

দীর্ঘদিন দিল্লী, সিমলা, নৈনিতাল ঘুরে চারপাশে কেবল লোকজনের, বিশেষ করে সাদা মানুষের ভিড়ে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এখানে এসে ছিলাম। আমার আজকাল লোক-সমাগমকে বড় ভয় করে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, ওরা অভিবাদন জানালে প্রত্যুত্তর দিতে প্রবৃত্তি হয় না, বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে একদম ভালো লাগে না। আমার এখন চাই বিশ্রাম, কেবল বিশ্রাম। ওরা আমার সেই বিশ্রামের বাধা-বিশেষ। নির্জনতাই এখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা, আমার বাঁচবার একমাত্র উপায়।

আমার মনে হয়, একাকীত্বের কী জ্বালা, তা কত হতাশাব্যঞ্জক এবং তিক্ত হতে পারে, তা খুব কম লোকই আমার মতো করে উপলব্ধি করতে পেরেছে। মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচমাস আমি কেবলমাত্র একটি লোকেরই মুখ দেখেছি, সে হলো এই বাংলোর পরিচারক। আর কেউ আমার ঘরে আসতো না। এর সঙ্গেও আমি খুব কমই কথা বলতাম, তাও কেবলমাত্র যখন ও আমার খাবার নিয়ে আসতো বা জল ভরে রেখে যেতো। আমি আমার সমস্ত সময় অরণ্যে কাটাতাম। হিমালয়ের আলমোড়া অঞ্চলে পাইনের এক বিখ্যাত বন আছে। আমি সেই বনে ঘুরে বেড়াতাম। এমাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত আমার ভালোবাসার জনকে নিয়ে নানা কল্পনায় মশগুল থাকতাম। সে সব কত অলীক স্বপ্ন, কল্পনা,—মৈত্রেয়ী আর আমি, যেন কত সুখে, কত আনন্দে এই বনের নির্জনতাকে সাক্ষী রেখে একাত্ম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কখনো বা ফতেপুর সিক্রির মৃতপুরীতে, কখনো বা জঙ্গলের এক পরিত্যক্ত কুটিরে, শুধু সে আর আমি।

সারাদিন, সারারাত, দিনের পর দিন আমি আমাদের দুজনকে ঘিরে কত স্বপ্ন, কত ছায়াময় চিত্রকল্প—সারা পৃথিবীর থেকে দূরে, একান্ত একান্তে একাত্ম হয়ে থাকার কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতাম। বিগত দিনের কত ভুলে-যাওয়া স্মৃতি, কত ছোট ছোট তুচ্ছ অথচ মধুময় ঘটনা আবার জীবন্ত হয়ে উঠতো আমার অন্তরে। কত গভীর, কত নিবিড়, কত ললিত গীতিময় সে সব ব্যথার গাথা। যে-সব তুচ্ছ জিনিসকে আগে কখনো কোনো মূল্যই দিইনি, সেগুলো এখন আমার অন্তর্দৃষ্টিতে জ্বলজ্বলে ভাস্বর হয়ে উঠছিল। আমি যেন মৈত্রেয়ীকে

ভেঙে ভেঙে গড়ছিলাম, সেই পাইন, চেস্টনাটের ছায়ায় ছায়ায়, পাহাড়ে, জঙ্গলের পথে পথে। আমি আমার সেই অপূর্ব ভাবনার অন্তরঙ্গতায় এমন আপ্লুত ও আবিষ্ট হয়ে থাকতাম যে, মাঝে মাঝে আমার ভয় হতো। এই স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়, আমি আমার এই যন্ত্রণাময় শারীরসত্তা নিয়ে বাঁচবো কী করে। আমি জানতাম, এবং নিশ্চিন্তই ছিলাম যে, মৈত্রেয়ীও তার ভবানীপুরের ছোট্ট ঘরে বসে বসে আমারই মতো গভীর চিন্তায় মগ্ন, আমাদের চাওয়া-পাওয়া, আমাদের মিলন, কিংবা আমাদের বিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু।

কোনো কোনো শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় আমি বনের পথে বেরিয়ে পড়তাম, হয়ত একটা টিলার ওপর উঠে দূরে কোনো অঝোরে-নেমে-আসা ঝর্ণার শুভ্র নির্ঝর দেখে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠতাম—"মৈত্রেয়ী মৈত্রেয়ী" যতক্ষণ না আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি—আমি আমারই শব্দের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত হতে শুনতে পেতাম। যেন এক স্বপ্নের পথ ধরে, অবর্ণনীয় সুখ আর প্রশান্তি বুকে নিয়ে বাংলোয় ফিরে আসতাম ; মনে হতো, মৈত্রেয়ী নিশ্চয়ই আমার ডাক শুনতে পেয়েছে, ঐ আকাশের মধ্য দিয়ে বাতাস ও ঝর্নার ধারায় ভেসে ভেসে আমার প্রাণের আর্তি নিশ্চয়ই তার কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমি জানি না, মানুষের মনের কোন্ পর্যায়কে তার সঠিক আত্মসত্তা বলা যায় ; এই দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে সম্পূর্ণ নির্জনতার সমুদ্রে অবগাহন করতে করতে আত্মসত্তা বলতে, বোধ হয়, আমার একটা অন্যতর ধারণা জন্মাচ্ছে। বেশ কিছু দিন হলো যেন মৃত্যু আর আমি পরম বন্ধুতে পরিণত হয়েছি, —যেন প্রচণ্ড আশাবাদী দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে চলেছি,—সে তো আমার কাছেই রয়েছে, বন্ধুর ইচ্ছেই আমারও চরম ইচ্ছে,—তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বেশ ইওরোপীয়ান টেকনিকের প্রেম, ভালোবাসার পায়োনিয়ারিজম্—যেন মৃত্যুই আমাকে উদ্ধার করার জন্য বুক চিতিয়ে বীরদর্পে হাজির হয়ে রয়েছে আমার পাশে, যেমন করে ইওরোপীয়ানরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেই মনে করেছে, এই পোড়া দেশের জন্যে ওরাই সভ্যতাকে মাথায় করে নিয়ে এলো। আমার এখন সব কিছুই বৃথা, নিরর্থক বলে মনে হয়—সবই অলীক, সবই মায়ার ভ্রম মাত্র। সব কিছুই। কেবল আমার সেই কয়েকমাস ভরা নিরন্তর প্রেম, তার সুখস্মৃতি আর আজকের আমার এই যন্ত্রণার ও দুর্দশার অনুভূতিটা ছাড়া। আমার এই যে আত্ম-অনুশোচনার অনুভূতি, এটা শুধু মৈত্রেয়ীকে হারানোর জন্যই নয়, আমি আমার আশ্রয়দাতা গুরুর প্রতি যে অন্যায় ও

পাপ করেছি, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা অতুলনীয়া মায়ের প্রতি, ছোট্ট ছবুর জীবনের প্রতি, সেই মেয়েটা—মৈত্রেয়ী—যাকে আমি চরম বিপদের মধ্যে ফেলে এসেছিলাম, সে সবের জন্যেও আমার এই মানসিক যন্ত্রণা। এই সমস্ত দুশ্চিন্তা আমার বুকের ভেতর চেপে বসে যেন আমার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন নিজেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আমার বোধ হয় ঘুম-পাড়ানী মাদকের দরকার, যাতে না-স্বপ্ন, না-কোনো জ্ঞান, না-মৃত্যু, না-পাপ, না-বিচ্ছেদ—কিছুই উপলব্ধি করতে পারি।

আমার ডায়েরির পাতা নিত্য বেড়েই চলেছে, কিন্তু ২৩শে অক্টোবর তারিখটায় পৌঁছতে আমার বড় ভয়, বড় অস্বস্তি। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ তারিখটা আমার জীবন থেকে যেন মুছে গেছে। একটা বড় খামে আমি কিছু জিনিস সীল করে রেখেছিলাম—মৈত্রেয়ীর কয়েকটা চিঠি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চিঠি, ছবুর চিঠি, একটা শুকনো গোলাপফুল, একটা চুলের কাঁটা, মৈত্রেয়ীর কিছু হিজিবিজি-কাটা কাগজ, বেশির ভাগই ফ্রেঞ্চ গ্রামারের নোট লেখা,—এক কথায়, আমার প্রিয়তমার সঙ্গে নিবিড়তম অধ্যায়ের কিছু চিহ্ন। আমি আজকাল মাঝে মাঝেই খামটা খুলে সেগুলো দেখি আর সেই জীবনকাহিনীর শেষ অধ্যায়টা লক্ষ্য করি। এই মধুময় স্মৃতিটুকুর কথা কি আমি লিখে বোঝাতে পারবো?

আমার ডায়েরিতে আমি লিখে রেখেছি, আমার অকপট সরলতা, পক্ষপাত-শূন্যতা এবং সেন্টিমেন্টাল অহমিকার জন্য আমি কী ভাবে, কত পর্যায়ে দীর্ঘ দিন ধরে ঠকে আসছি। বাংলোয় থাকাকালে আমি কোনো চিঠি পেতাম না, ফলে কাউকে চিঠি দেবার দায়ও ছিল না। বাংলোর পরিচারক মাসে একবার, বড়জোর দুবার নৈনিতাল শহরে যেত জিনিসপত্র সওদা করতে এবং এই বনবাদাড়ে একেবারেই মেলে না এমন বস্তু কিনে আনতে। তখন আমি মাঝে মাঝে দু এক লাইনের চিঠি দিতাম ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে, বা কখনো হ্যারল্ডকে টেলিগ্রাম করে জানাতাম যে আমি এখনো বেঁচে আছি।

খ্রীস্টমাস নাগাদ আমার কাছে হঠাৎ একটা 'সারপ্রাইজ' এলো, তাতে আমি বুঝতে পারলাম এখনো কীভাবে আমার খোঁজ-খবর চলছে, এবং আমার পক্ষে এখনো কলকাতায় ফেরা কতখানি বিপজ্জনক। আমার ব্যাঙ্কে খোঁজখবর করে খোকা ইতিমধ্যে জেনে গেছে পাহাড় অঞ্চলে আছি। সে নৈনিতালের পোস্ট মাস্টার মশাইয়ের প্রযত্নে একটা চিঠি দিয়েছে। বাংলোর পরিচারক যখন আমার নাম-লেখা খামটা আমার হাতে এনে দিলো তখনও আমার

বিশ্বাস হচ্ছিল না যে সত্যিই চিঠিটা আমাকে লেখা। ও ভেবেছিল অ্যালেন দীর্ঘদিন হলো আর এখানে নেই, নিশ্চয়ই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দূরে কোথাও চলে গেছে। আমি আমার ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। আমি প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছি, যেন আমি মিঃ সেন বা মৈত্রেয়ী বা মিসেস সেনের হাতে ধরা পড়ে গেছি। খোকা লিখেছে, ওঁরা পরিবারবর্গ মিলে কিছুদিন মেদিনীপুরে কাটিয়েছে। সেখান থেকে মৈত্রেয়ী নিজেই আমাকে তাড়াহুড়ো করে কয়েক লাইন বিচ্ছিন্নভাবে লিখে পাঠিয়েছে। ও ঐ খামের মধ্যে কয়েকটা বুনো ফুলও পাঠিয়েছে, হয়তো গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে কোথাও থেকে তুলেছিল। আমি বুঝেছি, ও আমার এই নেহাৎই বস্তুবাদী, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পার্থিব মানুষের আসল চেহারাটা দেখে দুঃখ পেয়েছে। ও নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনায় আর একজন অ্যালেনকে সৃষ্টি করেছে আর তার সঙ্গে এ পৃথিবীতে বাস্তবে অসম্ভব যাবতীয় স্বর্গীয় কল্পনা দিয়ে অপরূপ রূপকথা গড়ে তুলেছে, যা এ বস্তু জগৎ থেকে বহু-উর্ধ্বে, বহুদূরে এক অপার্থিব স্বপ্নময় সত্তা।

ও আমায় লিখেছে—আমি তোমায় হারিয়ে কী করে বাঁচবো! তুমি যে আমার সূর্য, তোমার কিরণধারাই যে আমার প্রাণসত্তা!—আর একটা টুকরো কাগজে লেখা—তুমি বাতাস, তুমি ফুল,—ও আরও লিখেছে—এই ফুলের গুচ্ছগুলোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আমি তোমার একান্ত নিবিড় আলিঙ্গন অনুভব করি—আর এক জায়গায় লেখা,—প্রতি রাতেই তুমি আমার কাছে আসো, যেমন করে তোমাকে আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে পেতাম আর আমি তোমার কাছে কনে-বউ সেজে যেতাম। তুমি আমাকে নারীত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলে। আর তুমি, তুমি আসো অজস্র মণিমুক্তা-সজ্জিত সুবর্ণ দেবতার মতো, অসীম অপার সুষমায় আমি তোমার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হই, আর তুমি আমাকে বুকে তুলে নাও। তুমি আমার কাছে শুধু প্রেমিক নও, তুমি আমার দেবতা, আমার সূর্য, আমার জীবনসর্বস্ব...

আমিও যে এক অদ্ভুত পৌরাণিক কালের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে পড়ছি। একটা ব্যাপার ভেবে আমি ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছি এবং সঙ্কুচিত বোধ করছি যে আমার মতো সামান্য রক্ত-মাংসের মানুষকে, মানুষ দেবতা বানায় কি গুণে? আমি ভাবতে লাগলাম কোন্ নিরন্তর আদর্শের মহিম অনুভূতি মানুষকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করে, কোন্ মহীয়সী প্রেম মানুষকে সূর্যের মহিমা দান করে। আমি নিজেকে যেন এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে আবিষ্কার করলাম। আমিও

তো কল্পনায় সব সময়ই ভবানীপুরে মৈত্রেয়ীর সঙ্গেই আছি, কত নিবিড় ভাবে আমার সমস্ত পৌরুষ দিয়ে ওকে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছি। যতই অলীক হোক, আমার মধুর স্বপ্ন নিয়তই আমাকে ঘিরে রইল। সমস্ত আকুলতা, সমস্ত আন্তরিক আর্তি দিয়ে যেন আমরা এক অনন্ত সম্পূর্ণতায় একে অন্যকে ঘিরে রয়েছি নিরন্তর। মৈত্রেয়ীর পুরাণ-কল্পনা আমাকে দেবপ্রতিম করে তুলেছে, একটা অবাস্তব আদর্শ মাত্রে পর্যবসিত করেছে। অথচ আমি আমার মধ্যে তার কল্পনার সেই সূর্যকে বা তার স্বপ্নের 'ফুলকে' খুঁজে পাচ্ছি না যাতে আমি তার যোগ্য হয়ে থাকতে পারি ; আমি তো নেহাৎই রক্ত-মাংসের মানুষ, সব দোষ-ত্রুটি, আবেগ-উচ্ছলতা নিয়েই।

আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। কেন মৈত্রেয়ী আমার থেকে এত দূরে চলে গেল? যদি ভবিষ্যতে আবার যোগাযোগ করার জন্য পাগলই হবে, তাহলে ওকে ভুলে যাবার জন্যে আমায় অনুরোধ করেছিল কেন? ও আজ আমাকে যেমন করে ভাবছে, কে ওর মাথায় এই রকম আমাকে দেবতা বলে ভাবার অনুপ্রেরণা দিল? আমি তো দেবতার দূরত্ব চাই না, আমি তো বাস্তবে, এখনি তাকে একান্ত করে কাছে পেতে চাই। সব থেকে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠলো সেই পরম মধুর একান্ত করে পাওয়ার সুখ-স্মৃতিগুলো। ওর রক্তমাংসের অস্তিত্বটাকে নিয়ে আমি কত ভাবে, কত আশ্লেষে আদর করেছি, খেলা করেছি। সে যেন আমার সমস্ত চাওয়ার, সমস্ত ইচ্ছার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তার দেহ, তার মন, তার সব কিছু, যার মধ্যে আমি নিজেকে বারবার আবিষ্কার করি,—আমার স্মৃতিতে যেন সব কিছু চলচ্চিত্রের মত দৃশ্যমান। আমি পৃথিবীর কোনো সম্পদের বিনিময়েই এই স্বপ্নকে ভুলতে রাজি নই। এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমার আদর্শ, আমার অপার্থিব সত্তা। কিন্তু আমি কেবল স্বর্গীয়, অপার্থিব আদর্শের প্রতিরূপ হয়ে থাকতেও রাজি নই।

খোকা আমাকে আরও কিছু নতুন খবর পাঠিয়েছে। অপারেশনটা সাক্সেস্‌ফুল হয়নি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে আবার নতুন করে দু-মাসের ছুটি নিতে হয়েছে। মিসেস সেনের চেহারা একেবারে ভেঙে গেছে। তাঁর মুখের ভাব হয়েছে প্রশান্ত সন্ন্যাসিনীর মতো। মৈত্রেয়ী ভয়ে শঙ্কায় খুব শুকিয়ে গেছে। সে কিন্তু সমস্ত রকম বিয়ের প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কলকাতায় ফিরে আসার পর থেকে ও নাকি ক্রমাগতই আমার রয়েড স্ট্রীটের বাসায় ফোন করার চেষ্টা করেছে। ওর ধারণা আমি এ সহরেই রয়েছি কিন্তু আমি

ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে দেখা করছি না। খোকা নাকি একদিন আমার পুরনো বাসায় গিয়েছিল। মাদাম রিবেইরো ওর কাছে আমার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করে বলেছেন যে উনি আর আমাকে তাঁর ওখানে থাকতে দিতে রাজি নন। আমি দুতিন সপ্তাহ বাইরে থাকবো বলে এসেছিলাম, কিন্তু তারপর থেকে চার মাসের ওপর হয়ে গেল, আমি বেঁচে আছি কিনা সে খবর পর্যন্ত কেউ জানে না। আমি কেবল হ্যারল্ডকেই কটা ঠিকানাবিহীন টেলিগ্রাম করেছিলাম। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মন্টুকে প্রচণ্ড ধমক দিয়েছেন, সে মিসেস সেনের অবাধ্য হয়েছিল বলে। বেচারা ছেলেটার বড় দুঃসময় চলেছে। বিয়ের সময়ের চুক্তি অনুযায়ী ওকে এখন অনেকগুলো টাকার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, ততদিন পর্যন্ত লীলু আলাদা থাকবে। লীলু এখন তার মা-বাবার কাছে, আর ও আছে একটা অল্পভাড়ার ছাত্রাবাসে। দিনের পর দিন শুধু চায়ে পাঁউরুটি ভিজিয়ে খেয়ে পয়সা জমাচ্ছে, ঋণ পরিশোধ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লীলুকে নিয়ে আসবে বলে।

খোকা চিঠিটা শেষ করেছে, কবে নাগাদ ফিরবো ঠিক করেছি সে কথা জিজ্ঞেস করে। সে ঝেড়ে জ্ঞান দিয়েছে, আমি যেন নিজের কেরিয়ার নষ্ট না করি, অথবা তুচ্ছ একটু ভালোবাসাবাসি খেলা নিয়ে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট না করি। সব মানুষেরই জীবনে এরকম একটু আধটু হয়, তাই বলে কেউ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকে না ; শক্ত হাতে এ সব মোকাবিলা করতে হয়। এটা কোনো সমাধানই নয়। শেষে সে আবার যোগ করেছে, কবে ফিরছ?

আমারও ভেতরে অনেকদিন ধরেই এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে, কবে ফিরছি, কিন্তু আমার কলকাতার জীবনের কথা আমি কিছুতেই ভাবতে বা মেনে নিতে পারছি না। তা ছাড়া, কলকাতায় ফিরে হবেই বা কী! আমার তো সেখানে কোনো কাজকর্ম নেই। আমাকে আমার আগের অফিস থেকে কোনো কাজের সার্টিফিকেট দেয়নি। কাজেই নিষ্কর্মা বেকার হয়ে ওখানে গিয়ে কোনোই লাভ নেই। আমার পকেট বরং নির্জন পাহাড়ে কম খরচে এখনো বছর খানেক থাকার অনুমতি স্বচ্ছন্দে দিতে পারে। কিন্তু তারপর? আমি তো ফতুর হয়ে যাবো। তখন আমায় অনেক দূরে, যেমন জাভা বা অন্য কোথাও চলে যেতে হবে এবং সেখানে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে...। অবশ্য এ ভাবা নেহাৎই ভাবার জন্যে ভাবা। সত্যি সত্যিই আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না, নেহাৎই যদি

বিদেশে একটা চাকরি-বাকরি না জুটে যায়। আমার সমস্ত কর্মক্ষমতা, সমস্ত উচ্চাশা, জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্যই যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, হারিয়ে গেছে। এখন সে সবের স্বপ্নও বরং আমাকে দুঃখ এনে দেয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলায়। বাংলোর বারান্দায় বসে বসে আমি কেবল পাইনের বন, পাহাড় দেখি, অবাস্তব কল্পনা করি, আর ধ্যান-মগ্ন হয়ে থাকি...এই সুন্দর অমলিন বনটার চাইতে মনোরম সুন্দর আর কিই বা আছে? অথচ কেউ তাদের প্রশ্ন করে না, কেন তারা বাড়ে, কেউ তাদের অতুলনীয় সৌন্দর্যকে দুচোখ ভরে দেখে না, কেন? কেন? আমি গাছ হতে চাই, গাছ হয়ে মহাসুখে, শান্তভাবে হাওয়ার ভরে হেলতে দুলতে চাই, গঙ্গার পাড়ে, জলের ধারে...। আমার আর কোনো ভাবনা নেই, কোনো অনুভূতি কাজ করছে না, কোনো স্মৃতি আর ভারাক্রান্ত বা বিব্রত করছে না...। জীবনের কোনো সাড়াই আর জাগছে না, যা আমাকে আবার জনসমাজে ফিরে যেতে প্রলুব্ধ করতে পারে। আমি যেন পাথর হয়ে গেছি, উজ্জ্বল স্ফটিক! তবু স্ফটিকের আলো আছে, উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু প্রাণহীন পাথরের? নিষ্প্রাণ পাথরের?

আমি আসার সময় একখানা বইও নিয়ে আসিনি। আমার মাথার মধ্যে কেবল কতকগুলো ভাবনা কাজ করছিল, যাতে আমি নির্জন একাকীত্বের জীবনে কিছুটা স্বস্তি ও শান্তি পেতে পারি। আমার এই দীর্ঘ নির্জনবাসে কেবল সামান্য কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হয়েছি, যারা আমার সমান, ব্যথার ব্যথী, বরং আমার চেয়েও গভীর অথচ প্রাণবন্ত, স্বাধীনচেতা। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকার চেয়ে আমি মুক্ত প্রকৃতির বুকে মুক্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেই বেশি ভালোবাসি। কিন্তু আসলে আমি নিজের কাছে সব দিক দিয়ে বন্দী...আমার ভাবনার জগতে কয়েকটা দিক নিষিদ্ধ প্রদেশ, যেমন, ২৩শে অক্টোবরের স্মৃতি...।

মার্চের শুরুতে, একদিন, বেশ একটু বেশি রাতেই, হঠাৎ বাংলোয় এক অজানা অতিথি এসে উঠলো। ডাকাডাকিতে জেগে উঠে বাংলোর পরিচারক তাকে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিলো। কিন্তু তার খিচুড়ি ভাষা এতই দুর্বোধ্য যে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আমার ডাক পড়লো। হিমালয়ান ফারের বিশাল কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরুলাম, আমাকে প্রায় এক মঙ্গোলিয়ান মাউন্টেনিয়ার বলে মনে হচ্ছিল। বারান্দায় একটা লম্বা-ইজি-চেয়ারে এক ভদ্র-মহিলা আধ-শোয়া অবস্থায় বসে আছেন, দেখেই বোঝা যায় বেশ ক্লান্ত। ট্রেঞ্চ-কোটে ঢাকা চেহারায় খেয়ালই করিনি তার চুলগুলো বাদামী-লালচে এবং

হাত দুটো বেশ বড়সড়। মাত্র কয়েকটা হিন্দুস্থানী শব্দ তাঁর সম্বল। আমাকে দেখেই তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্বস্তিতে। তখনো তিনি হাঁপাচ্ছেন।

তিনি জানালেন যে তিনি রাণীক্ষেত থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসেছেন, পথ হারিয়ে ফেলে নানা দিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে, একটা বেশ বড় ঝর্ণা পেরিয়ে শেষে এই বাংলোটা খুঁজে পেয়েছেন। তিনি আমায় তাঁর এই একা দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বিশদভাবেই বললেন। শুনে বুঝলাম কাজটা তাঁর উচিত হয়নি। তাঁর নাম জেনি আইজাক্, আসছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন থেকে এবং বেশ কয়েকমাস ধরে ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি হিমালয়ের বুকে একটা এমন ধর্মস্থান খুঁজে বেড়াচ্ছেন যেখানে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান পেতে পারেন। প্রথম কথাতেই বুঝলাম, তিনি এ জগৎ সম্পর্কে খুবই নিস্পৃহ, শান্ত ও স্থির, ঐ একটি উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আর জগতের কোনো কিছুর প্রতিই আকর্ষণ নেই। বাংলোর পরিচারক বারান্দার বড় আলোটা জ্বালতে আমি তাঁকে আরো ভালো করে দেখতে পেলাম। তিনি নিতান্তই তরুণী, নীল চোখ, সুন্দর গোল মুখ, কিন্তু একেবারেই ভাবলেশহীন, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, গলার স্বর যেন ছোট্ট মেয়ের মতো, হাত দুটো লম্বা, বিশাল বুক—রীতিমত স্বাস্থ্যবতী। পরনে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকের বিচিত্র পোশাক, পুরো মাউন্টেনিয়ারের চেহারা। ভদ্রমহিলা ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিলেন। পরিচারক বেশি করে চা এনেছিল, তিনি সবটাই খেয়ে ফেললেন, আর মাঝে মাঝে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। তিনি প্রায় একটানা দুদিন ধরে হেঁটেছেন। তিনি হেঁটে বদ্রীনাথের মন্দিরে যাবার জন্য বেরিয়েছেন, প্রায় তিরিশ দিন এদিক ওদিক ঘুরে মাইখালি পৌঁছান। পথের দিশার কথা শুনে আমি চমকে গেলাম। ও পথটা তো এখন পুরো বরফে ঢাকা! ঘন কুয়াশার মধ্যে জমাট ঠাণ্ডায় হাঁটতে গিয়ে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। ওঁকে এখন হরিদ্বার হয়ে যেতে হবে বলে জানালাম। মোটামুটি আমার যতটা জানা আছে, সেটাকে মূলধন করেই বললাম, ওকে প্রথম কোট-দ্বারায় যেতে হবে, সেখান থেকে ট্রেনে হরিদ্বার যাওয়া যাবে। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি ঐ সব জায়গায় যাচ্ছি. না এখন বেশ কিছুদিন এই বাংলোতেই থাকবো।

বড় সমস্যাজনক প্রশ্ন। আমি শুকনো অনাগ্রহী গলায় জবাব দিলাম, আমি এখনো কিছু ঠিক করিনি, তবে মনে হচ্ছে কিছুদিন থেকে বিশ্রাম নেবো, তাছাড়া, এই নির্জন পাহাড়ে সুন্দর পাইনের বন, আমার ভীষণ ভালো লেগে

গেছে। এখানে বড় একটা কেউ আসে না।

পরের দিন আমি প্রতিদিনের নিয়ম মতো সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ে, বনে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘুরে, কেক রুটি যা ছিল খেয়ে, ঝর্ণার জল যেটুকু সম্ভব মুখে দিয়ে, বেশ রাত করেই বাংলোয় ফিরলাম। ঢুকতেই পরিচারক জানাল, 'মেম্‌সাব' অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এবং আমি ফিরলেই দেখা করতে বলেছেন। বেচারা জেনি আইজাক্! তাঁর দুচারটে হিন্দুস্থানী শব্দের বিদ্যে নিয়ে নিশ্চয়ই খুব ফাঁপরে পড়েছিলেন। আমি ওঁর দরজায় টোকা দিলাম। জ্বরের ঘোরে বসে যাওয়া গলায় ভেতরে যাওয়ার ডাক এলো। বুঝলাম, তিনি রীতিমতই অসুস্থ, আর শঙ্কিত হলাম যে পাহাড়ী জ্বরের প্রকোপ এখন বেশি। বড় পাজি রোগ। জ্বরে কাঁপছেন, কিন্তু ভয় পান নি। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় হিন্দুস্থানী কথাবার্তার একটা তালিকা তৈরি করে দিতে অনুরোধ জানালেন, এক কাপ কোকো খেতে চাইলেন। পরিচারক ভাষা না বোঝার ফলে কিছুই আনতে পারেনি...।

আশ্চর্য, এই নির্জন পাহাড়ের বুকে একেবারে একা, এখানকার ভাষা জানা নেই, পথের হদিশ জানা নেই, কোনো দিক থেকে সাহায্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবু কত নিশ্চিন্ত, নির্ভীক,—এই অসুখের মধ্যেও। তিনি আমায় জানালেন, গত দু তিন সপ্তাহ ধরেই তাঁর এই রকম ঘুরে ফিরে জ্বর আসছে। তিনি অসুস্থ হয়ে আলমোড়ায় এক ভুটানীর কুঁড়ে ঘরে বিশ্রাম নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। আমি তাঁকে বললাম, এ ভাবে কিছু না জেনে শুনে অপ্রস্তুত ভাবে ভারতবর্ষের বনে-পাহাড়ে ঘুরতে আসা তাঁর উচিত হয়নি। তিনি বোধহয় লজ্জায় একটু লাল হলেন, কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলেন--আমি অনন্ত ব্রহ্মকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

আমি এক বিরাট হাসিতে ফেটে পড়লাম। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই হাস্যকর, মজাদার মনে হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই আমায় নিজেই থেমে যেতে হলো। ভদ্রমহিলার কোনো উত্তেজনার বালাই নেই। এমন আত্মমগ্ন ঠাণ্ডা, অনুত্তেজিত, জগতের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগী মহিলা আমি কখনো দেখিনি। তারপর তাঁর গলায় 'ব্রহ্ম' কথাটা শুনে মনে হলো সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এই মিস্টিক নাটকীয় কথাটা বেশ ভালই ছড়িয়েছে, আর তার সঙ্গে এই অঞ্চলের গল্প—অথচ আমি তো দীর্ঘদিন এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছি.....।

আমি এ-প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা করলাম। আমি তাঁকে মহাত্মা গান্ধী আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ওপর প্রশ্ন করলাম। অবান্তর প্রশ্ন, আমায়

কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি নিজেই বাতিল করতাম। তিনি বললেন, এটা ইংরেজদের ব্যাপার, তাঁর কিছুই মন্তব্য করার নেই, তিনি ফিনল্যাণ্ডের এক ইহুদী বংশের মেয়ে ; তবে তাঁর মতে, তিনি সাদা-চামড়ার লোকেদের ভণ্ডামী একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, এবং সেজন্যেই—এ সব থেকে দূরে থাকার জন্যেই তিনি ঠিক করেছেন কোনো এক আশ্রমে গিয়ে সত্যের, জীবনের, অমৃতের সন্ধানে রত হবেন। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে আমি অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতটা কিভাবে ভারতবর্ষের মহান্ সংস্কৃতিকে নেহাৎই ফকিরি, মিস্টিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপার বলে অপপ্রচার করে আসছে, রামচরকের বইয়ে যে সমস্ত অবান্তর ধর্মীয় সত্যের এবং ক্রিয়া-কর্ম ভাবনার কথা বলা হয়েছে, তার প্রভাব অনুভব করলাম। এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ভদ্রমহিলা দীর্ঘদিন ধরে একা ; তিনি আমার সব কথাকেই সরাসরি নাকচ করছেন, তবু কথা বলছেন, কারণ অন্তত একজন মানুষ পেয়েছেন যে তাঁর কথা শুনছে, বুঝুক বা না বুঝুক। কথায় কথায় জানতে পারলাম তাঁরা পাঁচ বোন। তিনি কেপটাউনের মিউনিসিপ্যাল অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজাতেন ; জোহান্সবার্গের কনসার্টেও বাজিয়েছেন। মাসে চল্লিশ পাউণ্ড স্টার্লিং আয় ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেননি—তারা বুর্জোয়া মনোবৃত্তিসম্পন্ন,--মেয়েরা বিয়ে ছাড়া আরও যে কিছু করতে পারে তা তারা ভাবতেই পারে না। তিনি এই শ্বাসরোধ করা পরিবেশকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর কাজ ছিল রোজ রাতে তাঁর নিজের পয়সায় কেনা ছোট মোটর গাড়িতে চড়ে কনসার্টে বাজাতে যাওয়া, আর...।

তিনি হয়তো পরম উৎসাহে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে, এই অজুহাতে আমিই চলে এলাম। আমি তাঁকে বলে এলাম, যে-কোনো রকমের প্রয়োজন হলেই যেন আমাকে ডেকে পাঠান, তারপর খুব সন্তর্পণে তাঁর সঙ্গে মৃদু হ্যাণ্ডসেক করে বিদায় নিলাম।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম, অনন্ত ব্রহ্ম ব্যাপারটার মূল চরিত্রটা কী, যার আশায় ভদ্রমহিলা তাঁর সব কাজকর্ম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁর জন্যে আমার খুবই করুণা হলো, বেচারা শুধু রামচরক ছদ্মনামে ইংরেজ এক গল্পকারের অনন্ত ব্রহ্ম সম্পর্কে গল্প শুনেই একটা মোটামুটি সভ্য দেশের কর্ম, স্বাধীনতা ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন! অনেকক্ষণ ধরে তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁর সব আবিষ্কার, যার মধ্যে দিয়ে তিনি "এক নতুন ইন্দ্রিয়াতীত

জগতের" সন্ধান পেয়েছেন, সে সব এক অপার্থিব, রহস্যময় ব্যাপার। একদিন নাকি রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে একটা লাইব্রেরির নাম পেয়েছেন, যার সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। পরের দিন সকালে কোথায় যেন যাবার পথে তাঁর গাড়িটা মাঝ পথে দুর্ঘটনায় পড়ে, হঠাৎ দেখেন সামনেই সেই স্বপ্নে দেখা লাইব্রেরিটা। অথচ তিনি কেপটাউনের এই পথটা ধরে কতশতবার যাতায়াত করেছেন, কিন্তু এর আগে কোনোদিন তাঁর এটা চোখেই পড়েনি। তিনি তার ভেতরে ঢুকে প্রচুর ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও যোগ সম্পর্কে বই দেখতে পেলেন। তিনি রামচরকের প্রচুর বই পড়েছেন। সেগুলো ভারতাত্মা সম্পর্কে "গভীর জ্ঞানসঞ্চারী"।

দিন কয়েক ধরে আমার অনন্ত ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে হয়েছে। আর সেই অভ্যাসমত স্বপ্নালু কল্পনা আর তার ধ্যানে মেতে থাকতে পারছি না...। জেনি এখনো বেশ অসুস্থ, আমার তার কাছে থাকাটাই বেশি প্রয়োজন। এ কদিনেই সে আমার ওপর এত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যে তার এত দিনের একাকীত্ব ও মানবসঙ্গ ছেড়ে আসার কথা ভুলে সে সবসময় ছুতো-নাতা করে পরিচারককে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠাচ্ছে। অন্তরঙ্গতার সূত্র ধরে সে এখন দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে তার জীবনকাহিনী শোনাতে ব্যস্ত, অনেক কিছু তার একান্ত ঘটনাও নাকি সে আমার কাছে স্বীকার না করে শান্তি পাচ্ছে না। সে বলছে, তার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগে তার জীবনের সব কথা আমাকে বলা দরকার এবং সে তার গোপন প্রেম-ভালোবাসার কথাও অকপটে ব্যক্ত করেছে। সে বিশ্বাস করে যে নেহাৎই একঘেয়ে চলতি চরিত্রগুলোর থেকে সে একেবারেই আলাদা জাতের এবং সে নাকি মাদাম বোভারির মতো এক সময় তার জীবনে ক্রমাগত পুরুষ সঙ্গ করে এসেছে একের পর এক। তখন তার মনে হয়েছে সেটাই সব থেকে মহৎ এক আদর্শ বিশেষ, এক চরম সত্য। কিন্তু এখন নানা অভিজ্ঞতায় জেনির এই জগতের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, এই সমাজ, পরিবার, প্রেম-ভালোবাসা, সবকিছু তার কাছে এক বিরাট ভুয়ো প্রবঞ্চনা বলে মনে হয়। সে যে কত কষ্টে এই সব পার্থিব বাঁধন থেকে মুক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে, সব কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে, সে সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে তার ভাবলেশহীন মুখে ব্যথার রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে তার সঙ্গীত ও শিল্পজগৎ থেকে বিদায় নেওয়া সত্যিই খুব বেদনার। সত্যিকারের ভালোবাসার অভিজ্ঞতা তার জীবনে সামান্যই...সে বলেই ফেললো, যারা তার কাছে এসেছে তারা কেউই

তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে আসোন। যাকেই সে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরেছে, পরে দেখেছে তারা প্রত্যেকেই অন্য কারো ঘনিষ্ঠ প্রেমিক। সে বুঝেছে, তার মন-প্রাণ দেওয়া প্রেম কারো কাছে কোনো মানসিক আকর্ষণ সৃষ্টি করেনি, তাই সে ইচ্ছে করেই দৈহিক প্রেমের চরম সুখ কোথায় এই নিয়ে যেন গবেষণা করে এসেছে তার নিজের দেহ দিয়েই, তারপর এই পার্থিব বস্তু-জগতের মায়া ত্যাগ করে সে অনন্ত ব্রহ্মের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এই তো, আফ্রিকা ছেড়ে বেরিয়ে আসার মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগেই সে এক জার্মান ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছে, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে তার হাতে। ছেলেটি একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। সে জেনির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল, সত্যি বলতে কি বোধহয় ভালোবেসেই ফেলেছিল। সে বিশ্বাসই করতে চায়নি জেনির ভালোবাসার ছলনা আদপেই হৃদয়ের ভালবাসা নয়, তার এক নিষ্ঠুর খেলা মাত্র, দৈহিক মিলন-সুখের ছেলেখেলা। আসলে ভালোবাসার পাত্রদের সে মন থেকে ঘেন্না করে। সে তার বিশ্বাসের এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে পৌঁছলে মনে হওয়া সম্ভব, সমস্ত পুরুষ মানুষই এক একটা কামুক পশু মাত্র, এক একটা ক্ষীণজীবী, জড়ভরত, শুয়োর। সত্যিকারের প্রশংসনীয় পুরুষ হচ্ছে সে, যার ভেতরে বিচার-বিবেচনা, বিবেক ও অন্যের প্রতি সহানুভূতি, মমত্ববোধ আছে, এবং যে আদর্শের জন্যে "পার্থিব সুখ"কে হেলায় ত্যাগ করতে পারে। যেমন, সন্ন্যাসী, দার্শনিক বা কোনো অধ্যাত্ম-রহস্যসন্ধানী।..জেনির মাথায় এখন নানা রকমের অসংলগ্ন ভাবনা-চিন্তা ভীড় করে আছে। ওর নিজের জীবনের মানসিক বঞ্চনার ইতিহাস এবং বর্তমানে নানা নারীসুলভ কুসংস্কার—পুরুষ সম্পর্কে "মহানুভব পুরুষ", "দেবসুলভ চরিত্র", "নির্জন জীবন", "সর্বত্যাগ", ইত্যাদি ভাবনা ওর সব গুলিয়ে দিয়েছে...।

আমি এ-সমস্ত শুনে প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলাম। আমি যেদিন থেকে জনসমাজ ত্যাগ করে এই নির্জন পাহাড়ে বাস করছি, সেদিন থেকে আমার মনে একটাই চিন্তা রয়েছে, আমাকে একটা আদর্শকে রূপ দিতে হবে, যে-কোনো মূল্যেই হোক। আর এই মেয়েটা অনন্ত ব্রহ্মকে খুঁজতে গিয়ে সব কিছু এমনি গুলিয়ে ফেলেছে যে কেবল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে এবং নিজেই নিজেকে কষ্ট দিয়ে মারছে। ওর মাথার ভেতর হাজারো রকমের বিভ্রান্তিকর ধারণা কিলবিল করছে।

প্রতি রাত্রে আমি যখন ঘরে ফিরে আসি, আমি আমার ডায়েরিতে আমার

নিত্যদিনের চিন্তা, ধারণা, অভিজ্ঞতা লিখে রাখি। আমার মনে হচ্ছে, জেনির এখানে আসাটা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা সাধারণ ঘটনা নয়। ওর উপস্থিতি বোধ হয় আমার সঙ্গে আবার নতুন করে আমার স্বেচ্ছায় ছেড়ে-আসা বস্তু-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই জেনি সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং শারীরিক বল ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এখনো তার চলে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আমার প্রতি তার মনোভাবও আমূল বদলে গেছে। প্রথম দিকে ওর কথাবার্তা আমাকে বেশ বিরক্ত ও উত্যক্ত করতো। কিন্তু ও আমার প্রতি বেশ আকর্ষণের ভাব দেখাচ্ছে, আমার কথার মূল্য দিচ্ছে, এবং কতকগুলো বিষয়ে তার প্রতি আমার প্রশংসাকে সাগ্রহে গ্রহণ করছে, এক কথায় ওর ভেতর দিয়ে আমি আবার আমার ইওয়রোপীয় মূল্যবোধকে যাচাই করে নিচ্ছি, কারণ আমিও তাদের ফেলেই দূরে এসেছি, হয়তো আবার তাদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে কিছুদিনের মধ্যে বা অনেকদিন পরে। কিন্তু আমার এবং আমার নতুন তরুণী বান্ধবীর স্বার্থেই এই যাচাই হয়ে যাওয়াটা জরুরি ছিল।

একদিন ওর ঘরে ঢুকতে গিয়ে আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে থ' মেরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে জেনি তখন প্রায় নগ্ন অবস্থায়। আমি অস্বীকার করবো না, সেদিন আমি উত্তেজনা এড়াতে পারিনি, হাঁ করে তাকিয়েছিলাম সেই মোহময়ী রূপের দিকে।

সে রাতে নানা ভাবনা আমার মাথায় ভিড় করে রইলো। আমি নিজেকে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, মৈত্রেয়ীর ওপর আমার এই যে লাগাম-ছাড়া ভালোবাসা, বাস্তবে তা কেবল আমার জীবনে প্রবল আঘাত, বিচ্ছেদ, আমার সব কিছু ছেড়ে এভাবে নির্জনে অজ্ঞাতবাস, নিজেকে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত করে ফেলা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। এই প্রেমের নেশা আমাকে একটা জরদগব সেন্টিমেন্টাল, ভীতু ক্লীবে পরিণত করেছে মাত্র। আমার সমস্ত পৌরুষ নিয়ে কর্মজগতের মুখোমুখি দাঁড়ানোর, নিজের ব্যক্তিত্বকে ও কর্মক্ষমতাকে সকলের সামনে প্রতিষ্ঠা করার বদলে আমি জড়, অক্ষম, ব্যর্থতার জীবন বেছে নিলাম কেন! এক তুচ্ছ নারীর ভালোবাসাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে আমি এই যে সর্বত্যাগী জীবনকে বেছে নিয়ে নিজেকেই নিরন্তর বঞ্চনা করে চলেছি, এর শেষ কোথায়? এখনো কি সেই নারীর, সেই প্রেমের মৃতপ্রায় স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আগামী দিনের বাস্তব সম্ভাবনাগুলোকে বিসর্জন দেবার কোনো যুক্তি আছে? নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে

রাতটা আমার প্রচণ্ডভাবে ছটফট করে কাটলো। আমার মনে হতে লাগলো একটা ভুয়ো আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে গিয়ে আমি আমার সমস্ত জীবনটাকেই বিপথে নিয়ে চলেছি, যেটা একমাত্র মূর্খের মতো নিজেকে ধ্বংস করে দেবার পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এটাও ঠিক, আমার মনের এখন যে অবস্থা, তাতে নতুন করে আবার নারীসঙ্গ, আবার সেই সংগ্রামের, কামনার, ব্যর্থ আকর্ষণের বাস্তব জগতের প্রতি আর আমার কোনো মোহ রাখতে ইচ্ছে করছে না। আমার এখন এই জীবনের বিনিময়ে একটা জিনিস দেখারই প্রচণ্ড আগ্রহ যে, এই পৃথিবী ও তার নারী জাতি নিজেরা আমার দ্বারা কখনো আকর্ষিত হয় কিনা। আমার এই পলায়নী মনোবৃত্তি আর জগতের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, অনীহাই কি আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী নয়? আমি নিজে ছাড়া আর কেউ কি জোর করে আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে ? আমার কি এখনো নতুন করে ভাবার, নতুন পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে?

আমি জেনিকে যেন নতুন চোখ দিয়ে দেখতে চাইলাম। এবার আর আমার কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা কষ্ট হলো না, কোনো অযথা সেন্টিমেন্ট কাজ করলো না, প্রথম প্রেমের বিহ্বল অনুভূতি হলো না। আমার স্বাধীনতায় আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

কেপটাউন ছেড়ে আসার সময়ে জেনির ভেতরে বস্তুজগতের প্রতি যে অনীহা তার নারীত্বের স্বাভাবিক ধর্ম ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাকে রুক্ষ কর্কশ করে ফেলেছিল, আমার সান্নিধ্য নিঃসন্দেহে তাকে তার সেই অবস্থার ফাঁদ থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে আরও স্নিগ্ধ কোমল রমণী করে তুলেছে। ও বোধহয় আমাকে ওর নারীত্বের মোহজালে বন্দী করতে পেরেছে...আমি যদি তাকে গ্রহণ করি, তার মধ্যে দিয়ে আবার নিজের কাছে প্রমাণ করে দিতে পারি যে আমার ভেতরের চিরকালের সেই পুরুষটা এখনো মরেনি,—আমার সমস্ত দোষ, ত্রুটি, ক্ষুদ্রতা, উচ্ছল অনুভূতি নিয়েই আমি একটা মানুষ...আবার যদি পৃথিবীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াই, আমাকে তো বাধা দেবার কেউ নেই ; আমি এতাবৎ যা করে এলাম, তার বিপরীতটা করারও সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে...।

আমার স্বীকার করতেই হবে যে জেনি ক্রমশ আমার কাছে আরও কোমল, আরও স্নিগ্ধ, আরও বেশি করে নারী হয়ে যাচ্ছে। সে আমার সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছে, "তিব্বতের রহস্য" সম্পর্কে

জানতে প্রচণ্ড আগ্রহী, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওটা ওর একটা ছল মাত্র। তার চোখ দুটো আরও ভাসা ভাসা, অর্ধনিমীলিত হয়ে উঠেছে যেন কী এক আরামে মদির নেশায়, তার গলার স্বরে এক উষ্ণ আবিল সুর, যেন অনেক বেশি রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে ও। মাঝে মাঝেই ও সামান্য কথায় উচ্চকিত হয়ে হেসে খুন হচ্ছে, কারণে অকারণে আমার মুখের সামনে পরম যত্নে চকোলেটের কাপ তুলে ধরছে,—সবচেয়ে বড় কথা, যখন সে প্রথম এলো, তখন তার মুখে মেয়েলী প্রসাধনের চিহ্নমাত্র ছিল না ; এখন সে মুখে পাউডার মাখছে, সুন্দর ভাবে মেক-আপ করছে, সাজছে। সে অনবরত আমার কাছে জানতে চাইছে আমি এই নির্জন জগতে একা একা পড়ে আছি কেন, আমার হাতে এই কালচে পাথর বসানো আংটিটা কে দিয়েছে, ইত্যাদি।

সবচেয়ে মজার কথা হলো, জেনিকে দেখে এবং ওর সঙ্গে কথা বলার মধ্যেও আমি মৈত্রেয়ীর আভাস পাচ্ছি। আমার অন্তরে এখনো নিরন্তর প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে মৈত্রেয়ীর অধিষ্ঠান। যখনই আমি কল্পনা করতে চাইছি, যে আমি কোনো নারীসঙ্গ উপভোগ করছি,—যেমন হাতের কাছে জেনিই তো রয়েছে, —তখনই আমি ভেতর থেকে টের পাচ্ছি যে সেটা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ভালোবাসার প্রতিটি অভিব্যক্তির মধ্যেই একটা দুরুদুরু শিহরণের ভাব থাকে, কিন্তু আমার পক্ষে আর সেই ভাব ফিরে পাওয়া অসম্ভব। মৈত্রেয়ী আমার প্রাণ, মন সমস্ত সত্তাকে এমন ভাবে ঘিরে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তার স্মৃতি আমাকে আর কোনো কিছুর দিকে তাকাতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। সর্বত্র সে এসে দাঁড়াচ্ছে মূর্তিময়ী হয়ে, আমার যে-কোনো ভুলত্রুটির সম্ভাবনাকেই শাসন করছে, আমার পৌরুষের সম্মান যাতে ধুলোয় লুটিয়ে না পড়ে। তাহলে আমি কী করবো? তাহলে আমি কি আর এলোইজ্ বা আবেলারের মতো দুর্মদ, দুর্দমনীয় হতে পারবো না এ জীবনে? আমার যে আবার স্বাধীন ভাবে সবকিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে, আবার একবার পরখ করে দেখতে ইচ্ছে করছে মৈত্রেয়ীর পরও আর একবার কাউকে নির্দ্বিধায় ভালোবাসতে পারি কিনা, নতুন প্রেমের জোয়ারে আর একবার ভেসে যেতে পারি কিনা। কিন্তু আমার পক্ষে আমার পুরনো সংস্কার ভেঙে নতুন করে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমারই কতকগুলো বিভ্রান্তিকর মনোভাব। আমি যেন কিছুতেই নতুন অভিজ্ঞতার ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছি না। বাধার শেকল ছিঁড়তে পারছি না। আমি কি সত্যিই নিজেকে বুঝতে ভুল করছি..?

জেনি আগামী সোমবার চলে যাবে বলে ঠিক করেছে। ও রাণীক্ষেত থেকে

একটা কুলি পাঠাতে লিখে দিয়েছে। শেষের এই কটা দিন ও যেন বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। নানা ছল-ছুতোয় কেবল আমার কাছে কাছে ঘুরছে, অকারণে ঘুরছে, অকারণে হাসছে, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, যে পরিব্রাজক জীবন সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই, যাতে শুধু একাকীত্বের যন্ত্রণাই সার, সেরকম জীবনের দিকে এগোবার দরকার কী? আমাকে বার বার বোঝাচ্ছে, ওর আর আমার মতো নির্জন জীবন-যন্ত্রণার স্পৃহা নেই, কারণ সেখানে কারও পথ চেয়ে থাকার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ওর এই হঠাৎ নারীত্বের জাগরণে বেশ মজাই পাচ্ছি। শনিবার সন্ধ্যায় খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছিল, ঘন কুয়াশা ভেদ করে আকুল করা ছায়া-ছায়া মেঘ-জ্যোৎস্না। আমার ভেতরটা যে ঠিক কিরকম করছিল তা বোঝাতে পারবো না ; কেন আমি আমার ভেতরটাকে এ ভাবে চেপে রেখেছি, আমি এত সতর্কভাবে নিজের কাছে কী গোপন করতে চাইছি? আমি ঠিক করে ফেললাম আজ এই বারান্দায় বসে ওকে মৈত্রেয়ীর সমস্ত কাহিনী শোনাবো।

কাহিনী বলতে বলতে মাঝ রাত পেরিয়ে গেল, সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জেনি আর আমি তখনও বসে আছি বারান্দায়। একটু চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নেবার জন্যে আমরা দুজনে ওর ঘরে ঢুকলাম। আমি ইতিমধ্যে মৈত্রেয়ী প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ শেষ করে এখন খোকার চিঠির কথা বলছি, এবং জেনিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি মৈত্রেয়ীকে ভুলেই যাবো ঠিক করেছি,—আর এই অযথা যন্ত্রণার স্মৃতি মনের মধ্যে পুষে রাখবো না। যা গেছে তা যাক্। সেদিন ভাবের আবেগে কী যে বলেছি আর কী না বলেছি, তা নিজেই ভেবে পাই না। সেদিন যেন হঠাৎ খুশির মত্ততায়, বোকার মতো নিজেকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করতে রীতিমত বাচালতা এবং ভাঁড়ামিই করে ফেলেছি। আমি একটা সামান্য মানুষ, কেন যে অসামান্য একনিষ্ঠা দেখাতে গিয়েছিলাম, এই কথা ভেবে নিজেই হেসে খুন হয়েছি। জেনি শুকনো মুখে স্থির, স্তব্ধ হয়ে সব ইতিহাস শুনেছে, ওর দু চোখে জলের ধারা নেমেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ও কাঁদছে কেন। ও কোনো উত্তর দিলো না। আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত দুটো আমার হাতের মধ্যে নিলাম, তার দুবাহু দুহাতে চেপে ধরলাম যেন নতুন সঞ্চারিত আবেগে। সে আমার খুব কাছে এসে মাথা নিচু করে রইলো। আমাদের দুজনের উষ্ণ নিঃশ্বাস, দুজনকে স্পর্শ করতে লাগলো—আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধরা গলায় চরম উৎকণ্ঠায় বললাম—কাঁদছো কেন? বলো, বলো! এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও চোখ বুজলো, তারপর

হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুম্বন করতে লাগলো।

প্রচণ্ড আনন্দ আর উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে আমি ঘরের দরজার খিলটা লাগিয়ে দিলাম.....।

ডায়েরির পরবর্তী পাতাগুলোয় মনে হচ্ছে আর মৈত্রেয়ীর ইতিহাসে ভরে রাখতে পারবো না। এই সব স্মৃতির বোঝা টেনে বয়ে বেড়ানোর আর কোনো প্রয়োজনই দেখছি না। এই দীর্ঘদেহী, সবল ফিনল্যাণ্ডবাসিনীর শ্বেতশুভ্র দেহ দুহাতে আঁকড়ে ধরে আমি আর মৈত্রেয়ীর কথা ভাবতে চাইছি না—জেনিকে প্রতিটি চুম্বন করার মধ্যে যে মৈত্রেয়ীর কথা মনে আসছে, সে মৈত্রেয়ী আমার বঞ্চনার ইতিহাস, তাকে আমি মন থেকে দূর করে দিতে চাই সম্পূর্ণভাবে। দীর্ঘদিন যে বরতনুকে ঘিরে আমার সেদিনের প্রেমের স্বপ্নসৌধ গড়ে উঠেছিল সে প্রেমের আজ সমাধি হয়েছে। আমি এখন কথা-প্রসঙ্গে যে মৈত্রেয়ীর কথা টেনে আনছি, সেটাও বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা নিয়েই।

আমি কি মৈত্রেয়ীকে সত্যিই ভুলতে চাই, না কি আমি নিজের কাছে জোর করে প্রমাণ করতে চাই, আমার ভেতরে প্রেমের নিষ্ঠা বা একনিষ্ঠা বলে কিছুই নেই? আবার নতুন করে প্রেম করতে আমার এতটুকুও কষ্ট, এতটুকু দ্বিধা হবে না? আমি নিজের মনের ভেতরটা যথেষ্ট হাতড়েও কোনো সদুত্তর পাচ্ছি না ; নাকি এটা আমার প্রথম অভিজ্ঞতাহীন জীবনে একটি ভুলের বোঝা মাত্র? যার ফলে এই কাদায় পড়া অবস্থা।...আমি কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারছি না যে সেই সব আপাতমধুর স্মৃতিগুলো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কী করে? আবার,—আমি নিজেকে সেই সব হতভাগ্যদের সঙ্গে একাসনেও বসাতে পারছি না, যারা ভালবাসে, আবার ভুলে যায়, এবং এই করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দেয়, প্রেম যে চিরন্তন, নির্দিষ্ট একনিষ্ঠতার প্রসাদ, তা মনে না রেখেই। কয়েক সপ্তাহ আগেও আমি এটা ভাবতে পারতাম না।...কিন্তু জীবন এক অদ্ভুত অস্তিত্ব, আমারই দাঁতের বিষে আমি জর্জরিত, দোষ দেবো কাকে?

এ-সব জিজ্ঞাসা আমার মনে ঝড় তুলছে, তার কারণ মৈত্রেয়ীর ওপর আমার ভালোবাসা যে কতটা শক্তিশালী তা আমি জানি। একথা ঠিক যে জেনির সোহাগে, আলিঙ্গনে আগুন আছে, কিন্তু সে আগুনে আমি গা ঘিন্ ঘিন্ করতে করতে নিজেকে আহুতি দিয়েছি। যা করেছি, করেইছি, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এর পর আর একটি নারীসঙ্গের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আমার অনেক—অনেক দিন লেগে যাবে। আর দুটো ক্ষেত্রের অস্তিত্বই আলাদা। আমি যাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসি, সে হলো মৈত্রেয়ী, একমাত্র

মৈত্রেয়ী। জেনি যখন নানাভাবে তার নিজস্ব ভঙ্গী এবং রুচিতে আমাকে আদর-সোহাগ করে চলেছে, তখন আমি দাঁতে দাঁত চেপে থেকেছি। বেচারা জেনি, নেহাৎই মেয়েমানুষ। সে আমার দেহে পাশবিক সাড়া জাগিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছে, কিন্তু আমার মন থেকে, হৃদয় থেকে মৈত্রেয়ীকে মুছে দিতে পারেনি। অন্তরে যে নারীর স্মৃতিসত্তা চির জাগরূক হয়ে আছে, সে হলো মৈত্রেয়ী, একমাত্র মৈত্রেয়ীই। আর কেউ নয়।

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি সব সময় আমার বুকের ওপর পড়ে থাকতে চাইছো কেন?

সে তার ভাবলেশহীন দুটো নীল চোখ বড় বড় করে মেলে, ছোট বাচ্চা মেয়ের মতো বলে উঠলো, তুমি মৈত্রেয়ীকে যেমন করে ভালোবাসো, আমাকেও তেমনি করে ভালোবাসবে বলে।

আমি চুপ করে গেলাম। এ রকম আকাঙ্ক্ষা কি সম্ভব? এই রকম ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা?

—যখন তুমি গল্প করো, মৈত্রেয়ীকে তুমি কতো ভালবাসো, তখন আমার নিজেকে বড় একা, বড় দুঃখী মনে হয়। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে....কান্না পায়।

আমার মনে হয়, ও বুঝে ফেলেছে যে, আমি যে আদর সোহাগ উপভোগ করেছি সেটা নেহাৎই দৈহিক ইন্দ্রিয়ানুগ, আমিও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি না। পরদিন ভোরে ওর ঘর থেকে আমি যেন মুক্তিস্নান করে বেরিয়ে এলাম। ও তখনও বিছানায় লেপ্‌টে শুয়ে আছে দোমড়ানো মোচড়ানো বাসি ফুলের মতো, আমার মৈত্রেয়ীকে ভোলবার পাগল-পারা চেষ্টার চিহ্নস্বরূপ সমস্ত বিছানাটা এলোমেলো, নয়-ছয় হয়ে আছে।..

আমি সোমবার তাকে পাইন বন পেরিয়ে দূরে সেই ঝর্ণা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলাম। হায় ঈশ্বর! আমাকে কেন এ-পথে নিয়ে যাচ্ছো? জেনি আইজাক! তোমাকে কি আমি কোনোদিন স্বপ্নেও কাছে পাবো?

আমার এই নির্জনে পড়ে থাকা, এই একাকীত্ব এবার আমার নিজের কাছে কী রকম বিরক্তিকর, বোকামি বলে মনে হতে লাগলো। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে আমার সাধের স্বপ্ন বার বার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। আমি লক্ষ্য করছি যে, আজকাল সব স্মৃতি যেন অলীক কল্পনা বলে মনে হচ্ছে...আমার দিনে ক্লান্তি, রাতে অনিদ্রা..।

এর পর থেকে সব কিছু যেন বদলে যেতে লাগলো। একদিন সকালে

আমি উপলব্ধি করলাম, এবার ফিরাও মোরে। আশ্চর্য, প্রভাত-সূর্যের দিকে সরাসরি তাকিয়ে দেখলাম, সোনালী কিরণ, আর সবুজের মেলা। আমি বেঁচে গেছি। আমি মৃত্যুর কালো শীতলতা থেকে উদ্বেল আবেগ নিয়ে মুক্তি পেয়েছি। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে, ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করছে। আমি বুঝতে পারছি না কী করে এ অসম্ভব সম্ভব হলো? কোন্ অপার্থিব শক্তি আমাতে ভর করে আমাকে আবার বদলে দিয়েছে, সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তায় পরিণত করেছে!

আমি নির্জন পাহাড়কে বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম।

১৫.

দিনের পর দিন আমি একটা চাকরির খোঁজে পোর্ট কমিশনার্স অফিস এবং অন্যান্য জায়গায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।...কথা দিয়েছিল ফ্রেঞ্চ কন্‌স্যুলেটে ট্রানশ্লেটরের চাকরি করে দেবে, সেটাও পাওয়া গেল না। আমার সম্বল বলতে আর শত খানেক টাকার বেশি কিছুই নেই, অথচ এখানে থাকতে গেলে আমার কিছু রোজগারের ব্যবস্থা চাইই। এই বিপদের সময়ও হ্যারল্ড আমার প্রতি প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করলো। আমি তাকে বলেছিলাম আমায় কটা দিন তার ঘরে থাকতে দিতে,—আমি ১৫ তারিখেই তার বাসা ছেড়ে দেবো, কিন্তু সে আমার কথা রাখতে অস্বীকার করলো একটা বাজে অজুহাতে, যাতে আমি বিপদে পড়ি। সে বললো, আমি নাকি আর খ্রীস্টান নই, কাজেই একজন পৌত্তলিকের সঙ্গে সে একঘরে শুতে পারবে না। আসল কথাটা হলো, সে আমার অবস্থাটা পুরোই জানতো। সে জানতো, আমার কাছে আর বিশেষ টাকা নেই, আর আমার এখুনি একটা ভালো মাইনের চাকরিরও সম্ভাবনা নেই। মাদাম রিবেইরো এই সুযোগে ভুলেই গেল আমি তার জন্য কতটা করেছি। সে কেবল হ্যারল্ডের ঘরে আমাকে নেহাৎ দেখে ফেলে, অনেক কষ্টে এক কাপ চা খাওয়াতে চাইলো মাত্র। আমার আর বিক্রি করে পেট চালানোর মত অবশিষ্টও কিছুই নেই। খুব ভেঙে পড়লাম। বড় অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে। বড় হতাশায়, বড় কষ্টে...।

আমি আবার খোকার সঙ্গে দেখা করলাম। সে আমায় মৈত্রেয়ীর আর একটা চিঠি দিলো। আমি সেটা নিতে অস্বীকার করলাম। সে আমায় মনে করিয়ে দিলো যে আমি ইঞ্জিনিয়ার মশাইকে আমার ওয়ার্ড অফ অনার দিয়েছিলাম। আমি কি সত্যই কোনো কথা দিয়েছিলাম? আমার তো মনে পড়ছে না। খোকা এমন ভান করলো, যেন মৈত্রেয়ীই বার বার তাগিদ দিচ্ছে আমাকে একদিন ভবানীপুরের পার্কে কিংবা সিনেমাহলে দেখা করার জন্য। মৈত্রেয়ী নাকি আমায় টেলিফোন করতে চেয়েছিল। আমি ফিরিয়ে দিলাম, সত্যি বলতে কি । একটু রূঢ়ভাবেই সব অস্বীকার করলাম। কিন্তু তার ফলে আমার ভেতরেও একটা কষ্ট হতে লাগলো। যখন বোকার মতো মাথা খারাপ করে চোখের জলে সব কিছু শেষ করে দিতে হচ্ছে, তখন আবার কোথা থেকে শুরু করবো?

—ওকে বলে দিও, ও যেন তার অ্যালেনকে ভুলে যায়। সে মরে গেছে। কেউ যেন আর তার জন্য অপেক্ষা না করে।

আমি আমার ভেতরটা হাতড়ে বেড়াতে লাগলাম, আর কি আমার ক্ষমতা

আছে আবার নতুন করে শুরু করার মতো! মৈত্রেয়ী কি সত্যিই আমার ওপর চিরকালের জন্য নির্ভর করে থাকতে পারবে? কিন্তু আমি কোনো উত্তরই খুঁজে পেলাম না, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। ওকে যদি নিয়ে যেতেই হয়, হ্যাঁ তাই, ...কিন্তু কী করে নিয়ে পালাবো? কী করে আবার ভবানীপুরের বাড়িতে ঢুকবো, কী করে মিঃ সেনের শ্যেনদৃষ্টি এড়াবো?....হয়তো আবার নানা রকমের ঝামেলা বাধবে। হয়তো আমার বোধের কেউ মূল্যই দেবে না! হয়তো ও নিজেই আর আমায় বুঝবে না, আমার ওপর ভরসা করতে পারবে না। আমি জানি না,—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার এখন কেবল একটাই ইচ্ছে, ও আমায় ভুলে যাক, ও যেন আমার জন্যে কষ্ট না পায়!

আমাদের ভালোবাসা চিরজন্মের মত শেষ হয়ে গেছে।

কাল ভোর থেকে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। কেবল একই কথা ভেসে আসছে, 'অ্যালেন কোথায়? আমি একটু ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওকে একটু বলে দিন, ব্যাপারটা খুবই জরুরি,..ওর বান্ধবী মৈত্রেয়ী ফোন করছে...।' শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। ফোন ধরতেই ও বললো, 'অ্যালেন, এখুনি চলে এসে এই কালামুখীর সঙ্গে তোমার এতদিনের সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে যাও।'

আমার ইচ্ছে করতে লাগলো, এক্ষুণি ছুটে চলে যাই, ওর বুকে নিজেকে আছড়ে ফেলি, কিন্তু না..আমি কেবল মৃদু হাসলাম মাত্র। একটা বুনো অভিমান যেন আমায় পেয়ে বসেছে, আমার যন্ত্রণা ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে, আরও তুঙ্গে উঠুক যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে না যায়। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে বলবো—ভগবান! যথেষ্ট হয়েছে!

আজ আমি যখন ব-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ করছি, হঠাৎ রিসিভারের মধ্যে দিয়ে কানে এলো আর একটা গলার স্বর। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, মৈত্রেয়ীর গলা। কত ভয়ে, কত সন্তর্পণে বলছে,—অ্যালেন, তুমি কেন চাইছো না যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি? তুমি কি আমায় ভুলে গেছো..?

আমি নিঃশব্দে টেলিফোনটা রেখে দিলাম। আশ-পাশের টেবিল-আলমারি ধরে টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে পৌঁছলাম। ওঃ ভগবান, কেন, কেন আমি ওকে ভুলতে পারছি না! কেন এই যন্ত্রণার আগুন কিছুতেই নিভছে না?.....আমি এমন একটা কিছু করতে চাই, যাতে মৈত্রেয়ী আমাকে ভুল বোঝে, আমার ওপর বিরক্ত হয়, যা জোর করে ওকে আমায় ভোলার সুযোগ

করে দেবে। আমি আর একটা মেয়ের সঙ্গে মিশবো ঠিক করেছি, সে গারাউ এবং আমি ভবানীপুরে খোকার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলেও এলাম....

বার্মা অয়েল কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা অনেক এগিয়েছে। ওরা একজন এজেন্ট চাইছে। মনে হচ্ছে আমি পোস্টটা পেয়ে যাবো। আমার পাওয়াটাও খুবই দরকার। সেদিন সারা দুপুর ও বিকেলটা টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের লাইব্রেরিতে ফ্লুভিয়্যাল এজেন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করলাম। এদিকে পুলিশও আমার ব্যাপারে এই নিয়ে দুবার খোঁজখবর করেছে। ইওরোপীয়ান বেকারদের এখান থেকে ধরে ধরে আবার দেশে চালান করে দিচ্ছে। আমাকেও যদি দেয়, তাহলে তা হবে আমার পক্ষে নিষ্ঠুরতম পরাজয়...

আজ আমার কাগজপত্রগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ মৈত্রেয়ীর একটা চিঠি বেরিয়ে পড়লো। চিঠিটা অজ্ঞাতনামা কেউ লিখেছিল ওকে, ওর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে, সঙ্গে একটা বিশাল ফুলের তোড়াও ছিল। চিঠিটা পড়ার এক অদম্য ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসলো। কিন্তু আমি এখনও বাংলায় বড় কাঁচা, তাই চিঠিখানা পাশের ডাক্তারখানার এক ভদ্রলোককে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম। ওটায় লেখা—'..ওগো আমার চির-না-ভোলা, চির জাগরূক দীপশিখা, আজ আমি তোমায় দেখতে যেতে পারছি না। আজ তোমায় একান্ত একা, একান্ত আমার করে তো পাবো না, যেমন করে সেদিন তোমায় সম্পূর্ণ আমার করে আশ্লেষে পেয়েছিলাম, আর সেদিন তো...'

ওঃ, আর পড়া অসম্ভব! আমার ভেতর এক প্রচণ্ড ঈর্ষা অমানুষিক যন্ত্রণায় ধক্-ধক্ করে জ্বলে উঠলো। আমি আমার টেবিলের কাঠ দুহাতে প্রাণপণে চেপে ধরে নিজেকে সামলাতে লাগলাম। তা হলে আর আজও আমাকে ফোন করা কেন? এ কী তামাশা! ওঃ ভগবান! আমি যে বড় ভালোবেসে ছিলাম, বড্ড ভালোবেসে ফেলেছিলাম! তা হলে কি সবটাই আমার ভুল? কোথায় আমার ভুল, কোথায় আমার গলদ্? নাকি, আমার বিপক্ষে সকলেরই অনেক, অনেক কিছু বলার রয়ে গেছে?

আজকাল আমি আর ডায়েরিতে সব ঘটনার কথা লিখি না। আশা করছি, খুব শিগ্গিরই ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হবে। আমার চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। যদিও এখনও পাকা হয়নি, তবু আমি নিশ্চিত যে, এ চাকরিটা আমার হবেই, এবং আমায় সিঙ্গাপুরে গিয়ে যোগ দিতে হবে, ওরা আমার যাওয়ার খরচ পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার চারপাশে আমাকে কিছু

বলার মতো কেউ নেই। আমি নিজেই নিজেকে উৎসাহিত ও চাঙ্গা করে তুলেছি যাতে কাজটা পেয়ে যাই.....।

হ্যারল্ডের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নেহাৎ ক্লারা যদি না থাকতো তাহলে এতদিন হয়েই যেতো কিছু একটা। ওর ওপর একটা ভয়ঙ্কর রাগ চেপে বসেছে আমার মনে। ব্যাপারটা নিয়ে একদিন গারতির সঙ্গে ক্লারার তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। তারপর থেকে আমি গারতির ঘরেই আছি, আর দুনিয়া শুদ্ধ লোকে আমাদের সবচেয়ে 'সুখী পরিবার' বলে ধরে নিয়েছে। লোকে ভাবছে আমরা দুজনে বুঝি গোপনে বিয়েটা সেরে নিয়েছি। গারতি আসল সত্যটা ভালো করেই জানে, আমি মৈত্রেয়ীর প্রেমে পাগল হয়ে আছি আর ওর সঙ্গে ঘুরলেই মৈত্রেয়ী আমার ওপর ক্ষেপে দূরে সরে যেতে পারে।

খোকা নানা ছুতোয় আমাকে ধরবে বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আমায় যত চিঠি পাঠাচ্ছে আমি তার অর্ধেকও পড়ে দেখছি না। সেগুলো ন্যক্কারজনক ইংরেজীতে লেখা। সে বারবার আমায় লিখেই চলেছে যে মৈত্রেয়ী সেই মারাত্মক ভুলটা করবে বলে ঠিকই করে ফেলেছে, আর তার ফলে লোকে তাকে খোঁজাখুঁজি করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মৈত্রেয়ী নাকি আমার কাছেই এসে উঠবে। তার এই মতলবের কথা পড়ে আমি মনে মনে বেশ শঙ্কিতই বোধ করলাম। কিন্তু আমি তাকে আমার এই ভাবনার কথা ঘূণাক্ষরেও জানতে দিলাম না বরং খুব রূঢ় ভাবেই এ-সব ব্যাপার এবং যা সে আমায় আগে বলেছিল, সব কিছু পুরোপুরিই উড়িয়ে দিলাম। খোকা আমায় প্রায় ভয় দেখিয়েই জানিয়ে দিয়েছে যে আমায় খুঁজে বার করার জন্য মৈত্রেয়ী কোনো বাধাকেই গ্রাহ্য করবে না। নাটক একেবারে...।

সিঙ্গাপুর। আমার সঙ্গে মিসেস সেনের ভাইপো জ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও এখানকার একটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে কাজ করে। অপার আনন্দে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম, কত পুরনো দিনের কথা হলো। ও-ই আমার প্রথম পরিচিত ব্যক্তি। আমি ওকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলাম। খাওয়ার পর সিগারেট খেতে খেতে ও সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর ওর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বললো,—অ্যালেন, তুমি কি জানো, মৈত্রেয়ী তোমায় কতো ভালোবাসে? তোমাদের এই সম্পর্ক সকলেই জেনে গেছে....।

আমি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। যদি ব্যাপারটা আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য খবর না হয়, তাহলে আমি আর এ-নিয়ে কথা বাড়াতে চাই না,

কোনো উৎকণ্ঠা প্রকাশ, বা অন্য কিছু না। আমি জানি সকলে মিলে ব্যাপারটাকে নিয়ে অনেক জল ঘোলা করেছে ইতিমধ্যে। সত্যি, লোকের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

কিন্তু জ....আমাকে পীড়াপিড়ি করতে লাগলো।

—শোনো, আমায় বলতে দাও, তোমার জন্যে আর একটা নতুন দুঃসংবাদ আছে।

—অন্ততঃপক্ষে সে মরেনি নিশ্চয়ই। আমি প্রায় আর্তস্বরে বলে ফেললাম। ব্যাপারটা জানার আগেই আমার মনে হতে লাগলো ও এখুনি যা বলবে তা আমি আমার মন, প্রাণ, অন্তর দিয়েই জানি, ও নিশ্চয়ই মৈত্রেয়ীর মৃত্যুর খবর দেবে। আমার মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে মৈত্রেয়ী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে....।

—মরলে তো চুকেই যেতো। ও যা করেছে, সেটা তার চেয়ে ঘৃণ্য কাজ। ও ঐ ফলওয়ালাটার সঙ্গে পালিয়েছে....।

আমার মনে হলো চিৎকার করে কেঁদে উঠি, দাপাদাপি করি, প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ি। আমি টেবিলের কোণ দুটো চেপে ধরে নিজেকে কোনো রকমে সামলালাম। মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে অন্ধকার, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো। জ.....আমার করুণ অবস্থা দেখে আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

—সত্যিই, ও যা করেছে, তা আমাদের সকলের কাছেই যথেষ্ট দুঃখের ব্যাপার। ছোট মা প্রায় দুঃখে পাগলই হয়ে গেছেন। মৈত্রেয়ীকে ধরে মেদিনীপুরে আটকে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টাই হয়েছিল। তবে এখন প্রায় সবাইই জেনে গেছে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা ওর ওপর খুব অত্যাচার করছে কিনা।

—মিঃ সেন তো ঠিক করেছেন ওকে আর ও-বাড়ির দরজা ডিঙোতে দেবেন না। বলছেন, মৈত্রেয়ীর পালানোর জন্যে যে দায়ী, তাকে পেলে উনি টুকরো করে ফেলবেন। সকলে চেয়েছিল ও পড়াশোনা করবে। বিশেষ করে একটি বিষয়ের উপর জোর দেবে। আমি ঠিক জানি না,—বোধ হয় ফিলজফি। ...ওরা ব্যাপারটা চেপে রাখতেই চেয়েছিল। কিন্তু এখন তো সব্বাই জেনে ফেলেছে...কে ওকে ঘরে নেবে?....মৈত্রেয়ী খুব চিৎকার চোঁচামেচি করেছে—আমায় কুকুরের মুখে ফেলে দিলে না কেন? রাস্তায় বার করে দিলে না কেন? যাচ্ছেতাই ব্যাপার।...আমি জানি, এটা মৈত্রেয়ী খুবই ভুল করেছে। কিন্তু এ ছাড়া ও আর কিই বা করতে পারতো?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি ভেবেই চললাম। কিন্তু ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। আমি কি নরেন্দ্র সেনকে টেলিগ্রাম করবো? মৈত্রেয়ীকে লিখবো?

আমি বুঝতে পারছিলাম মৈত্রেয়ী এই ভুলটা আমার জন্যেই করেছে! খোকা যে চিঠিগুলো আমায় এনে দিয়েছিল, সেগুলো সব যদি খুঁটিয়ে পড়ে দেখতাম! হয়তো তার মধ্যে ওর কোনো প্ল্যান লেখা ছিল! আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে...। আমি সব কিছু লিখে রাখবো, সমস্ত কিছু।

....উত্তেজনার বশে আমি কোথাও একটা বিরাট ভুল করে বসিনি তো? আমার ভালোবাসার মূল্যবোধ নিয়ে আমায় কেউ বোকা বানায়নি তো? কেন আমি বিচার-বিবেচনা না করে সবকিছু বিশ্বাস করতে গেলাম! কী জানি আমি? কতদূর জানি?

আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে করতে লাগলো মৈত্রেয়ীকে একবার অন্তত চোখের দেখা দেখি, কিন্তু .....

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

উপন্যাস ও গল্প

ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি অনুবাদ: **সুভাষ সিংহ** ২০০.০০
প্রেম অমনিবাস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৫০.০০
প্রেম অমনিবাস হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১ম) ১২০.০০
প্রেম অমনিবাস আশাপূর্ণা দেবী (১ম) ১২০.০০
প্রেম অমনিবাস ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ১২০.০০
প্রেম অমনিবাস শক্তিপদ রাজগুরু (১ম) ১৩০.০০
পারিবারিক মহাশ্বেতা দেবী ৭৫.০০
ক্ষুধা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬০.০০
চন্দনবাঈ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৮০.০০
যমুনাবাঈ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৩০.০০
শৃঙ্খলিতা ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ৬০.০০

দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প (১ম) সম্পাদনা: **শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** ১২৫.০০
শ্রেষ্ঠ রম্য রচনা আশাপূর্ণা দেবী ৫০.০০
মসনদ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৮০.০০
কালীক্ষেত্র দীপিকা সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭৫.০০
যখন সম্পাদক ছিলাম বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৫.০০

ENGLISH GRAMMAR Rs.100.00
(in English & Bengali)
In the steps of J. C. Nesfield M.A.
by Ranendranath Banerjee M.A. (Double)

আধুনিক বাংলা অভিধান ১০০.০০
অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে

কলকাতা আছে কলকাতাতেই ১৫০.০০
পি. থঙ্কপ্পন নায়ার

জাদু আয়না রমাপ্রসাদ দে ৩০.০০
অ্যাকরয়েড খুন হলেন আগাথা ক্রিস্টি অনুবাদঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ৭৫.০০
কিশোর গালিভার সমগ্র জোনাথন সুইফট ৩০.০০
ভৌতিক অমনিবাস হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৫০.০০
সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০.০০
শিশু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫.০০
খাপছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬০.০০
আমার বাল্যকথা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০.০০
হাসির রাজা দাদাঠাকুর ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩০.০০
চিরকালীন গল্পকথা অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১ম ২০.০০; ২য় ২০.০০; ৩য় ২৫.০০; ৪র্থ ২৫.০০
২৫টি জাতকের গল্প তপতী দেবী ৩০.০০
২৫টি বেতালের গল্প তপতী দেবী ৩৫.০০
বত্রিশ সিংহাসন তপতী দেবী ২৫.০০
হাসির রাজা শিবরাম শিবরাম চক্রবর্তী ৩০.০০
হাল ছেড়ো না বন্ধু পৃথ্বিরাজ সেন ৩০.০০
বিজ্ঞান যখন বন্ধু পৃথ্বিরাজ সেন ২৫.০০
১২০০ সেরা জোক্স সম্পাদনাঃ ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৫০.০০
ছোটদের সেরা জোক্স সত্যব্রত দাস ২০.০০
লাভার্স জোক্স সত্যব্রত দাস ২০.০০
আপ-টু-ডেট স্টুডেন্টস নলেজ ক্যুইজ আকাশ ঘোষ ৪০.০০
উপেক্ষিত প্রফুল্লচাকী স্বপন মৈত্র ৩৫.০০
হাসির রাজা তেনালী রমন তপতী দেবী ১৫.০০
হাসির রাজা গোপাল ভাঁড় তপতী দেবী ১৫.০০
হাসির রাজা বীরবল তপতী দেবী ১৫.০০
হাসির রাজা মোল্লা নাসিরুদ্দিন তপতী দেবী ১৫.০০
নামকরণ অভিধান তপতী দেবী ২৫.০০
বিলেত ভ্রমণ ড. ইন্দুমাধব মল্লিক ৪৫.০০
শ্রীশ্রীবাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী ২০.০০
যা বাকি রইল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৩০.০০
১০০১ গৃহিণীর টিপ্স তপতী দেবী ৩০.০০
৫০১ আমিষ ও নিরামিষ আহার লিপিকা চট্টোপাধ্যায় ৫০.০০

মির্চা এলিয়াদ

লা নুই বেঙ্গলী

অ্যালেন একজন ইওরোপীয়ান যুবক, পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, ভারতে কর্মরত। তাঁর উপরওয়ালা একজন বাঙালী। এই বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার অ্যালেন কে নিজের পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং তাকে পোষ্যপুত্র রূপে পেতে চাইলেন। অ্যালেন এবং তাঁর উপরওয়ালার মেয়ে মৈত্রেয়ীর মধ্যে জন্ম নিল প্রেম। এক সর্বনাশা, বাঁধভাঙা প্রেম। ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার এমন কি মেয়েটির হৃদয়ের জটিল মানচিত্রও মিলনের পথে বাধা স্বরূপ। কিন্তু অ্যালেনের এ প্রেমকে কাল মুছে দিতে পারল না। এল দুঃখ এল অনুশোচনা।

বশিষ্ট সময়ের পটভূমিতে দুইটি সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব – আর একটি অবিস্মরণীয় নারী চরিত্র যাদুর মতো বিস্তৃর্ণ হয়ে আছে এই উপন্যাসে।